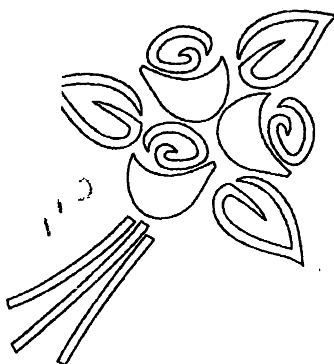
দাঁড়াও পথিকবর

তিষ্ঠ ক্ষণকাল

প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল ১৯৫৯

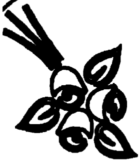
প্রকাশক
স্বাগতা দত্ত
মাইকেল মধুসূদন একাডেমী
১৯বি, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৩৫
ফোন—(০৩৩) ২৫৭৭-৬১০৯
অক্ষর বিন্যাস—তন্ময় সাহা

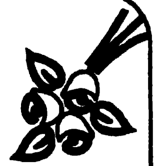


মুদ্রাকর—এস. সি. মজুমদার এন্ড কোম্পানী
কলকাতা—৭০০ ০০৫

Dear Vid, (Vidyasagara)

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Korunasagara (করুণাসাগর) also.







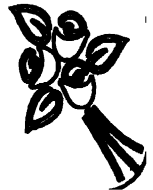


Michael Madhusudan Dutt

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম ঃ১৮২৪ সাল, ২৫শে জানুয়ারি শনিবার

মৃত্যু ঃ ১৮৭৩ সাল, ২৯শে জুন রবিবার. বেলা ২টো



Michael Madhusudan's wife
Henrietta Soffia White



অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া হোয়াইট

জন্ম ঃ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ

মৃত্যু ঃ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ



ক্যাপ্তেন ডি. এল রিচার্ডসন
Captain D. L. Richardson

প্রস্তাবনা

গ্রন্থটির নাম করণের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত ছিলাম, মহাকবির সৃষ্টি এবং তাঁর আত্মপ্রত্যয়, আত্ম বিশ্বাস, রাগ-অনুরাগ, অভিমান, আবেগ, উৎকণ্ঠার ও বিড়ম্বনার জীবন সব মিলিয়ে তো মহাকাব্যের নায়ক। এ হেন গ্রন্থের নামকরণ করতে গিয়ে আমি বারবার থমকে উঠেছি। মেট্রোরেলের সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই আমার স্নেহভাজন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী নির্মলেন্দু কর্মকার হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন বিধানদা গ্রন্থের নামকরণ হয়ে গেছে বলেই বলল *'তিষ্ঠ ক্ষণকাল'* জড়িয়ে ধরে বললাম সাবাস! কারণ এর আগের গ্রন্থটি ছিল *'দাঁড়াও পথিকবর'* 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল' তারই ছায়ামাত্র। তবে অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় নামকরণের বিষয়ে পূর্ণ রূপ দিয়ে বললেন দাঁড়াও পথিকবর **তিষ্ঠ ক্ষণকাল**। আমি অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নামকরণকেই সার্থক বলে মনে করেছি।

এই গ্রন্থে কবির জীবন ও সাহিত্যকে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কবি প্রতিভা ও তাঁর সৃষ্টির নির্ম্মানশক্তি, বোহেমিয়ান জীবন, কাব্যালোচনা এবং কবির সৃষ্টি কাব্য, চতুর্দশপদী, অলঙ্কার, ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, জীবনের কামনা-বাসনা বাংলা ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সবই সংযোজন করা হয়েছে। সুতরাং এই গ্রন্থ শুধু কবির জীবনী নয় কবির সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এক অভিনব পাঠ্যগ্রন্থ, যা প্রতিটি পাঠকের ভাল লাগবে, আজ মধুসূদন বেঁচে থাকলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন বিধান রেডি টু পেগ, তুমি আমার জীবনী লিখেছ, আমার স্বপ্নকে তুমি সার্থক করেছ—নাও আর এক পেগ, দেখলাম হেনরিয়েটা মুচকি হাসছে এই না হলে মহাকাব্যের নায়ক?

রাবণের স্বর্ণ লঙ্কা আছে, রাজ-ঐশ্বর্য আছে, বীরকীর্তি আছে, বীরত্ব আছে, রাবণের মধ্যে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক দুই -ই আছে। Real নায়কত্ব আছে, ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও ঔদ্ধ্যত আছে, রাবণের চরিত্রে কাহিনীর ঘনঘটা তার সৌরভ গৌরব দিগন্ত প্রসারিত।

সাধক হিসাবে রাবণ, যোদ্ধা হিসাবে রাবণ, পিতা হিসাবে রাবণ, প্রেমিক হিসাবে রাবণ, মর্ম্মান্তিক শোকের মধ্যেও রাবণ যে কত বিশাল কত মহৎ তা ভাবনার অবকাশ রাখে না।

দুই মহিষী-চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী, পুত্র বধু প্রমিলা, নর্ম্ম সহচরী বৃন্দ, দাস দাসী বেষ্টিত রাবণ, বীরপুত্র মেঘনাদ বিশাল মায়ার আবদ্ধে থেকেও যে পুরুষকার দেখিয়েছেন তা আমরা পাই কবি মধুসূদন দত্তের চরিত্র চিত্রণ রূপ বর্ণনার মাধ্যমে, কবি যদি মধুসূদন না হতেন তাহলে আমরা হয়ত রাবণকে রাক্ষস বলেই জানতাম। তাঁর যে এত গুণ তা আমাদের কাছে অজানাই থেকে যেতো। শুধু কবির নিখুঁত বিশ্লেষণে আমরা পেলাম এক অন্য রাবণকে। মাতৃজাতির যে বন্দনা করেছেন কবি তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব হৃদয়ের কথা, চিত্রাঙ্গদা ও

মন্দোদরীর মুখ দিয়ে যে সব কথা তিনি বলিয়েছেন তা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, যদিও তিনি বিজাতীয় গ্রন্থ প্রচুর পাঠ করেছেন। মিলটন হোমারের গ্রন্থ পড়ে মাথা ঝামা করেছেন। কিন্তু মাতৃত্বের হৃদয় বিদারক ক্রন্দন, বীরত্বময় ভাষা একেবারে খাঁটি বাঙালীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে পুত্র হারা মায়ের আকুল ক্রন্দন অপর দিকে পিতার পুরুষকার দিয়ে বোঝানো, এ এক মহৎ সৃষ্টি, চিত্রাঙ্গদা কাতর কণ্ঠে যখন দশাননকে বলেছেন—আমার পুত্রকে তুমি কোথায় রেখেছো, আমার একমাত্র নয়নের মণি, তোমার অজস্র দাস দাসী বৃন্দ আছে, তুমি তাদের নিয়ে আনন্দে বেঁচে থাকতে পারবে, কিন্তু আমি কাকে নিয়ে বেঁচে থাকব, আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও। ভীষণ আক্ষেপ করে চিত্রাঙ্গদা রাবণকে বললেন—

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষকুল মনি,

...কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র ধন রক্ষণ রাজ ধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর ঃ কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙালীনি আমি, রাজা, আমার সে ধনে।

পুত্র হারা জননীর কি আকুল ক্রন্দন, আবার স্বামী হিসাবে স্ত্রীকে কত সুন্দর শান্তনা—দশাননের, তিনি ধীর শান্ত হয়ে মহিষীকে বোঝাতে লাগলেন

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্র বর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি;
বীর কর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন।

পুত্রের মৃত্যুতে শুধু কি চিত্রাঙ্গদারই কষ্ট রাবণের কি হৃদ যন্ত্রণা নেই? তবে সে যন্ত্রণা ক্রন্দনে নয় প্রতিশোধের মাধ্যমে। রাবণের ব্যথা বোঝার মত মানুষ কোথায়! পিতা রাবণকে কম সহ্য করতে হয়নি বাক্যবাণ। চিত্রাঙ্গদা মন্দোদরী সকলেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রাবণের বিরুদ্ধে; তাঁরা বাক্যবানের কশাঘাতে রাবণকে কম আহত করেন নি, তাঁরা বললেন,

"হায় নাথ, নিজ কর্ম ফলে,
মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি।

রাবণ যুদ্ধ করেছেন, পুত্র, মিত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই হারিয়েছেন কিন্তু একবারও

তার আক্ষেপ বা বিলাপ নেই, পুরুষকারের এটাই পরিচয়। অথচ কবি রামের ক্ষেত্রে শুধু কাপুরুষতা, মিথ্যা ষড়যন্ত্রই দেখিয়েছেন, রামকে কাপুরুষের মত শুধু বিলাপ করতে হয়েছে, রাবণের বীরত্বে আমাদের হৃদ্‌কম্প্ হয় আবার তার বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মে।

শুনিনু সভয়ে—
রণনাদ সারা দিন কালি রণভূমে......
জয়নাদে রক্ষঃ সৈন্য পশিল নগরে
বাজিল রাক্ষস বাদ্য গম্ভীর নিক্কনে।

জীবনের নৈতিক শক্তিতে কবি ভরপুর, তেজ-বলীয়ান, আত্মবিশ্বাস, পরাজয়, জয় সব কিছুর উর্ধ্বে কবি, কবির প্রিয় চরিত্র রাবণের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই কবির প্রতিটি মুহূর্ত।

কবি যে ভাবে মেঘনাদ বধ কাব্যে অলঙ্কার ছন্দ্র প্রয়োগ করেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর অগাধ বিচরণ ছিল, কবি প্রাচীন কাব্য ধারার মর্যাদা রক্ষা করেছেন, কবি তাঁর কাব্যে যে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন প্রাচীনকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

কবি রাবণের দিকে ঝুঁকলেন, তার বিশেষ কারণ কবি নিজেই। রাবণ শ্রেষ্ঠ, রাবণ বীর, রাবণ ঐশ্বর্য্যশালী , রাবণ মহাকাব্যের মূল চরিত্র, সবগুণই কবির মধ্যে বিশেষ ভাবে সংস্পৃষ্ট। কবির কাছে রাম দরিদ্র ভিক্ষারী, কাপুরুষ, ষড়যন্ত্রকারী, বিত্তহীন, নিঃস্ব মোট কথা রাম লক্ষ্মণের প্রতি কবির অবজ্ঞা কৃপা আর ঘৃণা।

কবির প্রতিটি মুহূর্তে ছিল কণক লঙ্কার মত ঔদ্ধত্যময় স্বপ্ন - কল্পনা, তিনিও রাজা রাবণের মত বীর কেশরী; তা না হলে কোচম্যান কে মুঠো মুঠো টাকা না গুণে দেন! একটা মোহর লাগে চুল কাটতে! আবার তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন বছরে চল্লিশ হাজার টাকার নীচে একটা মানুষের চলে না, ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ তাঁর অন্তরে, অর্থের মোহ তার গভীর অন্তরে, তবে এই অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নয়, বড়লোক হবার জন্য নয়, স্বাভাবিক ভাবে জীবন চালানোর জন্য অর্থ, রাবণের ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, আত্ম মর্যাদায় দরিদ্র রামচন্দ্র যেমন বিস্মিত, ঠিক তেমনি কবির দৃষ্টি ভঙ্গির কাছে দরিদ্র ভূদেব ও বিস্মিত, ক্লাসে দুবার তিনবার পোষাক পরিবর্তন, সাহেবদের চমকে দেবার জন্য নানা ধরনের পোষাক পরা, ভূদেবকে অর্থ সাহায্য করা, বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপানের আসর, মদ্য না পাওয়ায় ক্লাসের কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলা, দু তিনজন ভৃত্য সহ পালকি করে কলেজে আসা, বন্ধু গৌরদাস ভূদেবের কাছে জিনিয়স কথাটা শোনা, এই শব্দে তাঁর সৃষ্টির উল্লাস, তিনি নিজে যে বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা তিনি উপলব্ধি করতেন বন্ধুদের বিশেষ আলোচনায়।

রিচার্ডসন সাহেবের পত্রিকার নাম লিটারারি গ্লীনার এ কবিতা প্রকাশ—এসবই তাঁর জীবনের এক একটি অহমিকার অধ্যায় তবে বন্ধুরা শিক্ষকেরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার

করেছেন মধুর প্রতিভার তুলনা চলে না কারো সাথে। তাঁর যেমন ছিল গর্বিত স্বভাব তেমনি প্রেমময় ও প্রেমবৎসল প্রাণ।

রাবণের মত তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা পারিষদদের নিয়েই সংসার করেছেন। রাবণের যেমন দুই মহিষী চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী কবির ও দুই মহিষী রেবেকা ও হেনরিয়েটা। রাবণের দুই মহিষীকে যেমন অঝোরে চোখের জল ঝরাতে হয়েছে তেমনি কবির ও দুই মহিষীকে অঝোরে চোখে জল ঝরাতে হয়েছে। রাবণ পুত্র হারা হয়েছেন তার মহিষীদের চোখের জল ফেলতে হয়েছে, কবিও তার পুত্র কন্যাকে হারিয়েছেন, রেবেকা ও হেনরিয়েটাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। এ এক দৈব যোগ রাবণ ও মধুসূদনের মধ্যে। রাবণ মহান উদার তেজী এবং অহমিকায় নিজেকে কাঁদিয়েছেন ঠিক তেমনি কবিও তার উদারতা তেজ দৃপ্ততা অহমিকায় কেঁদেছেন। তবে কারোর সামনে নয়, সে ক্রন্দন অন্তরে। কবির কাছে আমরা যখন শুনি

গাঁথিব নুতনমালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
(বিধির ভূষণে ভাষা!) রত্নরাজি তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর আকিঞ্চনে

তেমনি রাবণকেও আমরা দেখেছি খেদ করতে—

এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে কেন দেহ মোরে!
গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা

বীররসের অবতারণা করতে গিয়েও কবি পারলেন না—বীররসে গাহিব যা মহাগীত পালন করতে, করুণ রসে আপ্লুত হতে হয়েছে জীবনের প্রতিটি ছন্দে—।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে করুণ রসের মধ্যেও বীররস ছড়াছড়ি— মহাকবি হিসাবে তিনি তো কবি খ্যাতি পেয়েছেন, তেমনি মহাবীর হিসাবে রাবণ ও কমখ্যাতি পান নি। রাবণ ও মধুসূদনের বিচিত্র জীবন, উভয়েই মহাকাব্যের নায়ক।

রাবণের বীরত্বকে নিয়ে যেমন আলোচনার শেষ নেই তেমনি কবির জীবনকে নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। কবি তো সর্বকালের নায়ক। রাবণকে বাদ দিয়ে যেমন রামায়ন বিধবার নিরামিষ তেমনি কবিকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য মৃত পথ যাত্রী, তাই উভয়েই দুই বলয়ের দুই মহাশক্তির দুই মহা নায়ক মহাকাব্যের।

একদিকে রাবণ যেমন স্বর্ণলঙ্কার গর্বে গর্বিত অপর দিকে নিজে যেমন দুঃখ পেয়েছেন তেমনি সকল পরিজন কেও দুঃখ দিয়েছেন তাঁর পুরুষকার এমনই ছিল। দেখা যাক কবির জীবনের কিছু ঘটনা শুনে পাঠকের কি মনে হয়!

আবাল্য স্বপ্ন ইংলন্ড, আবাল্য স্বপ্ন Blue eyed girl বাবার সাথে তমলুকে বেড়াতে

এসেও তিনি ইংলন্ড দেখেছেন। তমলুকের রাজ বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন বাবার সাথে কিছু দিনের জন্য, তমলুকের সমুদ্রে জাহাজ দেখে তিনি গৌরকে লিখলেন—

"I am come nearer that sea, which will perhaps see me at period which I hope is not far off–Ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not very far. What a number of ships have seen going to England.

সত্যই তিনি স্বপ্ন সার্থক করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। সমুদ্র পাড়ি দিলেন তবে ইংলন্ড নয় গেলেন মাদ্রাজে। ইতিহাস থেমে থাকে না, এগিয়ে চলল মহাকবির জীবন ধারা,—

মাদ্রাজ চার্চে —১৮৪৮ সালে ৩১শে জুলাই কবি রেবেকাকে বিবাহ করেন, সেই সময় বিখ্যাত W.H.B, Morens বলেছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে মধুসূদনই প্রথম যিনি একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী কে বিবাহ করেন, রেবেকার পিতার নাম রবার্ট টম্পসন এবং মায়ের নাম ক্যাথারিণ টম্পসন, (ইন্ডো-ব্রিটেন) জন্মেছিলেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে। মাত্র বারো বছর বয়সে রেবেকা পিতাকে হারান, তার পরই মাদ্রাজ ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলামে আশ্রয় নেন। সেই সময় তাঁর ধর্মপিতা হয়েছিলেন ডুগাল্ড ম্যাক্‌টাভিশ। সেই ডুগাল্ড সাহেবের পদবীতে রেবেকার নাম হয় রেবেকা ম্যাকটাভিশ, আসলে রেবেকার পদবী ছিল টম্পসন।

কবি অহমিকার আকাশ পথে সর্বদাই বিচরণ করতেন। সব সময়ই তিনি আত্মতুষ্টিতে ভরপুর ছিলেন অন্তরে। কবির জীবনে যোগাযোগ সুত্র ছিল বৃহস্পতির ন্যায়, তখনকার দিনে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে ৪/৫ দিন সময় লাগত। অথচ মধুসূদনের সময় লেগেছিল ১৮/১৯ দিন তার প্রধান কারণ তিনি কম পয়সার টিকিট এবং বহু বন্দরে ছোঁয়া জাহাজে উঠেছিলেন সে কারণে এত বেশী সময় লেগেছিল। জীবনকে সঁপে দিলেন ভাগ্যের উপর, বার্কলেডী সেইল জাহাজে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতা ত্যাগ করলেন। কোলকাতার বিশপ্স্ কলেজে পড়ার সময় কবির সঙ্গে অনেক সাহেবদের বিশেষ পরিচয় হয়। এমন কি কবির দীক্ষা গুরু আর্চডিকন টমাস ডিয়েলট্রির সঙ্গে দেখা হয় মাদ্রাজে তাছাড়া রেভাঃ সুটন, মিঃ ডফ্, মিসেস ডফ্ সকলের সহযোগিতায় মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলামে সহকারী শিক্ষকের চাকরি পেলেন, মেল অরফ্যান অ্যাসাইলামের পাশেই ছিল ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম তবে মেয়েরা মেল অ্যাসাইলামে ছেলেদের সাথে এক সাথে পড়ত। রেবেকা টম্পসন (মেকাটাভিশ) ফিমেল অরফ্যান আস্যাইলামে থাকতেন। তরুণ শিক্ষক মধুসূদন রেবেকার শিক্ষক হলেন, আর এক জন রেবেকার শিক্ষক ছিলেন যিনি মধুসূদনের বন্ধুও বটে সহকর্মী ও বটে নাম—জে আর নেইলর। স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়েই রেবেকাকে কবি পছন্দ করে ফেললেন, কবি মধুসূদন রেবেকাকে প্রস্তাব দিলেন

বিয়ের, রেবেকা সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রস্তাব কে সমর্থন করেছিলেন, তবে বিয়ের ব্যাপারে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, যদি ও কোন বাধা টিকে থাকতে পারেনি। তবে হ্যাঁ সহকর্মী বন্ধু শিক্ষক জে আর নেইলর বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই মধুসূদন রেবেকাকে বিবাহ করেন তখন রেবেকার বয়স সতেরো আর মধুসূদনের বয়স চব্বিশ বছর ছ'মাস ছ'দিন।

প্রস্তাবনা সংক্ষেপ করাই ভালো কারণ রেবেকার সন্তান সন্ততি এবং হেনরিয়েটার সন্তান সন্ততি বিষয়ক আলোচনা আমরা "মাদ্রাজ প্রবাসে শ্রী মধুসূদন অংশে যথা সময়ে দেখতে পাব, তবে একটি কথা এ স্থলে বলে নেওয়া দরকার কবির সঙ্গে রেবেকার বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি আর হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির বিবাহ ও হয়নি, হেনরিয়েটা কবির জীবন সঙ্গিনী ছিলেন. সারা জীবন অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফিয়া হোয়াইট নামে। কোনো দিন দত্ত পদবী লেখার সুযোগ হয়নি আইনানুগ কারণে। জীবদ্দশাতে হেনরিয়েটার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটেছিল। মনে মনে ভাবতেন এমনই মানুষের জীবন সঙ্গিনী যে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারছেন না কবি। তবে হেনরিয়েটাকে কবি প্রচন্ড ভালোবাসতেন। হেনরিয়েটাও সারাজীবন কবির জন্য প্রাণপাত করেছেন। তবে উভয়েরই মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা ছিল। বিয়ে তাদের হয়নি ঠিকই তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা এক অভিন্ন ছিলেন। মধুসূদনের মদ্যপানের কথা কে না জানেন। তার মদ্য পানের ইতিহাস কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স জীবনে হেনরিয়েটাও কম যেতেন কোথায়। দু জনে সমান ভাবেই মদ্য পান করতেন। এমন কি ভার্সাইতে থাকাকালীন হেনরিয়েটা প্রতিদিন দু বোতল মদ্যপান করতেন, উভয়েরই মৃত্যু হয়েছিল মদ্যপান জনিত দোষে।

কবির জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে নায়কোচিত পুরুষকারের মর্যাদা পায়। শিশু কাল থেকে মৃত্যুর আগের দিন পয্যন্ত তাঁর জীবনকে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর নাটক হয়েছে গল্প হয়েছে, কবি কে নিয়ে সমালোচনা করতেও অনেকে ছাড়েন নি। কবির সৃষ্টির কতখানি মূল্যায়ন করতে পেরেছি তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার কোন বালাই নেই। মধুসূদন ও তাঁর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বঙ্গের বহু পন্ডিতগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন হাজার হাজার পাতা বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণা করেছেন, কিন্তু তাতে কি মধুসূদনের আত্মার শান্তি হয়েছে অথবা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার পট পরিবর্তন হয়েছে? মনে হয়ে তাতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ঠিক ঠিক ভাবে হল না।

আমার মনে হয় তাঁর সৃষ্টি স্কুল পাঠ্য, কলেজ পাঠ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যে পরিপূর্ণভাবে যদি করা হয় তাহলে কবির সঠিক মূল্যায়ন হবে; আংশিক পাঠ্যে কবিকে ছাত্রছাত্রীগণ কতটা বুঝতে বা চিনতে পারবেন বা তাঁর সৃষ্টির সাথে কতটা পরিচিত হতে পারবে?

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মধুসূদনই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। মধুসূদনের পূর্বে কবিতা

পড়া হত পাঁচালীর মত করে সুর দিয়ে আর মধুসূদন সেই পাঁচালীর সুরকে ভেঙ্গে কবিতার মধ্যে আনলেন এক বীর্যবান শক্তি ও উদাও আবৃত্তি যোগ্য পসরা। বাংলা সাহিত্যে ছন্দমিল কে তিনি আঘাত করলেন না, উপরন্তু তিনি আমাদের দিলেন ও প্রবর্তন করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ব্লাঙ্কভার্স অথবা তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন সনেট বা চতুর্দশপদী, কবি ভার্সাই থেকে কোলকাতায় বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১০০টি সনেট পাঠিয়েছিলেন। কবির সবকটি সনেটই এই গ্রন্থে আমরা দেখতে পাব, তবে সনেট সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

Sonnet শব্দটি এসেছে ইতালীয় সনেত্তো (Sonnetto) থেকে যার অর্থ হল little sound or song, অনেকের মতে সনেটের প্রথম প্রবর্তক ছিলেন কবি লেন্টিনো—যাঁর পুরো নাম (Giacomo da-Lentino) তারপর সনেট রচনায় প্রসিদ্ধ হলেন দান্তে পরে পেত্রার্ক। ইতালীয় এই সনেট ক্রমশঃ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার আবার নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়, সেক্সপীয়রের হাতে সনেটের আর এক রূপ পায়। সনেটকে আমরা মূলত, তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) পেত্রার্কীয় সনেট।

২) সেক্সপীয়রীয় সনেট।

৩) ফরাসী সনেট।

মধুসূদন পেত্রার্কীয় সনেটেই কবিতা রচনা করেছেন তবে তিনি বিশুদ্ধ সেক্সপীয়র নীতিতেও একটি সনেট রচনা করেন ১৮ মাত্রার চরণ মিল কখখক কখখক ঃ গঘঙ গঘঙ কবিতাটির নাম কাশীরাম দাস।

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

এই সনেটকে কবি বলেছেন—চতুর্দশপদী, কবি না না ভাবে সনেট পরীক্ষা করেছেন। তিনি মিশ্র রীতিতেও সনেট লিখেছেন। একদা ইংরাজী সনেট রচনায় Iambie pentameter এবং ফরাসী ভাষায় Hexameter রীতি ব্যবহার করা হত, তবে কবি মধুসূদন এই সব রীতিকে অনুসরণ না করে তিনি পয়ারের চরণে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। পরবর্তী কালে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণ অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায় প্রমুখগণ বলেছেন—মধুসূদনের অক্ষরবৃত্ত ই সনেটের প্রবেশ দ্বার। সেই থেকে সেই নিয়মেই সকল কবিগণ মধুসূদনকে অনুসরণ করে আসছেন। ছন্দ সম্পর্কে কবির প্রচুর পড়াশুনা ছিল, প্রথম আধুনিক সার্থক কবি শ্রীমধুসূদন,

নামে মধু হৃদে মধু বাক্যে মধু যার
এহেন মধুরে ভোলে সাধ্য আছে কার।

শ্রীমধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য অবলম্বনে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পূর্বেই রচনা করেছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অপ্রকাশিত শ্রী মধুসূদন, মধুসূদন স্মৃতি এবং "দাঁড়াও পথিকবর" বর্তমান গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে "তিষ্ঠ ক্ষণকাল" বলা যেতে পারে বর্তমান গ্রন্থটি দাঁড়াও পথিকবরের এক নবরূপ, যদি ও এই গ্রন্থে অনেক কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে বিশেষ কারণে।

যারা আমার গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মাননীয় প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল কুমার সেন বর্তমানে তিনি হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের চেয়ারম্যান, মাননীয় উপাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী আশীষ কুমার ব্যানার্জী, মাননীয় বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জী, মাননীয় বিচারপতি শ্রী পিনাকি চন্দ্র ঘোষ, মাননীয় বিচারপতি শ্রী অসিত বিশী, ব্যারিষ্টার ডঃ এইচ কে সাহা রায়, সাংবাদিক ডঃ আর. ভি স্মিথ বন্ধুবর স্বপন ঘোষ, শ্রীপঞ্চানন, ফ্রান্সের মিসেস জুলিয়ানা, শ্রী অসিত চক্রবর্তী এবং আমার স্ত্রী স্বাগতা দত্ত।

যাঁদের অনুপ্রেরণায় প্রথম অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম তাঁদের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারব না তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রয়াতঃ প্রমথনাথ বিশী, প্রধান বিচারপতি শ্রী শংকর প্রসাদ মিত্র, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। গ্রন্থ রচনায় সাহায্য পেয়েছিলাম স্বয়ং প্রমথ নাথ বিশী, শংকর প্রসাদ মিত্র ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে, এছাড়া যে সব লেখকের লেখা থেকে সাহায্য পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যোগীন্দ্রনাথ বসু, শশাঙ্কমোহন সেন, নগেন্দ্রনাথ সোম, রাধারমণ মিত্র, অধ্যাপক ঋষিদাস, সুকুমার রায়, ডঃ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের পান্ডিত্য ও ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে, ঋণ স্বীকার করায় আমি গর্বিত।

কবি মধুসূদন যে কালজয়ী কবি ও তাঁর সৃষ্টি যে কালোত্তীর্ণ তার প্রমাণ যুগে যুগে প্রমাণিত। তবে পাঠককে একটি পত্র উপহার দিচ্ছি, কবি কন্যা শর্মিষ্ঠার বিবাহের পত্র।

শর্মিষ্ঠার বিবাহের পর হেনরিয়েটা বেঁচে ছিলেন মাত্র এক মাস উনিশ দিন এবং কবি শ্রী মধুসূদন বেঁচে ছিলেন এক মাস বাইশ দিন, এলিজা শর্মিষ্ঠার বিয়ে হয়েছিল উইলিয়াম ওয়াল্টার ইভান্স ফ্লোয়েড এর সঙ্গে সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল চার্চে, বুধবার ৭ই মে ১৮৭৩ সালে। তখন কবি বসবাস করছিলেন ২০ নং বেনিয়াপুকুর রোডে। অনেক কিছু সময়ের অভাবে সংযোজন করা সম্ভব হল না। আরো নতুন তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ করার ইচ্ছা রইল।

আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করবেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ভাইস-চ্যান্সেলর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী আশিষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিকট। দাঁড়াও পথিকবর গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী পাঠ্য নির্দিষ্ট হওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ সম্মানীয় সকল সদস্যগণের কাছে।

কবির জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে শেষ করেও শেষ করতে পারছিনা, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ও মনের মধ্যে যথেষ্ট আছে। যতই এগিয়ে চলি দেখি কবির সমগ্র জীবন তাঁর সমগ্র জীবনের রাজকীয় ঘটনা, আত্মবিশ্বাসের ঘটনা, সৃষ্টির ঘটনা, উদভ্রান্ত মদমত্ততার ঘটনা, চঞ্চলতার ঘটনা, সৃষ্টির উল্লাস, অস্থিরতার ঘটনা যেন আমার সামনে বার বার ফুটে উঠছে। এই গ্রন্থ রচনা করবার জন্য আমাকে ছুটতে হয়েছে কবির পিছু পিছু ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীর ১২ নম্বর রুঁ দে শান্তিয়ে-র বাড়ীতে সেখানেও উঁকি মেরেছি চতুর্দশ লুইয়ের প্রাসাদতম অট্টালিকাতে, ইংল্যান্ডে যেখানে বর্তমান দূরদর্শন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, কবি থাকতেন তারই পাশে। যেতে হয়েছে মাদ্রাজে, শুধু হেনরিয়েটা ও রেবেকার জন্য, যেতে হয়েছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতার প্রায় সর্বত্রই ছুটে ছিলাম, ছুটেছিলাম যশোহরের সাগর দাঁড়ীতে, কিন্তু হায় এই সাগরের কূল কিনারা আজও পেলাম না।

কবি খুব একটা কম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সাথে মিশতেন না বোধ করি, তাঁর সংস্পর্শে যেসব মানুষেরা ছিলেন তাঁকেই ঘিরে তারা প্রত্যেকেই স্বনাম ধন্য। বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাস বসাক, বাবু মনোমোহন ঘোষ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি রাজনারায়ণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তাঁরা কবির ছায়ার সঙ্গী ছিল। এছাড়া কবির পাশে সৃষ্টির নেশায় ও প্রতিভার আকর্ষণে তদানীন্তন কালে রাজা জমিদারগণও পাশে দাঁড়াতে ভোলেন নি। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) প্রমুখ বহু অর্থবান ও জমিদার শ্রেণী কবির পাশে ছিলেন।

একবার পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত জমিদার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বড় স্বাদ হয়েছিল কবির সঙ্গে তার একটি ফটো থাকুক। ১৮৬০ সালের মে মাসে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রস্তাবে কবিও রাজী হলেন, সে যুগে সবথেকে বিখ্যাত ছবি তোলা প্রতিষ্ঠানের নাম মিঃ টি. রাইনেক, ফটোগ্রাফার, ১৫ চৌরঙ্গী রোড। কবিকে নিয়ে যতীন্দ্র মোহন সেখানে গিয়েছিলেন ছবি তুলতে কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য আমাদের ও দুর্ভাগ্য সে ছবিটি ভালো না ওঠায় তা কবি গ্রহণ করেন নি। পরবর্তীকালে অতি অবহেলায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী থেকে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে কবির আর কোনো ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। তবে মধুসূদনের মৃত্যুর পর ডেভিড গ্যারিক কবির একটি তৈল্য চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার বাণিজ্যিক মূল্য পেয়েছিলেন প্রচুর। কবির পৌত্র নেভিল চার্লস ডটন ছবিটি দেখেছিলেন, কিন্তু ছবিটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবে তিনি অতুল বসুকে একটি ছবি আঁকতে অনুরোধ করেছিলেন। অতুল বসু ছবি দুটি আঁকেন মধুসূদনের এবং হেনরিয়েটার। খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং গর্বের ব্যাপার মধুসূদনের ছবিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সুরক্ষিত আছে, হেনরিয়েটার ছবিটি অতুল বসুর পুত্রের কাছে আছে। শর্মিষ্ঠার বিবাহের একটি চিঠি সংযোজন করে প্রস্তাবনা শেষ করব।

Mr. and Madame Michael M. Dutta

Present their compliments to Babu Gour Das Bysack and request the pleasure of his company to witness the Nuptials of their only daughter Henrietta Eliza Sermista to William Walter Evans Floyd. at St. Paul's Cathedral. on Wednesday, the 7th proximo. at 5 p.m. and thence to their residence, 20, Beniapukur Road.

Cake and Wine

Calcutta

29th April, 1873

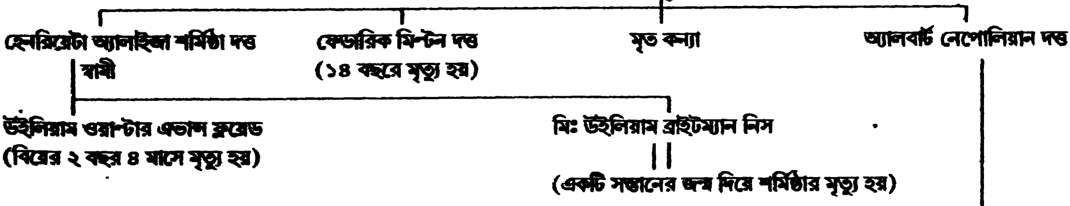
কিছু ঘটনা না বললেও নয়, মাদ্রাজ থেকে যখন তিনি প্রায় পালিয়েই এসেছিলেন কলকাতায় নিজের বাড়ীতে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বাড়ীতে ঢুকতেই পারলেন না। তাঁর পিতৃব্য পুত্র তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলেন না। কারণ মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত, সমস্ত অধিকার থেকে তিনি নাকি বঞ্চিত। বাড়ীটির নম্বর ছিল ২০এ, পরবর্তীকালে ২০বি, ২০সি, বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যদিও বাড়ীটিতে সেই সময় রাজনারায়ণের দাদা মদনমোহনের পুত্র প্যারীমোহন দত্ত বাস করছিলেন। বাস করছিলেন রাজানারায়ণের তৃতীয় স্ত্রী হরকামিনী দত্ত, প্যারীমোহন দত্ত হরকামিনী দত্তকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, এসব ঘটনা মধুসূদন দত্ত শুনেছিলেন। পরবর্তীকালে মধুসূদন আইনের পথে আশ্রয় নেন এবং বাড়ীটি উদ্ধারও করেন, মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি করেন, বিক্রি করে তিনি এন্টালি ২০ নম্বর বেনিয়াপুকুরে বাসা ভাড়া করেন। তার পরে ১নং লোয়ার সারকুলার রোডে চলে আসেন। হরিমোহন দত্তের পরে বাড়ীটি দুবার বিক্রি হয়, ১৯১০-১৯৪০ সালের মধ্যে, বাড়ীটি নিয়ে একটি সমস্যা দাঁড়াল তখন বাড়ীটিতে রিসিভার বসল এবং কোর্টের অধীনস্ত হল। তার বেশ কিছু বছর বাদে কোর্টের মাধ্যমেই বাড়ীটি ক্রয় করলেন শ্যামবাজার নিবাসী সুধীর কুমার নন্দন অতি অল্প মূল্যে। যদিও সুধীর বাবুর পুত্র কন্যা আছে জীবিত, বড়ই পরিতাপের বিষয় বাড়ীটি আজ স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর হাতে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কেউ বোধহয় দায়বদ্ধ নন। আগামী দিনে হয়ত মধুসূদনের এই সুন্দর বাড়ীটিও অমর্যাদার সঙ্গে কোনো প্রোমোটারের কুক্ষিগত হবে। বর্তমান বাড়ীটির ঠিকানা ২০বি, কালমার্কস সরণী, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩। এই বাড়ীর কাছাকাছি থাকতেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জয় নারায়ণ ঘোষাল এমনকি সাধক কবি রামপ্রসাদ এখানে চাকরিও করতেন। অক্ষয় কুমার দত্তের বাল্যকাল কেটেছিল মাতুলালয় এই খিদিরপুরে। সে কারণে এই স্থানের নামকরণ করা হয়েছে কবি তীর্থ। খিদিরপুরের এই কবি তীর্থকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশবাসীর।

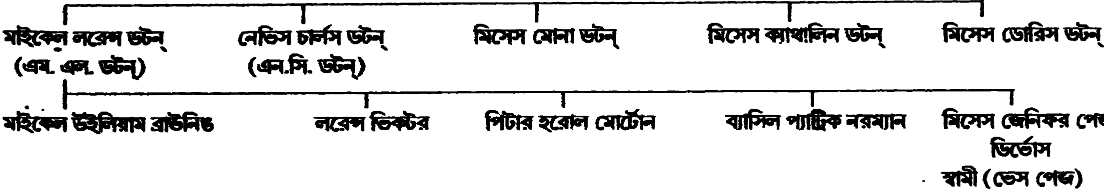
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশ পরিচয়

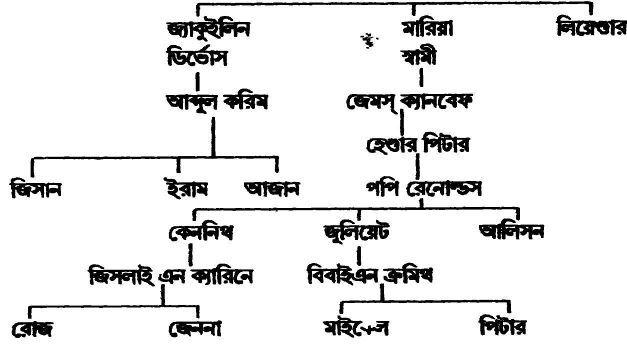
রামকিশোর
- রামনিধি
  - রাধামোহন
  - মদনমোহন
  - দেবীপ্রসাদ
  - রাজনারায়ণ
    - চার স্ত্রী
      - জাহ্নবী
        - মধুসূদন
        - প্রসন্নকুমার (১বছরে মৃত্যু হয়)
        - মহেন্দ্র নারায়ণ (৫ বছরে মৃত্যু)
      - শিবসুন্দরী — নিঃসন্তান
      - প্রসন্নময়ী — নিঃসন্তান
      - হরকামিণী — নিঃসন্তান
- দয়ারাম
- মানিকরাম

মধুসূদন
- স্ত্রী: রেবেকা টম্পসন ম্যাকট্যাভিশ দত্ত
- স্ত্রী: অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফিয়া হোয়াইট

সন্তান
- বার্থা ব্লেঞ্চ কেনেট দত্ত
  - স্বামী: ফ্রান্সিস জন হিগিনিস্ (ল্যান্স কর্পোরাল)
- ফিবি রেবেকা সালফেন্ট দত্ত
  - স্বামী: স্যামুয়েল ওয়াল্টার এইরিস (গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিক, ইনি বিপত্নীক ছিলেন)
- জর্জ জন ম্যাকটাভিশ দত্ত
  - স্ত্রী: এলিজাবেথ বেস্টিয়ান দত্ত (বিধবা ছিলেন)
  - (তাদের কোন সন্তান হয়নি)
- মাইকেল জেমস দত্ত (অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়)


মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশ পরিচয়
মাদ্রাজ সঙ্গিনী
অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফিয়া হোয়াইট
হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা দত্ত
স্বামী
ফেডারিক মিল্টন দত্ত
(১৪ বছরে মৃত্যু হয়)
মৃত কন্যা
অ্যালবার্ট নেপোলিয়ান দত্ত
উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েড
(বিয়ের ২ বছর ৪ মাসে মৃত্যু হয়)
মিঃ উইলিয়াম ব্রাইটম্যান নিস
(একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে শর্মিষ্ঠার মৃত্যু হয়)
মাইকেল নরেন্দ ডটন্
(এম. এন. ডটন্)
নেভিস চার্লস ডটন্
(এন.সি. ডটন্)
মিসেস মোনা ডটন্
মিসেস ক্যাথালিন ডটন্
মিসেস ডোরিস ডটন্
মাইকেল উইলিয়াম ব্রাউনিঙ
নরেন্দ ভিক্টর
পিটার হরোল মোর্টোন
ব্যাসিল প্যাট্রিক নরম্যান
মিসেস জেনিফর পেজ
ডির্ভোস
স্বামী (ভেস পেজ)
জ্যাকুইলিন
ডির্ভোস
মারিয়া
স্বামী
লিয়েণ্ডার
আব্দুল করিম
জেমস্ ক্যানবেক
হেণ্ডার পিটার
জিসান
ইরাম
আজান
পপি রেনোল্ডস
কেননিথ
জুলিয়েট
আলিসন
জিসলাই এন ক্যারিনে
বিবাইএন ক্রমিথ
রোজ
জেননা
মাইকেল
পিটার





সূচীপত্র

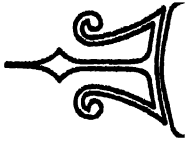
কৃতজ্ঞতা

যে সব মহাত্মাগণের উৎসাহে আমি এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ বোধ করেছি তাঁদের নাম উল্লেখ করেও ঋণ পরিশোধ হবে না জানি তবু ক্ষীনতম শান্তি ও আনন্দ পাব এই ভেবেই উল্লেখ করলাম।

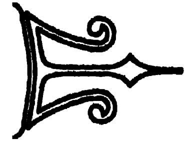
প্রয়াত অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী, প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, প্রয়াত প্রধান বিচারপতি শংকর প্রসাদ মিত্র এছাড়া যে সব মহান লেখকগণের গ্রন্থ আমাকে সাহায্য করেছে, অত্যন্ত আনন্দেও গর্বে তা স্বীকার করলাম সেই সব লেখকও শুভানুধ্যায়ীগণের নাম— যোগীন্দ্রনাথ বসু, শশাংক মোহন সেন, অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ, অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রী রাধারমন মিত্র, শ্রী রাধারমন রায়; ডঃ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতি সাহিত্য মন্দির এবং সুকুমার রায়। এই গ্রন্থে মধুসূদন সংক্রান্ত ছবি দিয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন মিসেস জুলিয়ানে (ফ্রান্স) এবং শ্রী দীপঙ্কর রায়চৌধুরী (কলকাতা) সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আমি লিখেছি যে সব গ্রন্থ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অপ্রকাশিত শ্রীমধুসূদন', 'মধুসূদন স্মৃতি', ''দাঁড়াও পথিকবর' তবে বর্তমান গ্রন্থ 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল' সম্পূর্ণ সার্থক গ্রন্থ। যে সব তথ্য সংযোজন করে সংকলিত হয়েছে তা বোধ করি মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যথেষ্ট।

জীবনের বহু সমস্যাকে মাথায় রেখে, অর্থাভাব, অন্নকষ্ট, ব্যাথা-বেদনা এবং সৃষ্টির আবেগে এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। বার বার মনে হয়েছে মধুসূদন আমাকে আশীর্বাদ করছেন যেন তাঁরই শক্তিতে বীররসে তাঁর জীবনের ধারাকে সামনে রেখে আবেগ জর্জ্জরিত কণ্ঠে মন্দোদরীর মতো আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেন অস্পষ্ট ভাবে আমার অজান্তে আমি বলে ফেলেছি 'মজালে জীবন আমার মজিলা আপনি'। গ্রন্থখানি পাঠকের ভালো লাগলে আমি আনন্দ অনুভব করব।



কবির বাল্যজীবন, বংশ পরিচয় বিদ্যাচর্চা ও আত্মবিশ্বাস



মহাকবি মধুসূদন দত্তের পূর্বপুরুষেরা যশোহরের সাগরদাঁড়িতে বাস করতেন না, তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল খুলনা জেলার অন্তর্গত তালগ্রামে। এই তালগ্রাম ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। জল কাদা মাটি আর বিপুল বৃক্ষ সমারোহে তালগ্রাম ছিল বন্দী। নব্য মুসলমান জমিদারের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও ঔদার্যে তালগ্রামের প্রজাবর্গ ছিল সুখে। সেখানেই বসত্ বাড়ি ছিল কবি মধুসূদন দত্তের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্তের।

রামকিশোর দত্তের খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থা ছিল না। কথিত আছে রামকিশোর ছিলেন উদার মানুষ, তাঁর দান দয়ার কথা বহুদিন মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত। দীন হীনে ছিল তাঁর অসীম দয়া। নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, নিজের পুত্রগণের কথা না ভেবে, আপন খেয়ালে উদার মনে উজাড় করে দিয়েছেন সব কিছু। আত্মীয়-অনাত্মীয় দীন-দরিদ্র সকলকেই তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন।

জীবনকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ভগবান তাঁকে দেন নি। তাই তিনি হয়েছিলেন নিঃস্ব। পুত্রদের ভবিষ্যতের কথাও তিনি ভাবেননি, তিন পুত্রের পিতা হয়েও পুত্রদের জন্য তিনি কিছুই করতে পারেন নি। অভাবের তাড়নায় সংসারে যা হয় তাই হল। প্রথম পুত্র ছিলেন রামনিধি, রামনিধি তাঁর দুই ভাই দয়ারাম ও মানিকরামকে সঙ্গে নিয়ে চিরতরের জন্য তালগ্রাম ছেড়ে দিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিষ্ঠুর ভাগ্য তাড়নায় উপায়হীন অবস্থায় মামার বাড়ি সাগরদাঁড়িতে উঠলেন।

রামনিধি তাঁর ভরা সংসার ও নিজের দুই ভাই এই বিশাল সংসার নিয়ে পড়লেন ভীষণ বিপদে। সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়তে লাগল। দুই ভাই, দাদার এই চরম বিপর্যয় দেখে নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। তবুও রামনিধি নিজের অর্থ সংকট দূর করতে পারলেন না। অভাব যেন সংসারকে অক্টোপাসের মত ধরে রাখল। রামনিধির চার পুত্র, বড় ছেলে রাধামোহন, দ্বিতীয় মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং সর্ব কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ ছিলেন কবি মধুসূদনের পিতা।

রামনিধি তাঁর বড় ছেলেকে প্রায় সময় তিরস্কার করতেন। উপযুক্ত পুত্র হওয়া সত্ত্বেও রাধামোহন আলস্যে দিন কাটাতে লাগলেন। ঘরে উপযুক্ত ছেলে বসে বসে খাবে আর বৃদ্ধ পিতা পয়সা রোজগারের জন্য উদয় অস্ত খাটবে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সংসার যখন প্রায় অচল হতে বসেছে তখনও রাধামোহনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অবলীলাক্রমে আলস্যে দিনাতিপাত করে যাচ্ছেন। একদিন বৃদ্ধ রামনিধি ভয়ঙ্কর ভাবে তিরস্কার ও অপমান করলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহনকে। এতদিন পর রাধামোহনের চৈতন্য ফিরল, দুঃখে লজ্জায় অভিমানে ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবেন আর কোথায়? যশোহর জেলার মধ্যেই রইলেন,

বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে দিন কাটাতে লাগলেন। সারাদিন কাজের খোঁজে ঘোরেন আর সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়ের বাড়িতে কোন রকমে রাত অতিবাহিত করেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটল। তবে রাধামোহন শিশুকাল থেকে সংসার জীবনে উদাসীন থাকলে কি হবে বিদ্যা অর্জনে কোনদিন আলস্যতা দেখান নি। খুব ভাল পারস্য ভাষা জানতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে ভালও বাসতেন। এত ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারলেন না। দিন আর কাটে না। একদিন বসে আছেন ভীষণ মন মরা হয়ে, এক বন্ধু তাঁকে ডেকে বলল, চল্ আমার সঙ্গে, আমার অফিসে সব বড় বড় সাহেবরা আছে, তাদের সাথে দু একটা ইংরাজীতে কথাও বলতে পারবি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস। চল খুব ভাল লাগবে। রাধামোহন বন্ধুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে চলে গেল। একটা চেয়ারে চুপ করে বসে দেখতে লাগল, অফিসের সব বাবুরা কত ব্যস্ত। হয়ত ঈশ্বরের কাছে সবার অজান্তে গোপনে প্রার্থনা করেছিল, এমনি একটি চাকরি সে যদি পেত তাহলে এ জন্মের মতো বেঁচে যেত। হয়ত ঈশ্বর তার গোপন প্রার্থনা শুনেছিলেন।

সাহেবদের অফিস, তারপরে আবার যা তা অফিস নয়, একেবারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিস। বন্ধুর সামনে চুপ করে বসে রইল। অফিস মানেই শুধু কর্মব্যস্ততা, তারই মধ্যে আপন মনে রাধামোহন বসে আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হঠাৎ সমস্ত বাবুদের ঘরে ডাকলেন, অফিসে যত করনিক বাবু ছিল সবাই ম্যাজিস্ট্রেট-এর সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটি লিখিত রিপোর্ট দিয়ে বললেন এর বাংলা ও ইংরাজী অর্থ কি আমাকে বুঝিয়ে দাও। সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বড়বাবু বললেন, এটি তো পারস্য ভাষায় লেখা। ভাষা না জানলে অর্থ ভেদ কি করে করব। ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা কেউ পারস্য ভাষা জানো না? বড় বাবু সহ সব বাবুরা বলল, না সাহেব। চেয়ারে বসে বসে রাধামোহন সব শুনছিলেন। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্ধুটিকে ইঙ্গিত করে বলল, সাহেবকে বল আমি অনুবাদ করে দেব। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে রাধামোহনকে সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, স্যার আমার এই বন্ধুটি পারস্য ভাষা জানে, ও আপনাকে এর অনুবাদ করে দিতে পারবে। সাহেব কথাটি শুনে বলল, তোমার নাম কি ?

রাধামোহন দত্ত।

সাহেব বললেন, ঠিক অনুবাদ করতে পারবে তো?

রাধামোহন বলল, নিশ্চয় স্যার, আপনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে আমার অনুবাদ দেখিয়ে নিতে প্পারেন, বলে রিপোর্টখানি সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পারস্য ভাষায় পড়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। সাহেব তো অবাক, যুবকের তো অগাধ পাণ্ডিত্য পারস্য ভাষায়। সাহেব তার জ্ঞানের জন্য, পাণ্ডিত্যের জন্য ভীষণ খুশি। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের অফিসে রাধামোহনের ১টি কাজ পাকা হয়ে গেল।

রাধামোহনের কাজে দিনে দিনে সাহেব ভীষণ খুশি হতে লাগলেন। সাহেবের হলেন বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র। এখন রাধামোহন সাহেবের এক নম্বর লোক। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন

যুবক রাধামোহনের ভ্রাতাগণ তখনও বেকার। ধীরে ধীরে ভ্রাতাগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলেন। সাহেব রাধামোহনের কাজে এত পরিতৃপ্ত যে তাকে আদালতের সর্বোচ্চ পদ সেরেস্তাদারিতে উন্নীত করলেন। এবার আর রাধামোহনকে কে পায়, ভ্রাতা মদনমোহনের জন্য ব্যবস্থা করলেন কিছু দিনের মধ্যে।

সে ব্যবস্থা তো যা তা ব্যাপার নয়। একেবারে যশোহরের বীর মুন্সি। পরবর্তীকালে কুমারখালির মুন্সেফ নিযুক্ত হলেন। তৃতীয় দেবীপ্রসাদ যশোহরের বিশেষ আদালতের এক উচ্চ পদে আসীন হলেন। সর্ব কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হলেন। এই সময় থেকে দত্ত বংশের যশ প্রতিপত্তি দান ধ্যানের খ্যাতি যশোহর জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। দান ধ্যানে চারি ভ্রাতাই ছিলেন উদার ও মহান। যে কোন মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। শোনা যায় দত্ত বংশের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ছিল প্রকট। পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এর বীজ প্রোথিত ছিল।

মধুসূদন দত্তের খুল্লপিতামহ মানিকরাম ছিলেন কবি। কবিত্ব শক্তি ছিল মানিকরামের প্রকট। তিনি এক ধনী মুসলমানের অধীনে চাকরি করতেন। পারস্য ভাষায় নিজে কবিতা লিখে ঐ ধনী মুসলমান প্রভুকে শোনাতেন। মানিকরামের কবিতা শ্রবণ করে তিনি খুবই আত্ম-পরিতৃপ্ত হতেন। এই মুসলমান শুধু ধনী ছিলেন না, তদানীন্তন কালে তিনি একজন নামজাদা জমিদারও ছিলেন। মানিকরামের কবিতা শুনে জমিদারের কন্যাও মোহিত হয়ে যেত। কবিতা এমন হৃদয়গ্রাহী হত যে কন্যাটি মানিকরামের কাছে প্রায়ই সময় থাকত, তার প্রতিভা ও কর্ম দেখে জমিদার কন্যা মানিকরামকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি সরাসরি প্রস্তাবও দিল আমি তোমাকে বিয়ে করব। মানিকরাম উচ্চ বংশজাত দত্তকুলোদ্ভব আর মেয়েটি মুসলমান। আবার তাঁর প্রভু কন্যা। প্রভু কন্যার আব্দার রক্ষা না করতে পারলে হয়ত তার সমূহ বিপদও হতে পারে। জমিদার তার কন্যার মনের ভাব বুঝে কন্যার শান্তির জন্য মানিকরামকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দিল। মানিকরাম দেখল এ তো মহা বিপদ। স্বধর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আবার তারপর মুসলমান ধর্ম, কোনমতেই তিনি মেনে নিতে পারলেন না। জমিদার যতই বলেন মানিকরাম ততই নীরব থাকেন। উপায়হীন অবস্থায় নিজের ধর্মের অমর্যাদা না করে হঠাৎ একদিন জমিদারের চাকরি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। একেবারে সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে অশান্ত হৃদয় নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। জমিদার কন্যার বেদনার কথা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেই উপলব্ধি করতে পারেননি। ধর্মকে পরিত্যাগ করা মানিকরামের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতে তার কবিত্ব-শক্তি বিনিষ্ট হল, হারিয়ে গেলেন জনঅরণ্যের মধ্যে। কোথায় গেলেন কেউ জানে না।

কবিত্ব শক্তি তৃতীয় পিতৃব্য দেবীপ্রসাদেরও কিছুটা ছিল। ছন্দ মিলিয়ে কবি কৃত্তিবাসের অনুকরণ করে কিছু কিছু পদ্য রচনা করতেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ কবি ছিলেন না, তবে সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পূর্বপুরুষের নানা স্রোত-কাব্য, দান, ধ্যান, উদারতা, বিলাসিতা, বিদ্যার্জন সব কিছু এসে মিলেছে মধুসূদন নামক মোহনায়।

তাই তো মধুসূদনের জীবনে আমরা দেখতে পাই কোথাও চরম বিলাসিতা, চরম অর্থ কষ্ট, আশার নেশা, বিদ্যা অর্জন, দান-ধ্যান, উদারতা, পালিয়ে বেড়ান, কবিত্ব শক্তি সবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তবে তাঁদের মধ্যে ছিল খণ্ড খণ্ড ঘটনা আর মধুসূদন অখণ্ড হয়ে রইলেন পূর্বপুরুদের সব কিছু গলাধঃকরণ করে। তাইতো বলতে হয়-হয় বিশ্ববিজয়দর্পী নেপোলিয়ন নয় সর্বত্যাগী বুদ্ধ অথবা যীশু, হয় রত্নাকর নয় বাল্মিকী, হয় আল্পস নয় মরুভূমি। এই না হলে মধু।

মধুসূদন পূর্বপুরুষগণের সব গুণের ও দোষের অধিকারী হয়েছিলেন. পূর্ব-পুরুষ গণের বিবিধ দোষগুণ তাঁর শরীরে সংপৃষ্ট হয়েছিল তাঁরই অজ্ঞানে। সেই সব দোষগুণের মাত্রা মধুর জীবনে ভয়ঙ্কর ও প্রকট আকার ধারণ করল। রামকিশোর দত্তের অভাব ও যন্ত্রণা আর তার পুত্র রামনিধির স্বভূমি পরিত্যাগ, উন্মাদনা, অস্থিরতা তার পুত্র রাধামোহন, মদনমোহন, দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণের কাব্যপ্রীতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাহস, বিদ্যাচর্চা উদারতা দানধ্যান, প্রেম, মনুষ্যত্ব। তাছাড়া রামকিশোর দত্তের তিন পুত্র রামনিধি দয়ারাম ও মানিকরামের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তি এবং অসাধারণ ধীশক্তি, বৈরাগ্যতা সবই যেন মধুর জীবনে পাকাপাকি হয়ে উপবেশন করেছিল। মধু পূর্বপুরুষদের সব দোষগুণের আকর হয়ে নিজেকে মসৃণ মহাকাব্যিক চরিত্র করে তুললেন। তাঁর বাল্য ও যৌবন ধারার স্রোতে দেখা যায় কি অপরিসীম তেজ।

সেই বীর প্রতিভা যশোহরের সাগর দাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন বঙ্গের কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত। বাংলা ১২৩০ সালের ১২ মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি শনিবার। তবে অনেকে বলেন মধুসূদনের জন্ম ১৮২৩। এক্ষেত্রে জেনে রাখা উচিত বাংলা মাসের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে ইংরাজী অব্দ পাওয়া যায়। সেই হিসাবে ঠিক আছে, কিন্তু সাধারণত জানুয়ারি মাসে ইংরাজী নতুন বৎসর শুরু হয়, বাংলা মাস তখনও আরম্ভ হয় না। সেই জন্য জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্য্যন্ত ৫৯৪ যোগ করা কর্তব্য বাংলা সালের সাথে, তাহলে সত্য নিরূপিত হবে। বাংলা ১২৩০+৫৯৪=১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ। মতান্তর যাহোক তা নিয়ে সমস্যা বাড়াবার দরকার নেই।

শিশু মধুসূদন কেমন ছিল?

কবির জন্মের চার বছরের মধ্যে তাঁর আরো দুই ভাই জন্মেছিলেন। যদিও তাঁরা বেশি দিন পৃথিবীর জল, আলো, বায়ু পান নি। প্রসন্ন কুমার এক বছর, মহেন্দ্র নারায়ণ পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন।

জননী জাহ্নবী ছিলেন অসাধারণ গুণবতী মহিলা। পুত্রকে নিয়ে থাকতেন সাগরদাঁড়িতে, আর পিতা রাজানারায়ণ ছিলেন কোলকাতায়। মধুসূদনের এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বার বার তিনি পরাজিত হয়েছেন কূটনীতি ও কুটকৌশলের কাছে। বিদ্যা অর্জন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মধু বার বার পরাজিত হয়েছেন। কি বৈষয়িক ব্যাপার, কি সামাজিক-জীবন-জগতে অথবা কূট কৌশলে, শিশুকাল থেকেই তিনি পরাজিত।

সাগরদাঁড়িতে বন অরণ্য কাদা মাটি, পণ্ডিত মশাই-এর বেত আর মায়ের কোল মধুর নখদর্পণে। জাহ্নবী দেবীর নয়নের মণি মধু। মধুর পিছনে ছুটতে ছুটতে মাতা জাহ্নবী পাগল।

মধুর এক আত্মীয় সেও মধুর সমবয়সী, বন্ধুর মত। একদিন মধুকে বলল, চল আজ রস চুরি করতে যাব। মধুকে প্রায় জোর করে নিয়ে গেল খেজুর বাগানে। দুই বন্ধু এবং মধু তিন জন মিলে চলল রস চুরি করতে। এই দুই বন্ধু আর কেউ নয়, এরা মধুর পিতৃব্য পুত্র।

তিনজনই খেজুর গাছে উঠে রস খাচ্ছে। হঠাৎ খেজুর গাছের মালিক ছুটে আসতেই দুই বন্ধু পালিয়ে গেল, মধু আর গাছ থেকে নামতে পারল না। গাছটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্না আরম্ভ করে দিল। এত জোরে কান্না আরম্ভ করল যে বাড়ি পর্যন্ত সে আওয়াজ এসে গেল। বাড়ির চাকর ছুটে গিয়ে মধুকে আবার খেজুর গাছ থেকে নামিয়ে আনল। খেজুর গাছের মালিক ছাড়বে কেন? মধুকে বেশ ভর্ৎসনা করে বলল, ভদ্রলোকের ছেলেরা এইসব কাজ করে। শিশু মধু মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে মায়ের কোলে বসে পড়ল। অপরের বুদ্ধিতে পড়ে মধু কত যে বিপদাপন্ন হয়েছে তার হিসাব করেও শেষ করা যাবে না।

কবি ছোট বেলায় সাঁতার কাটতে খুব ভালো বাসতেন, খুব ছোটবেলায় খেজুর গাছে উঠে নামতে না পারার জন্য যেমন শিউলির হাতে ধরা পড়েছিল, পরবর্তী কালে গাছে ওঠাতে বিশেষ পটুও হয়েছিলেন। জৈষ্ঠ মাসে আম, কাঁঠালের বাগানে কম দৌরাত্ম দেখান নি।

একবার গাছের কোটর থেকে একটা পাখির ছানা পাড়লেন। পাখি পুষতে তাঁর ভীষণ সখ ছিল। পাখির ছানাকে নিয়ে ভীষণ গন্ডগোল বাধল, অন্যান্য বন্ধুরা এসে বলল—এ পাখি আমার, মধু বললেন, আরে ভাই আমি তো নিজে হাতে গাছের গর্ত থেকে পাখির বাচ্চাটাকে পেড়ে আনলাম, অন্যান্য বন্ধুরা পাখির বাচ্চাটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করল, মধু রাগে পাখির বাচ্চাটাকে হত্যা করল বিরোধ এড়াবার জন্য। তাঁর জীবনের এই প্রথম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেলাম। তাই বলে পড়াশুনায় তার কোনো অবহেলা ছিল না, বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলেন মধুর কাছে অসাধ্য কিছু নেই।

মায়ের কোলে বসে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনতেন গভীর মনোযোগ সহকারে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মধুর জীবন গড়ে উঠেছে মায়ের স্নেহ ভরা গভীর ভালবাসায়। সন্ধ্যা হতে না হতে নিজেই মায়ের কোলে এসে বসতেন রামায়ণ শোনার জন্য। মা আদর করে অতি যত্ন সহকারে মধুকে শোনান ভগবান রামচন্দ্রের কথা। শোনাতেন রাক্ষসরাজ রাবণের কাহিনী। মধু অবাক হয়ে শুনতেন বিস্ফারিত নয়নে। যেন হাজার হাজার প্রশ্ন. সে প্রশ্নের প্রকাশ নেই। মনের গহনে নীরবে শিশু মনে বার বার উঁকি দিয়েছে কত প্রশ্ন। শিশুর মুখে ভাষা নেই, নেই প্রকাশ-ভঙ্গির ক্ষমতা। তাই তো শিশুর মন জিজ্ঞাসায় ভরা। শিশু মধু আশাতিরিক্ত পেয়েছেন স্নেহ ভালবাসা। সেই স্নেহ ভালবাসাকে সম্বল করে শিশুকাল থেকেই হয়েছিলেন যথেচ্ছচারী। অতিরিক্ত প্রশ্রয় দানে সদগুণের সঙ্গে তাঁর মজ্জায় মজ্জায় ঢুকেছিল স্পর্ধা যা পরবর্তী কালে জীবনকে জটিল করে তুলেছিল।

সাগরদাঁড়ির সৌন্দর্য আর উদার প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ শিশু মধুকে দিয়েছিল অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি। মাতার স্নেহ ও পরম ভালবাসা শিশুকে করে তুলেছিল অবাধ্য। শিশু দেখেছে অতীব অর্থব্যয়, পিতার মত মাতাকেও গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া, স্নেহপরায়ণতা আর পরদুঃখে কাতরতা। শিশু মধু সবই দেখেছে। মধুর অবাধ্যতার কোন দোষ জাহ্নবী দেবী কোন দিন

দেখেন নি। শুধু মাতার স্নেহ নয়, বাড়ির প্রতিটি মানুষ মধুকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। শৈশবে যে সুখ ও ভোগে মধুর জীবন অতিবাহিত হয়েছে তা বোধ করি কোন রাজপুত্রের হয় নি। মধু চোখের অন্তরাল হলে জাহ্নবী দেবী আকুল হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়তেন। পাঠশালা থেকে ফিরতে একটু দেরী হলে জাহ্নবী দেবী উন্মাদের মত আচরণ করতেন। চাকরদের পাঠাতেন মধুকে আনবার জন্য। কিন্তু মধুসূদন ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান, অত্যাধিক আদর ও স্নেহের মধ্যে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা অর্জনে কোন দিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করেননি।

গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সেদিন শিশুরা যেতে ভয় পেত। পড়া ঠিক মত না করতে পারলে, গুরুমহাশয়ের বেতের ঘা নিদারুণ ভাবে পৃষ্ঠ দেশকে আঘাতে জর্জরিত করে তুলত। সেই দিন শিক্ষার নামে শিশুদের হৃদকম্প উঠত। এমন কোন ছাত্র নেই যে তার শরীরে গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত পড়েনি। গুরুমহাশয়কে দেখলেই অনেক ছাত্র নিজের মুখস্থ করা পাঠ ভুলে যেত। কারো মুখে কোন কথা নেই, গুরুমহাশয়ের এই অতীব ভয়ে যখন শিশুরা পাঠশালায় যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত মধু কিন্তু পাঠশালায় যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন এবং সবার আগে মধু পাঠশালায় উপস্থিত হতেন। সবার আগে পাঠ দেবার জন্য গুরুমহাশয়ের সামনে বসতেন। কখনোও পাঠশালায় না যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

একদিন মধু ঠিক মত পড়া না পারায় গুরু মহাশয়ের কয়েকখানি বেত মধুর পৃষ্ঠ দেশে পড়েছিল। শিশু মধুর মধ্যে ভীষণ অভিমান জন্মালো, অথচ বাড়িতে মধু কাউকে বলেননি বেত্রাঘাতের কথা। সকালবেলা স্নান করবার সময় জাহ্নবীদেবী দেখলেন তার পুত্রের গায়ে বেত্রাঘাতের দাগ। ব্যাস জননী জাহ্নবী তো আগুন, এতবড় সাহস মধুর গায়ে আঘাত করা। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন ঠিক এমনি করে গুরুমহাশয়ের গায়ে বেত্রাঘাতের দাগ করে দিতে হবে। ওকে বোঝাতে হবে, নিশ্চয়ই ওকে বোঝাতে হবে বেত্রাঘাতের আঘাত কত যন্ত্রণাদায়ক। এইটুকু শিশুকে কেউ এমনভাবে মারে? জাহ্নবীদেবী কয়েক জনকে ডেকে বললেন, তোমরা গুরুমহাশয়কে আমার কাছে ডেকে আনো।

সঙ্গে সঙ্গে মধু মায়ের গলা জড়িয়ে বললেন, মা গুরুমহাশয়ের দোষ কোথায়? দোষ তো আমার। আমার পাঠ আমি যদি না করি তাহলে গুরুমহাশয় মারবেন না? মধুর এই কথায় জাহ্নবীদেবীর সম্বিত ফিরে এল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সকলের অগ্রে তো উপস্থিত হতেন এবং সকল ছাত্রদের মধ্যে কি ভাবে সেরা ছাত্র হবেন তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন, মায়ের কাছ থেকে সব পড়া ঠিক করে নিতেন।

পড়া সব ঠিক হয়ে গেলে মধু রাজার মেজাজে স্কুলে যেতেন। যেখানে অন্যান্য বালকেরা গুরুমহাশয়কে দেখলে চোরের মত থাকত মধু সেখানে রাজার মেজাজে কথা বলতেন। তিনি তো লেখাপড়ায় কখনো ঔদাসিন্য দেখান নি। শোনা যায় অতীব আদরে সন্তানের লেখা পড়া হয় না। কিন্তু মধুর মত এত স্নেহ আদর কোন রাজপুত্রও পায় নি। যখন এইসব বালকেরা খেলাধূলায় মত্ত যখন এই বালকেরা [illegible] বস্তুর জন্য কোলাহলে মত্ত তখন মধু আপনমনে গ্রন্থ খুলে মায়ের কোলে বসে বসে [illegible] মুখস্থ করছেন। সবার থেকে মধু শ্রেষ্ঠ ও বড় এই প্রমাণ করবার জন্য তাঁকে অনেক [illegible] পড়তে হত। গুরুমহাশয় আদরও করতেন খুব বেশি।

পাঠশালা থেকে ফিরতে দেরী হলে জাহ্নবী দেবী বড় অসহায় বোধ করতেন, মধু যেন চোখের মণি, এক মিনিট চোখের আড়াল হবার জো নেই। খেলাধূলার প্রতি মধুর খুব একটা অনুরাগ ছিল না। অনুরাগ ছিল শিশুকাল থেকে শিক্ষার্জনের। তাইতো সব কিছু ভুলে মায়ের কোলে বসে বসে রামায়ণের গল্প শুনতেন। কপোতাক্ষ নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর জীবনের ভিত্ গড়ে উঠেছিল।

রাজনারাণ তখন কোলকাতায় থাকতেন। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান আদরের প্রাণনিধি, মধুর বিরুদ্ধে কথা বলার মত ঐ বংশে কেউ জন্মায়নি। শৈশবে গুরুজনদের কাছ থেকে এত বেশি প্রশ্রয় পেয়েছিলেন মধু যে তার অসংগত ও স্বেচ্ছাচারী কর্মের প্রতি কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃত আত্মসংযম রক্ষার সুযোগ থেকে মধু হয়েছিলেন বঞ্চিত।

তার জন্য তাঁর জননী জাহ্নবী কিয়দংশে নিশ্চয়ই দায়ী। অতিরিক্ত স্নেহবশত সে হয়ে উঠেছিল দেবশিশুর পরিবর্তে দানব শিশু। জাহ্নবী দেবীর উদাবতা শুধু যে মধুকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছিল তা নয় স্বামী রাজনারায়ণও হয়ে উঠেছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। জাহ্নবীদেবীর ঔদাসীন্য এবং সাংসারিক অনভিজ্ঞতায় পিতা-পুত্র উভয়েই হয়েছিলেন ভোগী ও স্বেচ্ছাচারী। নচেৎ জাহ্নবীদেবী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনি আরো তিনবার বিবাহ করলেন কোন সাহসে? স্বামীর এই অসংযম চিত্তকে তিনি কি প্রতিরোধ করতে পারতেন না? পরবর্তীকালে যার পুত্র শিশু নয়, কিম্বা যার স্বামীর স্ত্রী বিয়োগ হয়নি। মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করে যখন গৃহের বাইরে পালিয়ে আছেন, ঠিক সেই সুযোগে নিজ বিবাহের প্রস্তাব দিলেন জাহ্নবীদেবীকে, জানো জাহ্নবী, মনে হয় মধু আর ফিরবে না, পালিয়ে গেছে, তবে আমাদের জল পিন্ডের উপায় কি হবে? সন্তানের হাতের জলপিণ্ড না পেলে তো আত্মার শান্তি হবে না। দেবতার ভয়, ধর্মের ভয়, সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন, তাছাড়া সেই সময় জাহ্নবীদেবী ছিলেন পতিভক্তিপরায়ণা নারী। কোন প্রতিবাদ নেই। যদিও সেই আমলে অনেকেই বহু বিবাহ করতেন, অর্থের দাম্ভিকতায় অর্থাৎ মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু রাজনারায়ণের মত একজন জ্ঞানী ও বাস্তববাদী পুরুষের পক্ষে হয়ত এটা উচিৎ হয়নি। মধু এসব ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে। জাহ্নবীদেবী স্বামীর প্রতিটি বাক্য বেদজ্ঞানে মেনে নিয়েছেন। যখন পুনর্বার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, জাহ্নবীদেবী বললেন, তোমার মঙ্গলই আমার মঙ্গল। যদি পুত্রজন্মে তুমিও স্বর্গলাভের অধিকারী হও, আমিও হব।

রাজনারায়ণ নিজের স্বার্থে নিজের ভোগী জীবনকে আরো সুন্দরভাবে মনোরম পরিবেশে উপভোগ করবার জন্য তিনবার বিবাহ করলেন। জাহ্নবী দেবীকে শুধু ধর্মের ভয় আর সন্তান পাবার আশায় অথবা স্বর্গপ্রাপ্তির ধোঁয়া দিয়ে সুন্দর কৌশলে সমর্থন আদায় করেছিলেন, সেই জন্য তো জাহ্নবীদেবীকে তিনি খুব ভাল বাসতেন, খুব বেশি স্নেহ করতেন। এই সব নানা অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও জাহ্নবী দেবী কোন দিন বিরোধিতা করেন নি। মধুর মনের মধ্যে কি এর কোন প্রতিফলন পড়ে নি? এত স্নেহ, এত প্রেম, এত প্রশ্রয়, এত মাতৃপিতৃ স্নেহ সব কোথায় গেল মধুর জীবন থেকে? কেন মধু এত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন? তার মাতার উদারতা আর পিতার ভোগ কামনা তাঁর মনকে কুরে কুরে খেয়েছে। জাহ্নবী দেবী কোলকাতায়,

রাজনারায়ণ গেলেন সাগরদাঁড়ীতে। সাগরদাঁড়ীতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ্ করলেন। বিবাহ্ কি হঠাৎ হয়। তার কি কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না? মধু তখন যুবক, তাঁর প্রায় বোহেমিয়ান চরিত্র হয়ে উঠেছে। বাবার সব কর্ম এবং মায়ের উদার নীতিকে কোনদিন সমর্থন করতে পারেননি। মায়ের এই নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য মনোভাবকে কোনক্রমেও সমর্থন করতে পারেননি। বার বার মধুর মাথা নিচু হয়েছে বন্ধুদের কাছে বাবার কৃত কর্মের জন্য, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী ও ব্যক্তিত্বময় যুবক পিতার ঔর্দ্ধত্যকে কোনক্রমে মেনে নিতে পারেননি। স্বেচ্ছায় নিজের জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলতে লাগলেন। পিতামাতার প্রেম, স্নেহ, ভালবাসার মূল্য মধুর কাছে কিছুই না। মধু কি শোনেনি রাজনারায়ণ-এর দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনা? আর বিয়েটা এমনিই হয়ে গেল! এর জন্য কি রাজনারায়ণের পূর্ব পরিকল্পনা করতে হয়নি? জাহ্নবী দেবী অনেক ঘটনা জানতে না পারেন, কিন্তু মধুর কিছুই অজানা ছিল না। রাজনারায়ণ সাগরদাঁড়ী থেকে সুন্দর কৌশলে জাহ্নবীদেবীকে একখানি চিঠি দিলেন। "আমি যে অন্যায় করেছি, হয়ত তুমি শুনেছ। এই কাজের জন্য যদি তুমি দুঃখ পাও, অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন রাখার আর দরকার নেই। জীবন পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি জান পৃথিবীতে মাত্র দুটি মানুষের কাছ থেকে আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়। এক জননী আর অপরজন সহধর্মিণী। তুমি জান আমার জননী স্বর্গে গেছেন, কেবল তোমার ভালবাসায় আমি সংসারাশ্রমে আছি। যখন শুনব তোমার ভালবাসা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি তখনই এ সংসার ত্যাগ করব। তোমার জন্য একটি সেবিকা এনেছি। আগামীকাল তাকে পিত্রালয়ে পাঠাতে হবে।

কি অদ্ভুত সুকৌশলে নিজের ভোগ চরিতার্থ করবার জন্য আপন সহধর্মিণী সরলপ্রাণা জাহ্নবী দেবীকে নানাভাবে নিজের করতলগত করেছেন স্বামী রাজনারায়ণ। অন্যায় কর্ম করলে কে না নতি স্বীকার করে? রাজনারায়ণকে তাই তো বার বার জাহ্নবী দেবীর কাছে অনুনয় বিনয় করতে দেখতে পাই। পিতার এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশোধ নিয়েছেন মধু বার বার। পিতার অর্থ তিনি প্রচুর ব্যয় করেছেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য রাজনারায়ণ মধুর ব্যয় নির্বাহে রাজি ছিলেন না। সমস্ত অর্থ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহ্নবীদেবীর আদেশে আবার অর্থ দেওয়া চালু করলেন। রাজনারায়ণ জানতেন জাহ্নবীদেবীর কথা না শুনলে হয়ত তার ব্যক্তি জীবনে ভোগ বাসনার পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। তাই জাহ্নবীদেবীর কথা মত তাকে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়েছে। মধু যা কিছু বুঝেছেন জীবন দিয়ে উপলব্ধি করে বুঝেছেন। কোন নৈতিক শাসন মধু গ্রাহ্য করেন নি। কেন উচ্ছৃঙ্খলতা সে দিন মধুর জীবনে প্রকটিত হয়েছিল, উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ রাজনারায়ণ নিজেই পুত্রের মধ্যে বপন করে দিয়েছিলেন।

ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

মধু প্রায় সময়েই বন্ধুদের বাড়িতে (খিদিরপুরের বাড়িতে) নিমন্ত্রণ করতেন। সেই সময় মধুর শরীরও ভাল ছিল না। ঐ অল্প বয়সে মদ্যপানে তাঁর শরীর হয়েছিল খারাপ। তবে নারী বিষয়ে মধু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বন্ধুদের ডাকতেন, নিমন্ত্রণ করতেন, সাহিত্যের জন্য-কবিতার জন্য।

গৌরদাস এবং বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্র এলেন মধুর আমন্ত্রণে মধুর বাড়িতে। ঘরে ঢুকতেই দেখলেন মধুর বাবা ধূমপান শেষ করে মধুর হাতে তামাকের নল দিয়ে বললেন নাও। দৃশ্যটি দেখে গৌর ও ভোলানাথ অবাক হয়ে গেল। নেশার বস্তু পিতা পুত্রের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ তো ভাবা যায় না। আমাদের সামাজিক বিধি মাফিক জানি নেশা করলে অল্প বয়সে গুরুজনেরা ধমক দেন। আর পিতা হয়ে পুত্রের হাতে নল দিচ্ছে। বন্ধু হিসাবে গৌর জিজ্ঞাসা করল, মধু তোমার পিতার একি আচরণ। তোমাকে তো সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। মধু তো দেব শিশু নয়, দানব শিশু। সে এই সব ঠুনকো কথায় গুরুত্ব দেবে কেন? শিশু বয়সে এই ঔদ্ধত্য কার না ভালো লাগে। মধুর কাছে এইসব ঘটনা ছিল অত্যন্ত গর্বের ও অতি আধুনিকতার নিদর্শন। গৌরকে উত্তর দিয়েছিলেন মধু, আমার পিতা তোমাদের এই সব তুচ্ছ সামাজিক আচার আচরণ গ্রাহ্য করেন না। রাজনারায়ণ নিজে হাতে মধুর জীবনে রোপন করে দিয়েছিলেন অভিশাপের যন্ত্রণা, আর উচ্ছৃঙ্খলতার স্পর্দ্ধা। পরবর্ত্তীকালে তার রক্তধারায় প্রবাহিত হতে লাগল প্রতিশোধ, স্পর্ধা আর যশের স্বর্ণ সিংহাসন। তাই বলে মধু কোন দিন শিক্ষা চর্চায় অমনোযোগী হন নি। এত স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল হয়েও মধু বিদ্যাচর্চায় ছিলেন সাধক। তাঁর স্বপ্ন ছিল আকাশচুম্বী। তাই তো নিজের দিকে তাকাবার তাঁর সময় কৈ। জাহ্নবী দেবী যদি সেদিন কঠোর শাসনের মধ্যে রাখতেন হয়ত আমরা অন্য কোন মধুকে পেতাম। বিপুল ঐশ্বর্য, বিপুল বৈভব, আশাতিরিক্ত স্নেহ প্রেম ভালবাসা, গুরুজনদের প্রবল ঔদাসীন্য আর মাতা পিতার দেওয়া স্পর্ধার সুযোগে মধু সকলকে হৃদকম্প করে দিয়েছিল। শিশু মধুসূদনকে জাহ্নবীদেবী কি ভাবে মানুষ করেছিলেন, তা আজ ভাবতেও অবাক লাগে। মধু স্নান করে ফিরে এসে যদি সুচারু সিদ্ধ ভাত না পায় তার জন্য জাহ্নবীদেবীর আদেশ মত ৫/৭ টি বড় বড় উনুন জ্বালিয়ে অন্ন প্রস্তুত করা হত, যে উনুনের ভাত সব থেকে ভাল সিদ্ধ হবে সেই উনুন থেকে ভাত নামিয়ে মধুকে খাওয়ানো হত। যদিও সেই সময় অনেক উচ্চবিত্তদের বাড়িতে প্রতিদিন বহু মানুষের আহারের ব্যবস্থা করা হত। সে কারণ ৫/৭ টি উনুন অনেকের বাড়িতেই জ্বলত। তাদের থেকে রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ির ব্যাপারটি কিছুটা আলাদা। অন্য উচ্চবিত্তদের বাড়িতে আহারের ব্যবস্থা হত সকলের জন্য, কিন্তু রাজনারায়ণ দত্তের বাড়িতে শুধু মধুর জন্য এই ব্যবস্থা হত। যদিও বহু লোকের আহার্য্যের ব্যবস্থা হত তার বাড়িতে, কিন্তু মধুর ভাত পেতে যদি দেরী হয় সেই আশঙ্কায় জাহ্নবী দেবীর আদেশ ছিল চাকর-বাকরদের প্রতি মধুর অন্ন প্রস্তুতে যেন কোন বিলম্ব না হয়।

সবই দেখেছেন মধু ছোট বেলায়। ৭/৮ বছর সাগরদাঁড়ীর বুকে মধুর অগাধ স্পর্ধার বিচরণ, বাধাহীন শৃঙ্খলমুক্ত জীবন মধুকে তিলে তিলে বেপরোয়া হতে শিখিয়েছিল। কোন আপত্তি ছিল না, কোন বাধা ছিল না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ডানা মেলে বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন ছোট বেলায় সাগরদাঁড়ীতে ও খিদিরপুরে। পূর্বেই বলেছি, কবি মধুসূদন দত্তের জন্মের চার বছরের মধ্যে মাতা জাহ্নবীদেবীর গর্ভে আরো দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রসন্ন কুমার এবং মহেন্দ্র নারায়ণ।

কিন্তু জন্মের এক বছরের মধ্যে প্রসন্নকুমার এবং পাঁচ বছরের মধ্যে মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। এখন একমাত্র মধুসূদনই তাদের নয়নের মণি।

নিজেদের চণ্ডীমন্ডপের পাঠশালায় তাঁর প্রথম হাতে ঘড়ি, ওই বাল্যকাল থেকেই তাঁর চরিত্রের মধ্য মহাশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। পাঠশালায় সহপাঠীদের মধ্যে তিনি শিক্ষাচর্চায় শ্রেষ্ঠ হবেন। এই শ্রেষ্ঠ হবার বাসনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্খা তো হঠাৎই করে হয় নি। তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্খা জন্ম থেকেই, শিক্ষা অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, শিশুকাল থেকেই সেই স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে, অপমান, জীবন যন্ত্রণা, অতীব দুঃখ কষ্টের স্বীকারও হতে হয়েছে। এমন কি অতি আপনজনদের কাছ থেকেও, তাঁর মনের কথা বোঝার মতো মানুষ খুব কমই ছিল, তাই সারা জীবন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনকে সার্থক করার চেষ্টা করেছিলেন, বাল্যকালে যে ভাবে মানুষ হয়েছেন বোধ করি কোনো রাজপুত্রের জীবনেও তা ঘটে না, জনৈক জীবনীকার বলেছেন তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে —

প্রাতঃকালে পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের ন্যায়, মধুসূদনও গৃহে আসিতেন। তাঁর পুত্র বৎসলজননী তাঁহার জন্য নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে সম্মুখে বসাইয়া স্বহস্তে আহার না করাইলে তাঁর তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন।

তাঁহার সমবয়স্ক অপরাপর বালকেরা আহার করিতে বসিয়া, আহার্য্য বস্তুর জন্য যখন চিৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন সেই সময়ে শীঘ্র শীঘ্র কোন রূপে আহার সম্পন্ন করিয়া এক একদিন হয়ত অসিদ্ধ ব্যাঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া সকলের অগ্রে পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল, কি গ্রামস্থ পাঠশালায় কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যে রূপ আহারে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা বোধ করি কোন শিশুর ভাগ্যে জোটে না।"

যদিও তখন ইংরাজদের আমল কিন্তু তখন ইংরাজী ভাষা খুব প্রচলন ছিল না, ফরাসী ভাষায় সরকারী কাজকর্ম চলত। আইন আদালতে ফরাসী ভাষায় প্রচলন ছিল সে কারণে ফরাসী ভাষা শেখাটা সে দিন অত্যন্ত জরুরী ছিল। পিতা রাজনারায়ণ ঠিকও করলেন পুত্রকে ফরাসী ভাষা শেখাবেন, ফরাসী ভাষার শিক্ষকও ঠিক করলেন। কবি তাঁর জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সাথে মৌলবী সাহেবের বাড়ীতে যেতেন ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের পড়াশুনা করার জন্য। মৌলবী সাহেব ফরাসী ও বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে শুনিয়ে ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দিতেন, এই ভাবে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় হল কবির। ফরাসী গান ও কবিতা কবি ভীষণ ভালবাসতেন। কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটল কবির জীবনে। মৌলবী সাহেব যখন আবৃত্তি করতেন কবি অতীব মনোযোগ সহকারে তা মনোনিবেশ করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভারী মিষ্টি, হিন্দু কলেজে তিনি ফরাসী ভাষায় গজল গেয়ে বন্ধুদের অবাক করে দিতেন, যদিও পরবর্তী কালে কবির কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গিয়েছিল। সংগীতের প্রতি

তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামের পথে, নদীর তীরে গ্রামের রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াতেন, আপন মনে গান গাইতেন, যদি কোন গানের কলি ভুলে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে নিজে তা বানিয়ে গাইতেন।

মধুসূদনের জীবনের প্রথম ভীত গড়ে উঠেছিল পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে পারিবারিক জীবনের মধ্যে। পিতা মাতা শিক্ষকগণের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার মধ্যে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল। সংগীতকে তিনি প্রাণের আর এক শক্তি মনে করতেন। তাঁর বাল্য জীবন এবং তাঁর পিতা ও পিতৃব্যদের ঘটনা শুনলে আমরা শুধু অবাক হয়ে পড়ি, এযেন আমাদের কাছে বিস্ময়, এ যেন আমাদের কাছে স্বপ্ন। দত্তবংশের ব্যয়শীলতা শুনলে আমাদের হৃদয়ে শিহরণ জাগে, এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার—মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত পুত্রের কল্যাণার্থে চাকুরীর প্রায় কুড়ি বৎসর পর ১০৮টি মা কালী দেবীর পূজা করেন। তাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেষ, ১০৮টি ছাগ এক সঙ্গে বলি প্রদত্ত হয়েছিল এবং ১০৮টি সুবর্ণ নির্মিত জবাপুষ্প অঞ্জুলি দেওয়া হয়েছিল, সাগরদাঁড়ীর প্রাচীন ব্যক্তিগণ এই পূজোর গৌরব করতেন, এই ঘটনাটি কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী বঙ্গ সাহিত্যের যশস্বিনী কবি মানকুমারী দেবী মহামান্য যোগীন্দ্রনাথ বসু কবি ভূষণ মহাশয়কে বলেছিলেন।

মধুসূদনের কথা লিখতে গিয়ে আমি যেন মহাসাগরের মধ্যে পড়ে গেছি, যার কোন কূল কিনারা নেই। যদিও চেষ্টা করলে মহাসাগরের কূল কিনারা মিলে যাবে, তবে মধুসূদন নামক মহাসাগরের কূল কিনারা চেষ্টা করলেও মিলবে না, এক অসামান্য প্রতিভা শুধু বিদ্যা--- শিক্ষা আর বিদ্যা , শুধু যশ খ্যাতি, ক্লেশ-যন্ত্রণা এই [illegible] মহাযাত্রী মধুসূদন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্য্যন্ত কাব্য ভুলতে পারে নি, স্মৃতি শক্তি [illegible] মৃত্যু, পথযাত্রী মধুসূদন মনোমোহন বাবুকে বলছেন—মনোমোহন তুমি [illegible] সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাকবেথের সেই পংক্তিগুলি তোমার স্মরণ হয়? মনোমোহন [illegible] কোন পংক্তি?

মধুসূদন বলিলেন লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু সংবাদে যাহা বলিয়াছিলেন সেই কয়টি পংক্তি, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে কোন কথা আর স্মরণ [illegible] কিন্তু দেখ দেখি আমি সেই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিতেছি আমার কোন ভুল হয় কি [illegible] মধুসূদন এই বলে ম্যাক্‌বেথ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করলেন।

"To morrow, and To morrow and To morrow.
Creeps in this petty peace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterday's have lighted fools
The way to dusty death. out, out brief candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage.
And then is heard no more; It is a tale.
Told by an idiot, full of sound and fury.
Sighnifying Nothing.–

তাঁর আবৃত্তি শুনে মনোমোহন বিস্মিত।

বাল্য কালেও মধুসূদন ঠিক এমনিই স্মৃতিধর ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শহর যশোহরে কথিত আছে-ঐশ্বর্যে ও বীর্যে এবং বিস্ময়ে গৌড়ের যশ হরণ করেছিল বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল যশোহর। কবি মধুসূদন সেই নামের মর্যাদা রেখেছিলেন, যশহরণ করেছিলেন তাই আজও কবির নামের সাথে কপোতাক্ষনদ ও যশোহরের নাম সমভাবে মর্যাদা পেয়েছে। সেই যশোহরের কবতক্ষ, ধূলা মাটি, গাছ গাছালী প্রেমময় প্রকৃতি নিজের বাড়ীর চণ্ডিমণ্ডপ, চাকর বাকর শিক্ষক বাল্য বন্ধু সব পরিত্যাগ করে পিতার হাত ধরে এবার কোলকাতার খিদিরপুরে এলেন কবি। নিজের জন্মস্থান পরিত্যাগ করে পিতার সঙ্গে এলেন খিদিরপুরে, বীর বালক মধুসূদনকে আমরা ধীরে ধীরে চিনতে পারব। কে এই বিরল প্রতিভা।

এবার আমাদেরও যেতে হবে খিদিরপুরে, দেখা যাক খিদিরপুরের মধুসূদন কেমনভাবে দিন অতিবাহিত করেন। তবু ফিরে ফিরে মনে আসে-শিশুকালের কথা, গাছের কোটর থেকে পাখি ছানা ধরার কথা, রস চুরির কথা, অথবা মনে পড়ে—

নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু সহ; চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে..........
...........আনন্দে সম্ভাষি................গুঞ্জরিসে অলি,

এবার খিদিরপুরে কবির গুঞ্জন শোনা যাক। যে বাড়ীতে তিনি বাস করেছিলেন শিশুকালে তার ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল।

১২৩ কালমাক্স সরণী খিদিরপুর, কোলকাতা। যশোরের বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ীর ফারাক অনেকটাই, এখানে চার দেওয়ালের মাঝখানে কবিকে থাকতে হত। বাড়ীটি ছিল বেশ বড় আকারের একেবারে রাস্তার উপর। বর্তমান বাড়ীটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এই বাড়ীতেই কবি শিশুকাল কাটিয়ে ছিলেন।

হিন্দু কলেজ ও মধুসূদন

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিদের সাহায্যে ২০শে জানুয়ারি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই হিন্দু কলেজ ছিল সে যুগের শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র, এই হিন্দু কলেজ থেকেই বেরিয়েছেন এক একটি রত্ন। বিশিষ্ট হিন্দুদের আর্থিক সাহায্যে এই হিন্দু কলেজ বেশ ভালোই চলছিল, কলেজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানী। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাবার পর প্রচন্ড অর্থ কষ্ট দেখা দেয়, সরকারী সাহায্য ছাড়া কোন রাস্তা নেই, সরকারী সাহায্য মিলল বটে তবে হিন্দুদের প্রভাবও নষ্ট হয়ে গেল, ইংরেজদের আধিপত্য ভীষণ ভাবে প্রকট হয়ে উঠল এমন কি পরিচালন কমিটি থেকে রাজা রামমোহন রায়কেও বাদ দেওয়া হল। এই সুযোগে এখন হিন্দু কলেজে ছাত্রদের শেখানো হতে লাগল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ, এমন কি হিন্দু ধর্মের আচার আচরণের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাঁড়া করা হতে লাগল। হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রগণও হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবের উপর আঘাত করতে লাগল। রামমোহন চেয়েছিলেন মাতৃভাষার উন্নতি অথচ আশ্চর্য্য তখন তরুণ ছাত্রগণ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পত্র লিখতে লজ্জা বোধ করত। মূলত ডিরোজিওর প্রেরণা ও আদর্শে নব্য শিক্ষিত ছাত্ররা ভীষণ উৎসাহ নিয়ে কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গতে লাগল। এখন থেকে হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হল। মধুসূদন ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাপটেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনও মুগ্ধ হয়েছিলেন। মধুসূদন যে একজন শ্রেষ্ঠ ও কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন সে সম্পর্কে বন্ধু গৌরদাস বসাক লিখেছেন—He was undeniable the jupiter among the bright stars of the college – বন্ধু কিশোরী লাল লিখছেন—In general literature and English composition he was second to none of his comtemporaries the Hindu college.বন্ধু বিহারী দত্ত বলেছেন I was a very dull boy at the commencement; but by deligenece and Exertion, became one of the stars of which Madhu was the Jupiter.

হিন্দুদের অর্থ সাহায্যে যে আদর্শ নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেল শুধু আর্থিক অনটনের জন্য। হিন্দু ধর্মের যেসব কুসংস্কার ছিল তার পরিবর্তন করা এবং মাতৃভাষার উন্নতিই ছিল হিন্দু কলেজের আদর্শ কিন্তু ইংরাজ সরকারের হাতে পরিচালন ক্ষমতা চলে যাওয়ায় হল বিপরীত কাণ্ড। হিন্দু ধর্মের প্রতি হল আক্রমণ এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার ও প্রচার ও ইংরাজী সাহিত্যের উন্নতির মূল কেন্দ্র হয়ে উঠল। ডিরোজিও ইংরাজের এই চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন যে কোন ধর্মের কুসংস্কারকে দুর করতে, ছাত্রদের শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করতে, ছাত্রগণ নিজেরাই ভালোমন্দের বিচার

করবে। ডিরোজিওর উৎসাহে সমস্ত ছাত্রগণ খুশীতে ভরে উঠল তবে ডিরোজিওর শিক্ষা পদ্ধতিকে ইংরাজ সরকার মানতে পারল না, ইংরাজ সরকার ডিরোজিওকে তাড়িয়ে দিলেন কলেজ থেকে। যেমন রাজা রামমোহনকে পরিচালক মণ্ডলী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংরাজ সরকার ডিরোজিওর মতবাদ ও প্রভাবকে তাড়াতে পারলেন না, সেদিনের ছাত্রসমাজ ডিরোজিওর মতবাদকে আঁকড়ে ধরেছিল। যদিও মধুসূদন ডিরোজিওর কাছে পড়ার সুযোগ পান নি, ডিরোজিও চলে যাবার পর মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, তবে ডিরোজিওর প্রভাব পড়েছিল মধুসূদনের উপর।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে পড়তে আসেন তখন হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্য তালিকায় যেসব বিষয় ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এলিজি অন দি ডেথ অফ এ ইয়ং লেডি', ইলয়সা টু আবেলার্ড, ম্যাক্‌বেথ, কিং লিয়ার্, ওথেলো, হ্যামলেট, প্যারাডাইস লস্ট, লিসিডার্স, কোমাস, লু এলেগ্রো, সনেট ইত্যাদি মধুসূদন হিন্দু 'কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন''। তাই বলে তিনি শুধু ক্লাসের পড়াই করতেন না, পাঠ্যসূচীর বাইরেও তিনি প্রচুর পড়তেন। ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়গণও বিস্মিত হয়ে যেতেন তাঁর পাণ্ডিত্যে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ ঝোঁক। ছাত্রজীবনে তিনি বায়রণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনি মিল্টনের সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবু তার প্রিয় কবি ছিল স্কট ও বায়রণ, মধুসূদন ডিরোজিওকে এক মহান আদর্শ বলে মনে করতেন। ডিরোজিও প্রথমে ছাত্রদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিলেন, যাহা প্রচলিত প্রাচীন তাহাই সত্য এবং নুতন যাহা তাহা অসত্য, অবজ্ঞেয়, এই ভুল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তবে ডিরোজিওর স্বাধীনতায় ছাত্রগণ কিছুটা উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে লাগল।

ছাত্রগণ বেশ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগল। এমন কি গো-মাংস খেতেও তাদের কুণ্ঠা হত না। হিন্দু কলেজ হয়ে উঠেছিল সেদিনের নব্য সমাজের পথিকৃৎ। মধুসূদনের পূর্বে হিন্দু কলেজের অবস্থান আরো ভয়াবহ। হিন্দু কলেজ পাশ্চাত্য ভাষায় গড়ে উঠবে না প্রাচ্য ভাষায় গড়ে উঠবে এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা। রাজা রামমোহন, খ্যাতনামা আলেকজাণ্ডার ডফ, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাষার মাধ্যমে হিন্দু কলেজ গড়ে উঠুক তারই সমর্থনে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় ইংরাজ পন্ডিতগণ বললেন, হিন্দু ও মুসলিমদের শাস্ত্রে কিছুই নাই, সবই অসার, সুতরাং ইংরাজী শাস্ত্রের মাধ্যমে এই হিন্দু কলেজ চলবে। এই যুদ্ধের শেষ বিচার হয়ে গেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এবং লর্ড মেকলে সাহেবের কথায়, তাঁরা কঠোর সমালোচনা করলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পর্কে কটূক্তি করতেও দ্বিধা করলেন না, এমন কি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধা করলেন না, মেকলে সাহেব বললেন, হিন্দুশাস্ত্র অসার এবং হিন্দুজাতি অতি অপদার্থ, আরো বললেন ইউরোপীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থগারের একটি মাত্র আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের থেকে উন্নত। তিনি অসঙ্কচিত্তে বললেন, অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্য নর্মান ও স্যাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা সে বিষয়ে

আমার সন্দেহ আছে। দুঃখের বিষয় সেই সময়ের নব্য ইংরাজী সাহিত্যের হিন্দু ছাত্রগণ কোন প্রতিবাদ তো করলেন না উপরন্তু তারা রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কেও কটূকথা বলতে লাগল। তারা বলত বাংলা ভাষা বলে কোন ভাষা আছে তা তারা মনে করে না। তারা বলত দোকানদারদের এবং অশিক্ষিত বৃদ্ধদের জন্য রামায়ণ মহাভারত নামে দুই খানি পদ্যগ্রন্থ আছে। মেকলে এবং ডফ সাহেব প্রায়ই বলতেন, প্রাচ্যভাষা সমূহ সমুদ্রের ন্যায় উদার মহান অতল কূলহীন কিন্তু বহু খুঁজেও সেখানে মুক্ত পাওয়া যায় না সে কারণে এই দুর্বল ভাষায় মনোনিবেশ করার অর্থ মৃত্যু, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাবতে অবাক লাগে ডফ এবং মেকলে আরব্য এবং ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে কোন পড়াশুনা না করে কি ভাবে এই সব সমালোচনা করেন তার এই ধৃষ্টতার জবাব না দেওয়াই ভালো। একথা ভাবলে হৃদকম্প হয়, যেসব সাহেবরা ভারত বিদ্বেষী ছিলেন, বিশেষ করে উইলিয়ম বেন্টিক, ডফ, এবং মেকলে আজো তাদের নামে রাস্তার নাম হস্‌পিটালের নাম ইত্যাদি রয়েছে। আমরা কি সব ইতিহাস ভুলে যেতে বসেছি?

সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দুসী, গজনী রাজসভা সম্পর্কে বলেছিলেন গজনী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য কিন্তু তাহাতে কোন মুক্তো নেই. কবি ফর্দুসী বললেন বলেই মেকলে সাহেব গোটা ভারতীয় ভাষার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলেন। নব্য শিক্ষিত যুবকেরা না না ভাবে সমালোচনা করতে লাগল সাহেবদের অনুপ্রেরণায়। মধুসূদনের পূর্বে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীমধুসূদন প্রমুখ ছাত্রগণ ইংরাজীয়ানায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তাই বলে বাংলা ভাষাকে অমর্যাদা করেন নি, রামায়ণ মহাভারতকে মহাকাব্য বলতে অস্বীকারও করেননি। মধুর কাছে একমাত্র মহাকাব্য ছিল রামায়ণও মহাভারত।

মধু এলেন কোলকাতায় পিতা রাজনারায়ণের সাথে, এবার তাঁর জীবনে শিক্ষার চূড়ান্ত ঢেউ এল। সেই মধু গ্রাম ছেড়ে পিতা রাজনারায়ণের সঙ্গে এলেন মাত্র ৭-৮ বছর বয়সে কোলকাতার খিদিরপুরে। রাজনারায়ণ কোলকাতার জীবনে প্রথমার্ধে ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বাড়ি তৈরী করলেন, এবং সেখানেই মধুর আগমন ঘটল।

বেশ কিছু সময় বিদ্যা অর্জন করলেন খিদিরপুরের কোন এক ইংরাজী স্কুলে। স্কুলটি তাঁর বাড়ির খুবই কাছেই ছিল। তাঁকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য চাকর নিয়োগ করা হল, কিন্তু মধু তখন যথেষ্ট সচেতন। তদুপরি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর। এই বয়সের মধ্যেই সে পড়েছে বহু গ্রন্থ, শিখেছে পারস্য ভাষা, জ্ঞানের দিক দিয়ে ঐ বয়সে মধু স্বর্ণ শিখরে। মধুর বিদ্যা অর্জনের উৎসাহ আগ্রহ রাজনারায়ণকে অনেকটা গর্বিত করেছিল। আনুমানিক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতা রাজনারায়ণ মধুকে ভর্তি করে দিলেন মহাবিদ্যালয়ে, প্রাচীন হিন্দু কলেজে। তখন তাঁর বয়স ন'বছর বিভিন্ন সূত্র ও সংবাদ সংগ্রহে জানা যাচ্ছে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ন' বছর বয়সে মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রায় সাত বছর বাদে তিনি তাঁর এক সহপাঠীকে পেলেন সপ্তম শ্রেণীতে ১৮৩৯ সালে। কে সেই সহপাঠী—যিনি ক্লাসে বরাবরই প্রথম হতেন। নাম শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ভূদেব চৌদ্দ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তাঁর একটি পত্র পড়লেই

বোঝা যাবে "মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয় হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"

হিন্দু কলেজ একদা মহাবিদ্যালয় নামে অভিহিত ছিল। মধু কোন দিন ভাবতে পারেননি। তিনি কোলকাতায় আসবেন। ভাল স্কুলে পড়বেন। কারণ, শিশুকালের সেই মনোরম পরিবেশ ছিল মধুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মধুর কাছে প্রকৃত জীবন।

তাই তো কতই না স্বপ্ন দেখেছেন উত্তরকালে সাগরদাঁড়ীকে নিয়ে আর কপোতাক্ষি তো মধুর জীবনের মণি। বিদেশেও বার বার স্বরণ করেছেন কপোতাক্ষির কথা। সেই বালক মধু পিতা রাজনারায়ণের সাথে এলেন হিন্দু কলেজে। তাঁর প্রতিভায় সকল শিক্ষক ও বন্ধুগণ বিস্মিত। মধুর প্রতিভাকে কেন্দ্র করে কতই না আলোচনা হয়েছে সেদিন, জনৈক সহাধ্যায়ী বললেন।

"যত্ন ও পরিশ্রমে আমিও হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদিগের ভিতর ঔজ্জ্বল্য তারকা মণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিল।" বাল্যবন্ধু সহাধ্যায়ী বঙ্ক বিহারী দত্ত মহাশয় একদা পত্রে উল্লেখ করেছেন। তখন হিন্দু কলেজের পূর্ণ যৌবন। নামে হিন্দু কলেজ তবে সবই ইংরাজীতে পড়াশুনা, যদিও ডিরোজিও নাই। তবে ডিরোজিওর আদর্শ শিক্ষা স্বাধীনতার কথাও হিন্দু কলেজের প্রতিটি ইষ্টকে লিপিবদ্ধ করা আছে। মধুসূদন যে সব অধ্যাপকদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ রিজ, হালফোর্ড, ক্লিন্ট প্রমুখ। ক্যাপ্টেন ডি. এল রিচার্ডসন ছিলেন সুপণ্ডিত, ইংরাজী সাহিত্যে ছিলেন মহাজ্ঞানী। গ্রন্থ না নিয়ে তিনি ক্লাসে শেক্সপীয়র পড়াতেন। মধু বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাঁর পড়া শুনতেন। রিচার্ডসন-এর পাণ্ডিত্য মধুসূদনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। যাঁরা মধুসূদনের পূর্বে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন এবং উচ্চশ্রেণীতে পড়তেন মধু অল্পদিনের মধ্যে সেইসব বয়োজ্যেষ্ঠদের অতিক্রম করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠেছিলেন। ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগ করলেন। তাঁর পাঠকালে তিনি বহুবার বৃত্তিও পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে যেমন জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন তেমনি অনেক প্রতিভাবান ছাত্রও ছিলেন ঐ কলেজে। মধু তাদের মধ্যে বৃহস্পতি ছিলেন।

গ্রন্থ পাঠকালে মধুসূদন এত বেশি মনঃসংযমী ছিলেন যে আহার তৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। বহু গ্রন্থপাঠী হিসাবে তাঁর নামও হয়েছিল। পঞ্চমশ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি ইংরাজী সাহিত্যের উপর এত বেশি গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীগণ তা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। মাত্র পঞ্চমশ্রেণীতে তিনি বিশ্বের ইংরাজী সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে শেষ করেছিলেন যা বোধকরি আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরাও ভাবতে পারেন না। হিন্দু কলেজে মধুর সাথী ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, জগদীশ নাথ রায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ভোলানাথ চন্দ্র, ভূদেব

মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ। এইসব বন্ধুদের মধ্যে সকলেই যে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন তা নয় অনেকে গণিতশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। যখন মধুসূদন নিম্নশ্রেণীতে পড়তেন তখন মধুসুদনের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল গণিতশাস্ত্রের প্রতি। কেউ তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলে তিনি অধ্যাবসায়ের জোরে তাঁকে পরাজিত করতেন। গণিতের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু উচ্চশ্রেণীতে ওঠার পর তাঁর আগ্রহ কমে গেল ক্যাপ্টেন ডি. এল রিচার্ডসনের ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি মুগ্ধ হয়ে নিজের জীবনের গতিকে এক অন্য পথে পরিচালিত করলেন। মনে মনে ভাবলেন ভাল ইংরাজী না জানলে না শিখলে প্রকৃত সুসভ্য ও জ্ঞানী হওয়া যায় না। রিচার্ডসনের আদর্শ কিছুটা এগিয়ে এল কবির জীবনে গণিতের প্রতি এল তাঁর বিরাগ।

অথচ মধুসূদনের প্রতিভা দেখে গণিতের অধ্যাপক রিজ সাহেব মধুকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। মধুর এই অনীহা ও গণিতের প্রতি বিরাগ এই চিন্তাকে দূর করবার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন অধ্যাপকগণ। কথিত আছে রিজ সাহেবের মত এতবড় গণিতশাস্ত্রবিদ সেই সময় আর দ্বিতীয় জন্মাননি। সেই মহান রিজ সাহেব পর্যন্ত নিরাশ হলেন। রিজ সাহেব নিঃসন্দেহে গণিতশাস্ত্রে ছিলেন মহাপণ্ডিত, কিন্তু ছাত্রগণ রিজ সাহেবের নামে অন্ধকার দেখত, রিজ সাহেবের নাম শুনলে হৃদকম্প হত। একবার বাবু রাজনারায়ণ বসু রিজ সাহেবের ভয়ে অঙ্কের ক্লাস পালিয়ে দ্বিতলে কিছু ছাত্রদের সঙ্গে গোপন আস্তানায় ঢুকেছিলেন যাতে রিজ সাহেব জানতে না পারেন। কারণ, ধরা পড়লে তো ভীষণ বিপদ। এমনও দিন গেছে বহু ছাত্র রিজ সাহেবের ক্লাসের সময় কলেজের রেলিং টপ্‌কিয়ে পালাতে বাধ্য হত।

কিন্তু ভূদেববাবু গণিতের পক্ষপাতী ছিলেন. ভূদেববাবু কোন দিন রিজ সাহেবের ক্লাস ফাঁকি দিতেন না। আর মধুসূদন কোন দিন রিজসাহেবের ক্লাস করতেন না। যখনই রিজ সাহেবের ক্লাস হতো মধু তখনই ক্লাস পরিত্যাগ করে অন্য ক্লাসে বসে আপন মনে কাব্য সাহিত্য পাঠে গভীর মনোযোগ দিতেন। ভূদেবের সঙ্গে ছিল মধুর এটাই পার্থক্য। মধু প্রায় সময়ই বলতেন ভূদেবকে, দেখ ভাই যতই নিউটন অঙ্ক কষুক তবে শেক্সপীয়র অনেক বড়। ভূদেব মধুর কথায় হাসতেন। আসলে মধু বলতে চাইতেন মধু ইচ্ছা করলে ভূদেব হতে পারে কিন্তু ভূদেব ইচ্ছা করলে মধু হতে পারে না। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সব সময় শিক্ষার উপরেই আলোচনা ছাড়া তারা আর কিছুই জানতেন না। ভূদেব মধুর সাথে বিশেষ তর্কে না গেলেও মধু বার বার শোনাতেন শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছা করলে শেক্সপীয়র হতে পারতেন না। সত্য সত্যই এক কাকতালিয় ঘটনা ঘটল।

একদিন রিজ সাহেব গণিতের একটি দুরূহ প্রশ্ন দিলেন, যা কেবল গণিত শাস্ত্রানুরাগী ছাত্রগণই পারবেন। বোর্ডে অঙ্কটি লিখে দিলেন রিজ সাহেব, মধু ক্লাসের সর্বশেষ বেঞ্চে বসে তখনও কাব্য পাঠে গভীর মনোযোগী। প্রথম বেঞ্চ বসা ভাল ভাল ছাত্রগণের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, অঙ্কটা কষে দিতে। ভূদেব সহ বহু ভাল ভাল ছাত্র মাথা নিচু করে বসে রইলেন কেউ অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না। এবার রিজ সাহেবের নজর গেল মধুর দিকে। মধুকে অঙ্কটা কষতে বললেন, মধু কোন কথার উত্তর না দিয়ে সোজা বোর্ডে গিয়ে অঙ্কটা

একটি সুন্দর প্রণালীতে কষে দিলেন। বোর্ড থেকে চলে আসার সময় মধু ভূদেবের গা টিপে বলে গেল শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হতে পারে।

রিজ সাহেব মধুর দিকে অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। এই হল প্রতিভা।

কবি সাহিত্যিক মানেই যশ খ্যাতির কাঙাল। মধু সেক্ষেত্রে অন্যথা নয়। হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রগণ যশ খ্যাতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। সভাসমিতিতে রচনা পাঠ, সংবাদপত্রে লেখার আগ্রহ ভীষণ ভাবে ছিল। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, তবে রিচার্ডসন সাহেব ডিরোজিওর মত, ছাত্রদের খুবই উৎসাহ দিতেন।

সেই সময় রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন বাবু রামচন্দ্র মিত্র। মধুও সেই পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলেন। তাঁর লেখা পড়ে সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট প্রীত হয়েছিলেন। মাত্র সতের বৎসরের যুবক মধু। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল যাদু, তাই তাঁর লেখা পাঠ করে সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট খুশি হতেন। মধুর লেখা পড়ে সম্পাদক মহাশয় আরো বেশি উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। সম্পাদক মহাশয় বুঝেছিলেন এই যুবকের মধ্যে প্রতিভা আছে, জ্ঞান অর্জনের জন্য এই যুবক পাগল, হয়ত একদিন এই যুবক বাংলা সাহিত্যের এক আমূল পরিবর্তন করতে পারবে। মধুসূদনের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে ঈর্ষা করতেন, মধু কিন্তু কোন দিন কাউকে ঈর্ষা করেন নি। মধু তাঁর বন্ধুদের শুধু ভালবাসতেন না, তাদেরকে আদর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং নানা উপাদেয় খাদ্য সমভিব্যাহারে আড্ডা জমিয়ে তুলতেন। কবিতা পাঠের মধ্যেই চলত আড্ডা। বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বাবু গৌরদাসকে ছাগ মাংস ভক্ষণ করিয়েছেন। তবে গৌরদাস মধুর এই ছাগমাংস প্রদানে অখুশি নয়, সেই মাংসের আস্বাদ বহু দিন ভোলেন নি। বন্ধু ভোলানাথ তেমনি পোলাও এর কথা বার বার বলেছেন। যখনই বন্ধুরা মধুর কাছে গেছে মধু বন্ধুদের যথার্থ মর্যাদা সহকারে নানাবিধ ভক্ষণের আয়োজন করতেন। তবে মধু বোকা নন, ভাল মন্দ খাইয়ে ছেড়ে দিতেন না, কবিতার আসর জমাতে হত। কাব্য পাঠের আসর হত, কাব্য পাঠের আসরে মধুই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। বন্ধুদের কাছে কবিতা পাঠ করবেন বলে তিনি সেই দিনই সকালে চা পান করে কবিতা রচনা শুরু করতেন, স্কুল যাবার আগে অবধি তিনি তা সংশোধন করতেন, বন্ধুরা যাতে তার কবিতার প্রশংসা করেন তার জন্য মধুর ব্যস্ততা ছিল খুবই।

খিদিরপুরের বাড়ির ছাদের উপর কাব্য পাঠের আসর জমে উঠত, মধু কত তাড়াতাড়ি কত বেশি কবিতা পাঠ ক'রে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পারবেন তারই জন্য অতীব ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। এক টানা শেক্সপীয়র বায়রনের লেখা বলে নিজের লেখা পাঠ করতেন, এমনও দিন গেছে নিজের কবিতা পাঠ করে বন্ধুদের কাছে বলতেন শেক্সপীয়র বায়রনের নাম। যখনই বন্ধুরা কবিতা পাঠ শুনে প্রীত হয়ে প্রশংসা করতেন সঙ্গে সঙ্গে মধু উল্লসিত হয়ে বলতেন গৌর জানিস এ কার কবিতা, বলেই উল্লাসে চিৎকার করে বলতেন এম ডাট। মধু আনন্দে বন্ধুদের জড়িয়ে ধরতেন। মধু বন্ধুদের যে কত ভালবাসতেন তা ভাষায় ।করা সম্ভব নয়।

পিতা রাজনারায়ণ প্রতি মাসে একশো টাকা দিতেন, তাছাড়া মাতা জাহ্নবী দেবী লুকিয়ে মধুকে অর্থ দিতেন। সেদিন এই অর্থেও মধুসূদনের নাকি চলত না, ছাত্র জীবনে এত অর্থ তিনি কী করতেন।

মধুর শুধু বন্ধুপ্রীতি ছিল না, বন্ধুদের দুঃখে তিনি ভেঙে পড়তেন। কারো দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। নিজের খেয়াল খুশি মাফিক সাহেবী অনুকরণের জন্য যখন যা মনে উদয় হত তাই করতেন। পোশাকের বাহার আর তার নানা চাকচিক্যময়তা অন্যান্য ছাত্রদের চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যেত।

একদিন হিন্দু কলেজের টিফিনের সময় মধু ভূদেবকে খুঁজছিলেন, কারণ এক সঙ্গে টিফিন করবেন। অথচ ভূদেবকে পাচ্ছেন না। অন্য সহপাঠীরা বলল, ভূদেব মন মরা হয়ে গোলদীঘির ধারে বসে আছে। মধু ছুটে এসে ভুদেবের কাঁধে হাত দিয়ে সাহেবী কায়দায় দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি মন খারাপ করে বসে আছ কেন?

ভূদেব বললেন জানো তো ভাই আমার বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কত টাকা আর আমার বাবা আয় করেন। বাবা আর আমার লেখাপড়ার জন্য অর্থ যোগান দিতে পারবেন না, সুতরাং লেখাপড়া আমার এখানেই শেষ।

মধু ভূদেবের দেহটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, টাকার জন্য লেখাপড়া হবে না এটা আমি হতেই দেব না। তুমি তো জানো ভাই আমি বাবার কাছ থেকে প্রতি মাসে একশো টাকা পাই। তাছাড়া মাও আমাকে দেন। তুমি আমাকে বলনি কেন তোমার টাকা দরকার? কেন তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নাও নি?

টাকার কথাটি শুনে ভূদেবের মন আনন্দে ভরে গেল, এমন বন্ধু যে জগতে থাকতে পারে কে ভাবতে পেরেছে। এমন উদার মনের বন্ধু বোধ হয় পৃথিবীতে বিরল। মধুর কথায় ভূদেব একটু আশ্বস্ত হল। হঠাৎ গৌর এসে উপস্থিত হল। এক নজরে মধুর মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। মধু তার তাকানো দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। মধু বললেন, গৌর তুমি আমার মাথার দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছো কেন? গৌর বললেন, দেখছি তোমার কতখানি রসভঙ্গ হয়েছে।

মধু বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, জানো এই চুল কাটতে আমার এক মোহর লেগেছে। এতক্ষণ ভূদেব নীরব ছিল, এক মোহর কথাটি শুনে ভূদেব মধুর মাথার দিকে তাকিয়ে বলল তুমি জিনিয়স, সাহেবদের অনুকরণ করা অন্তত তোমার মানায় না। মধু বলল, চল আজই তোমার সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেব কলেজ কে।

ভূদেবের মুখ থেকে "জিনিয়স' কথাটি শুনে মধু বড়ই গর্বিত। মধু মনে মনে ভেবেই নিয়েছেন, সে তার অপরাপর সঙ্গীদের থেকে অনেক বড়। তাইতো রিচার্ডসন তার কাব্য শক্তি দেখে এত ভালবাসেন। জীবনে কোন দিন তিনি রিচার্ডসন সাহেবের ক্লাস ফাঁকি দিতেন না। রিচার্ডসন সাহেব ছাত্রদের ইংরাজী সাহিত্যে নানা ভাবে উৎসাহ দান করতেন। রিচার্ডসন সাহেবের একটি সুন্দর ম্যাগাজিন ছিল, নাম "লিটারারি গ্লিনার"। যারা ভাল ভাল কবিতা লিখতেন, সাহেব সেই সব ছাত্রদের কবিতা তাঁর সম্পাদিত কাগজে ছাপিয়ে দিতেন। সমস্ত

ছাত্রদের মধ্যে রিচার্ডসন সাহেব মধুকেই বেশি ভালবাসতেন এবং মধুর কবিতাই বেশি প্রকাশ পেত তাঁর সম্পাদিত কাগজে।

রিচার্ডসন সাহেব ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি ছিলেন পণ্ডিত। মধুর আদর্শ ছিল রিচার্ডসন সাহেব। কলেজের ক্লাস না থাকলে অথবা অঙ্ক ক্লাসকে অবজ্ঞা করে মধু প্রায় সময় লাইব্রেবীর এক কোণে বসে নিজের কাব্য সাধনায় মগ্ন থাকতেন। একদিন আপন মনে একা একা বসে রিচার্ডসন সাহেবের হাতের লেখা নকল করবার জন্য নানা আঁকিবুকি করছিলেন, হঠাৎ কার সাহেবের নজর পড়ায়, কার সাহেব মধুকে ডেকে বললেন, মধু তুমি একি করছ? তুমি কি ভাব রিচার্ডসন সাহেবের হাতের লেখা নকল করতে পারলেই তুমি রিচার্ডসন সাহেবের মত বিখ্যাত হয়ে যাবে? এই কথাতে মধুর জীবনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

মধু জিনিয়স, তিনি নিজের লেখা কাব্য পাঠ শুনিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা পেতেন, ছাত্রাবস্থায় ছাপার অক্ষরে তার লেখা কবিতা বহু বার প্রকাশিত হয়েছে। যা হয়ত অন্য কারোর কবিতা প্রকাশিত হয়নি। মধু ইংরাজী সাহিত্যের নানা অধ্যাপকের কাছ থেকে চরম ভালবাসা ও প্রশংসা পেয়েছেন তাঁর গুণের জন্য। আবার কার সাহেব তাঁকে যথেষ্ট অপমানও করেছেন। এমন কি বন্ধু ভূদেববাবুও বলেছেন, তুমি তো যুবারাজ, খিদিরপুরের বাটি থেকে তুমি পাল্কি করে কলেজে আস, সঙ্গে দুজন ভৃত্য এবং নানা রকমের পোশাক। এমন কি কলেজে তুমি বার দুই তিন শুধু পোশাক পরিবর্তন কর। অঢেল অর্থ তোমার হাতে থাকে, কাব্য সাহিত্যে তুমি ছাত্রদের মধ্যে অনন্য, অথচ তুমি সাহেবদের অনুকরণ কর কেন?

মধু এসব কথার জবাব দেন নি ঠিকই তবে গৌরকে বলেছিলেন, গৌর আমি মহাকবি হব, আর তুমি আমার জীবনী লিখবে। ইতিমধ্যে ইংরাজদের মত ইংরাজি উচ্চারণ বেশ রপ্ত করেছেন। ইংরাজী ভাষাও বেশ বিকৃত করে বলতে শিখেছেন। তবে মধুর সব থেকে বেশি গর্ব হয়েছিল জিনিয়স কথাটির জন্য, নতুন কিছু দেখানোই মধুর প্রধান ধর্ম।

হঠাৎ একদিন কলেজে বন্ধুদের সামনে পরে এলেন বুট, ট্রাউজার এবং ফুলহাতা লম্বা কোট ও গলবন্ধ। এই দৃশ্য দেখে বন্ধুরা বললেন, এ কেমন পোশাক পরেছ?

মধু বললেন, তোমরা যে বল আমি সাহেবদের অনুকরণ করি। এ পোশাক তো নিশ্চয়ই সাহেবদের নয়। এবার কী বলবে?

উপস্থিত সকল বন্ধুগণ উচ্চকণ্ঠে এক সাথে হেসে মধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সাবাস মধু! সত্যিই তুমি ধুতি চাদর ছেড়েছ! সাবাস মধু, সাবাস মধু।

মধুসূদন সে সময় হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা সেই সময় হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করতেন। অনেক ছাত্র তাদের স্ব স্ব পোশাক পরিত্যাগ করে মধুকে অনুকরণ করতে লাগলেন। যদিও পরবর্তীকালে মধু ইংরাজী কোত্তা পরা আরম্ভ করেছিলেন।

মধুর পোশাক দেখে ভূদেব বার বার বলেছেন, সত্যই তুমি জিনিয়স, তুমি অনুকরণ করোনি ঠিকই তবে এই পোশাকের মধ্যে সাহেবী গন্ধ অতিমাত্রায়। মধুর মধ্যে অনেক সংশয় ছিল এই পোশাককে নিয়ে, কারণ সেই সময় হিন্দু কলেজের নিয়ম নীতি কিছুটা অন্য রকম। ভূদেবের টিপ্পনি মধু কোনদিন বুঝতে পারেনি। মধু এত সরল যে ভূদেবের ঐ জিনিয়স কথাটি তাকে

অহমিকার শীর্ষে এনেছে। তবু পোষাক পরিবর্তন আর এই পোশাক নিয়ে মধুকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল। অধ্যাপকগণ ভীষণভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু মধু তো ছাড়ার পাত্র নন। সাহেবদের অনুকরণ করার মধ্যে জাতীয়তাবোধের ব্যাপার আছে। যখন অধ্যাপকগণ এই পোশাককে কোন মতেই মেনে নিতে পারলে না তখন মধুর আর কিছুই করার নেই। ব্যাস পরের দিন ফিরিঙ্গি সাহেবদের পোশাক আর সঙ্গে ওড়ানী মাথায় বেঁধে এলেন! কলেজ কর্তৃপক্ষ তাও মেনে নেন নি।

বন্ধুরা মধুকে বলেছে, তুমি জিনিয়স। এই জিনিয়স শব্দটির জন্য মধু নিজেকে বার বার বিশাল মনে করেছেন। বার বার বিভিন্ন কাজে পরাজিতও হয়েছেন। এই ঔদ্ধত্যের প্রধান কারণ ছিল পিতা রাজনারায়ণ দত্তের ঔদাসীন্য আর জননী জাহ্নবীর মায়ায় ভরা হৃদয়, অতীব অর্থ আর স্বাধীনতা। তাই তো মধু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন প্রতি মুহূর্তে। জনৈক মধুর জীবনীকার বলেছিলেন, মধু সত্যই জিনিয়স তবে সেই জিনিয়সের মধ্যে মুক্ত কই, মুক্তাতে মরচে ধরেছে।

মহান ডিরোজিয়োর সঙ্গে কাপ্তেন রিচার্ডসনের চিন্তার ফারাক ছিল অনেক। তিনি ধর্ম নীতি ও সমাজ নীতির চিন্তা করতেন না, প্রকৃতির বাহ্য রূপেই তিনি মুগ্ধ। প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন সাদা চোখে। তরঙ্গায়িত সমুদ্র ঢেউ, নক্ষত্র মণ্ডলীর মিটি মিটি আলো জ্যোৎস্না বিধৌত বনাঞ্চল আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা রচনা। তিনি বলতেন প্রকৃতির শোভায় মোহিত হতে হবে। হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হবে, এত রূপ, এত সৌন্দর্য, পাহাড় জঙ্গল নদীর এত রূপ কোথা থেকে এল। মুগ্ধ হয়ে উপাসক হতে হবে। তাহলে কবি সত্তার জন্ম হবে হৃদয়ের মধ্যে। রিচার্ডসন সব ছাত্রদের সুলেখক ও কবি করবার জন্য নানা গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন। ডিরোজিয়োর ন্যায় রিচার্ডসনও ছাত্রদের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজে যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের সদা সর্বদা খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের লেখা পাঠ করে শোনাতেন। ছাত্রগণ আবৃত্তি শুনে মোহিত হয়ে পড়ত। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভা এবং আবৃত্তি সম্পর্কে লর্ড মেকলে বলেছিলেন. 'আমি ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমন করিলে ভারতের আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি কিন্তু রিচার্ডসনের শেক্সপীয়র আবৃত্তি বিস্মৃত হইতে পারিব না।" তাঁর অধ্যাপনা প্রণালী ছিল অতি সুন্দর। তাঁর পড়ানো এত সুন্দর ছিল যে কোন ছাত্র তাঁর ক্লাস কোন দিন ফাঁকি দিত না। কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদনে এবং ছাত্রদের রসজ্ঞ করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর আবৃত্তি শুনে ছাত্রদের যে কি ভীষণ আনন্দ লাগত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন কি রঙ্গালয়ের অনেক বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁর কাছে শেক্সপীয়রের কবিতা শুনবার জন্য আসতেন।

রিচার্ডসন সাহেব প্রথম জীবনে অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষ ছিলেন বলে সকলেই তাঁকে কাপ্তেন রিচার্ডসন বলে ডাকত। যদিও তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষ ছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে যথেষ্ট পদোন্নতি করে দিয়েছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সৈনিকের চাকরি ছেড়ে দিলেন।

কিছু দিন বাদে তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর অপরাধ তিনি ভারতের মানুষ, প্রকৃতি, পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মহাসাগরকে ভীষণভাবে ভাল বেসেছিলেন। এই ভালবাসার জন্যই হয়ত তাঁকে ভারত ছাড়তে হল একদা। তিনি তো এসেছিলেন ভারতে একজন সৈনিক হয়ে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কাব্য কুসুমাঞ্জলি ও আত্মিক স্পর্শ আছে তা বোঝার উপলব্ধি নিষ্ঠুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সৈনিক মহলে ও তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচার হতে লাগল। সেই সময় ভারতের শাসনকর্তা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আশীর্বাদে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন অধ্যাপকরূপে। অতি অল্প সময়ে রিচার্ডসন সাহেব সকল ছাত্রদের হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ ও প্রিয়।

সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীনই তিনি নিজের জীবনের ভিত গড়ে ফেলেছিলেন। লিখতেন নানা সংবাদপত্রে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগাযোগ।

কাপ্তেন সাহেব 'সার সংগ্রহ' পুস্তক সম্পাদনাও করেছিলেন। বহু কবির কবিতা সংকলিত হয়েছিল এই গ্রন্থে এবং রিচার্ডসন সাহেব অতি সুচারু ও সুললিত ভাবে প্রত্যেক কবির কবিতার দোষ গুণের বিচার সুন্দর ভাবে করেছিলেন। সংকলনটি বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট আলোড়িত হয়েছিল। মধুসূদন ঐ কাব্য পাঠে আনন্দে পুলকিত হয়েছিলেন, বলেই ফেললেন (ঐ সুকুমার বয়সে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র) আহা! আমি যদি ইহার লেখক হইতাম। অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক মধুসূদন ঐ বয়সে শেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রন ওয়র্ডসওয়ার্থের মত যশ পেতে চেয়েছিলেন, কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্ত নন, কি যেন অভাব, যন্ত্রণা মর্মভেদী উত্ত াপ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। এই বয়সে ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা ব্লাকউডস এবং Bentley's Miscellany-তে রচনা পাঠাতে লাগলেন। এছাড়া আরো অনেক পত্রিকাতে তিনি ইংরাজীতে কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। তিনি যখন কবিতা লিখতেন সেই কবিতা বন্ধুদের উৎসর্গ করে পড়ে তৃপ্ত হতেন না, তাই তিনি মহান কবি Wordsworth কে তাঁর কবিতা উৎসর্গ করেই পরিতৃপ্ত হতেন, বিদেশে তাঁর কবিতা প্রকাশ হোক এটাই ছিল তাঁর কাম্য, বিদেশে বহু সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন কবিতা প্রকাশ করার জন্য, 'বেন্টালিস মিসলেনীর' সম্পাদককে একটি পত্র লিখলেন, দেখা যাক সেই বয়সের যশ খ্যাতির আগ্রহ কতখানি,

To
THE EDITOR OF BENTLEY'S MISCELLANY

London.

Sir,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', Sir, is not my object at present; for I am really conscious I do not deserve it; --all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British–discerning generous and magnanimous–will not damp

the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu-a native of Bengal - and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,–'a child'–to use the language of a poet of year land. Cowley, "in learing but not in age".

Calcutta, Khidirpore. I remain & c.

Oct., 1842.

অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক মধুসূদন তাঁর চিন্তা এবং সৃষ্টির খ্যাতি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য কত পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল। তিনি ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য রিচার্ডসন সাহেবের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মতুষ্টি তাঁর মধ্যেই ছিল না, অথচ প্রেমময় এই কবি আত্মাকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

পৃথিবীর প্রেম, ভালবাসা, যশ, খ্যাতি অর্থ কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। গভীর আর্তনাদ আর নৈরাশ্য তাঁর জীবনকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরল। মধুসূদনের যখন ভগ্নস্বাস্থ্য এবং জীবন যন্ত্রণা। তখন তিনি রচনা করলেন আত্ম বিলাপ ঃ

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়, ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীন বল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

জীবনের প্রথমার্ধ থেকেই তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন অগ্নিকুণ্ডে। তার পরিণতি পরবর্তীকালে আত্মবিলাপে পর্যবসিত হল। এত বিশাল পাণ্ডিত্য অর্জন করেও নিজেকে শান্তি রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না।

হিন্দু কলেজে থাকাকালীন চরম উচ্ছৃঙ্খলতা উদারতা বন্ধুত্বপ্রেম বেহিসাবী আচরণ আর অধিক পড়াশুনা সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন উত্তুঙ্গ হিমালয়, তিনি যেন কারো অধীনস্থ নন, সকলে তাঁরই কৃপাপ্রার্থী। তাঁর কথায় পাণ্ডিত্যের জেহাদ, দানের ও কৃপার উদারতা এবং ঔদ্ধত্যের প্রভাবে সকলকে চমকিত করে তুলতেন। কি বেশভূষায়, কি অর্থে, কি পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রে। এই সবের পশ্চাতে কোন বাধা আসেনি। মনুষ্য চরিত্র গঠনের উপায় এবং তার শালীনতা, নম্রতা ও শিক্ষা তাঁর জীবনে প্রবেশ করেনি। যদিও রিচার্ডসন সাহেবের মত মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসে শুধু জ্ঞানই অর্জন করেছেন। মনুষ্য চরিত্রের উন্নতি সামাজিক বিধি বিধান সম্পর্কে হয়েছিলেন উদাসীন। সুনীতি ও মিতাচারের মূল্য যে কতখানি তা বোধ করি মধুসূদনের অজ্ঞাত ছিল। তাই পরিণত বয়সে তার বিষময় ফল যে কি ভয়ংকর ভাবে প্রকটিত হয়েছিল তিনি বোধ করি বুঝতে পেরেও তা মান্য করেন নি। উপলব্ধি করেছিলেন মধুসূদনের সুহৃদগণ। মধুসূদন উপলব্ধি যে করেন নি তা হয়, তবে বাহ্যিক জীবনে তার মূল্যায়ন করেন নি। তাই পরিণত বয়সে গৌরদাস বাবুকে বলেছিলেন, 'দেখ আমি ঋষি তুল্য ছিলাম, আমার কি অধঃপতন হইতেছে।'

দুঃখ করলে কি হবে, তিনি তো স্বেচ্ছায় নিজেকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন। কবির পথকে ঘোরাবার জন্য তার সকল বন্ধুগণ যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি তো কারো কোন উপদেশ কোন দিন গ্রহণ করেন নি, যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। এই ভয়ংকর চরিত্রের মোড় ঘোরাবার মত শক্তিশালী মানুষ কোথায়? বিদ্যাসাগরের মত মহামানবও বুঝেছিলেন মধুর পথ পাল্টানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তো মদ্যপানে কোন দিন বাধা দেন নি, উপরন্তু তিনিও তাকে মদ্যপানের জন্য অর্থ দিয়েছেন।

মধুর দানবীয় রূপ তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তিনি বলতেন, কবি খ্যাতি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। মধুর অর্থভাগ্য ছিল না, ছিল বন্ধু ভাগ্য কিন্তু বন্ধুত্বের জোয়ার জোরালো নয়, ভাটা পড়েছে বার বার। মধুর জীবনে যে ডাকিনী শক্তির সঞ্চার হয়েছিল তার প্রধান কেন্দ্রে উপস্থিত তাঁর পিতা এবং বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব এমন কি তাঁর গুরু রিচার্ডসন সাহেবও।

হিন্দু কলেজে সে সময় অনেক ছাত্র পড়তেন। তাঁরা অনেকেই মধুসূদনের থেকে কম প্রতিভাবান নয়। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র মদ্যপান করতেন এবং অখাদ্য ভক্ষণ করতেন, কবিতা লিখতেন তবে মধুর মত এত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে নিজেকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেনি। ভূদেব বলেছেন মধু তুমি জিনিয়াস, শিক্ষক রিচার্ডসন সাহেব বলেছেন, মধু তুমি পোপ। রাজনারায়ণ তার হাতে মদ্যপানের গ্লাস তুলে দিয়েছেন। এমনকি অল্প বয়সে মধুর হাতে তুলে দিয়েছেন মদ্যপানের অর্থ, তাছাড়া অন্যান্য বন্ধুবর্গ বার বার বলেছেন, মধুর প্রতিভা দিগন্ত বিস্তারিত। এই সেই মধু! কে পারে আত্মসংযম করতে। এত বেশি উচ্ছৃঙ্খল হবার প্রধান কারণ শুধু এগুলিই নয়। সেদিন তো বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতে পারতেন—মধু আমি তোমাকে মদ্য পানের অর্থ দিতে পারব না। তিনিও তা বলেন নি। তাকে কেউ শাসন করেনি।

মধু সব কিছু বুঝেই এগিয়ে গেছেন মৃত্যুর দিকে। সবাই ভাল বেসেছে তার প্রতিভার জন্য। তাই বোধ করি তার ডাকিনী শক্তিকে একবারও পরাজিত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁর বন্ধুগণ। একমাত্র বাবু গৌরদাস বসাক মধুর অতিরিক্ত মদ্যপানের বিরুদ্ধে বার বার জেহাদ ঘোষণা করেছেন। বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় মধু নিজেকে বিরাট উন্নত মানের কবি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর সমকক্ষ কবি তাঁর সময়ে নেই এই ধারণাই ছিল তাঁর মনে। ক্লাসে দুই তিন বার পোশাক পরিবর্তন, দু তিন জন ভৃত্য সহ স্কুলে আসা এ সবই তাঁর জীবনে এনেছিল আকাশ চুম্বী ঔদ্ধত্য। প্রতিভাবান মানুষেরা সাধারণ মানুষ থেকে কিছুটা ভিন্ন রকমের হয়। তাদের দেখলেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ তাঁদের পাগল বলে প্রতিপন্ন করে।

কিন্তু প্রকৃত পাগল তাঁরা নন, তাঁর যদি পাগল হতেন তবে সৃষ্টি করতে পারতেন না। প্রতিভাবান মানুষেরা জীবনকে বোঝেন অন্য আর এক অদৃশ্য জীবন দিয়ে যা তাঁর অন্তরেই সৃষ্টি হয়। তাই তো প্রতিভাবান মানুষদের জীবনে বার বার নেমে আসে হতাশা দুঃখ আর যন্ত্রণা।

মদ্যপান কে করেন নি? মদ খেতেন মহর্ষি, আবার ঋষি রাজনারায়ণ এত বেশি মদ খেতেন যে শেষ পর্যন্ত লিভারের অসুখ পর্যন্ত বাঁধিয়েছিলেন। মদ খেতেন কালী প্রসন্ন সিংহ, মদ খাওয়ার জেরে তাঁকে অকাল মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল, মদ খেতেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

একা খেতেন না অনেক বন্ধু মিলে। আবার যেখানে সেখানে নয়, বন্ধুবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বসে। মদ খেতেন বিখ্যাত হরিশ মুখুজ্জে, মারাও গেলেন। একদা শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন; কোলকাতার বিশিষ্ট প্রতিভাবান বন্ধুগণ আমাকে মদ ধরিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মদ খেতেন রমাপ্রসাদ রায়, মদের গুণে রমাপ্রসাদেরও হল অকাল মৃত্যু। মদ খেতেন রামমোহন রায়ও, তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিমিত খেতেন। অনেকে খেতেন লুকিয়ে চুরিয়ে আর মধুসূদন খেতেন প্রকাশ্যে, কোন ভয়ডর ছিল না। বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে বসে মদ খেতেন এবং সে মদ নিজে বহন করে আনতেন না, মদ আনার জন্য স্বয়ং বিদ্যাসাগর ব্যবস্থা করে দিতেন।

এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কে কাকে মদ নিবারণে বাধা দান করবেন। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এত কিছুর মধ্যেও তাঁরা বিদ্যা অর্জনে ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ, প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন বিশাল মানুষ। অনেকে বলেন মধুসূদন বাঙালীর ব্যর্থতার নীলকণ্ঠ। অনেকে বলেন মধুসূদন বাংলা কাব্যের ব্রাহ্মমুহূর্ত। রামমোহন যদি নতুন বাংলার প্রথম পুরুষ হন তাহলে মধুসূদন নতুন বাঙলার প্রথম সার্থক কবি। কবি মধুসূদন হিন্দু কলেজে ছিলেন, বিশপ্‌স কলেজেও ছিলেন। তাঁর আত্মার কোন উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি ছিলেন শাশ্বত কবি, সারা জীবন তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, পাশাপাশি তিনি জীবনকে নিয়ে গিয়েছেন এক অতীব অন্ধকারময় পাপের রাজত্বে, যেখানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। হিন্দু কলেজে থাকাকালীন তাঁর একটি লাভ হয়েছিল তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটেছিল, আত্মার দৌরাত্ম্য বেড়েছিল অমর হবার জন্য।

তাই বার বার বলতেন গৌর তুই আমার জীবনী লিখবি তো? হতভাগ্য কবি অমরতার জন্য নিজেকে নিঃশেষে কুরে কুরে, ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন।

তাঁর অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, প্রেম, বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা যশের অসারত্ব ক্রমশ ধাবমান। তাঁর বেগবান আত্মার শক্তিকে এখন আর কেউ রুখতে পারবে না। যতক্ষণ নিজেই আছড়ে না পড়ছেন তাঁর ভূমিতে। নিজেই কেঁদে ফেলে বললেন, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।'

শিক্ষক রিচার্ডসন সাহেব নিজেই লিখতেন সুন্দর, তাঁর যে গুণ ছিল তা অন্য অনেক কবির মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর নিজের লেখা কাব্য পাঠ তো করতেন, তাছাড়া খ্যাতনামা কবিদের লেখা থেকে পাঠ করে ছাত্রদের শোনাতেন। সব থেকে বড় কথা ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠে খ্যাতনামা কবিদের কবিতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দ কৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ। যদিও ডিরোজিওর স্বাধীন শিক্ষা ছিল অনেক উন্নত তবু তাঁর ছাত্রগণের থেকে বেশি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হয়েছিলেন পাণ্ডিত্যে জ্ঞানে দেশসেবায় সমাজ সংস্কারকরূপে রিচার্ডসন-এর ছাত্রগণ। মধুসূদন কখন যে কার আদর্শে দীক্ষিত হতেন তিনি নিজেই জানতেন না। হিন্দু কলেজে প্রবেশ করা মাত্রই ডিরোজিওর কথা শুনে তাঁরই ভাবাদর্শে অনেক কিছু করতে লাগলেন। ডিরোজিওর সম্পর্কে

তিনি তো অনেক গল্প শুনেছেন। তাঁর উদার মনোভাবের কথা শুনেছেন। ব্যাস হয়ে গেলেন ডিরোজিওর ভাব শিষ্য। ডিরোজিওর উপদেশে যুব সম্প্রদায়ের মনে কুসংস্কারের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, এসেছিল উন্মাদনা। আবার রিচার্ডসনের সম্যক সাক্ষাতে তিনি হয়ে উঠলেন রিচার্ডসনের ভাব শিষ্য। রিচার্ডসনের পাণ্ডিত্যে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে তাঁর সব কিছু অনুকরণ করতে লাগলেন। এই অনুকরণ প্রিয়তার জন্য মধুসূদনকে যে কত ভাবে ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছিল তা কবি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরই বন্ধু ভূদেববাবু এবং রাজনারায়ণ ছিলেন একটু ভিন্নরূপ, রিচার্ডসনের ছাত্র এঁরাও। কিন্তু মধুসূদন সব ব্যাপারে নিজেকে উজ্জ্বল তারকার মত প্রকাশ করতে চাইতেন।

রিচার্ডসন সম্পর্কে বাবু রাজনারায়ণ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'কাপ্তেন সাহেবের ইংরাজীতে এবং ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিল। শেক্সপীয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার শেক্সপীয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন 'আই কান ফরগেট ইভরিথিঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বাট নট ইয়োর রিডিং অফ শেক্সপীয়র। তিনি আশ্চর্যভাবে শেক্সপীয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে দ্যাট শোজ্ হিজ হোর লিভস ইন দি গ্লোসি স্ট্রিম, সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গাছের পাতা সবুজ, 'হোর লিভস' এই প্রয়োগ কবি কেন করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয় তলভাগ সাদা। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাড়িতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, আর ইউ গোয়িং টু দি থিয়েটার টু ডে ? তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা-আবৃত্তি শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তির শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় তাহা বলিতে পারিনা। তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না। কিন্তু তথাপি এরূপ .... হয়।

অনেকে মনে করেন মধুসূদন ডিরোজিওর ছাত্র, হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর কাছে পড়েছেন। এ ভ্রমে পতিত হবার যদিও অনেক কারণ আছে। তার প্রথমটি হল মধুসূদন ডিরোজিওর প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি, তারও প্রধান কারণ ডিরোজিও কোন দিন কোন ছাত্রকে তাঁর আপন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করতে শেখান নি, বরং তিনি ভারতভূমিকে মহান করেছেন, বাংলাভাষাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তিনি যে কত ভালবাসতেন এই দেশকে এমন কি নিজের মাতৃভূমি সমজ্ঞান করতেন, তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর বিখ্যাত কবিতায়। তাঁর বিখ্যাত 'ফকীরা অফ্ জঙ্গীরা' কাব্যের উৎসর্গ পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা, প্রেম অনুরাগ কতখানি। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন। তাই বলে অন্যান্য সাধারণ ফিরিঙ্গিদের মত তিনি ভারতবর্ষকে পরদেশ বা বিদেশ বলে ভাবতেন না, তিনি বলতেন স্বদেশভূমি।

তখন ইংরেজ শাসন করছিল ভারতবর্ষকে। পরাধীনতার যে কত যন্ত্রণা, কত বেদনা ডিরোজিও সেই সময় ছাত্রদের মধ্যে বীজ রোপণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পরাধীন

ভাবে বেঁচে থাকার অর্থ মৃত্যু। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মত স্বাধীনভাবে চলুক। তিনি এই ভারতবর্ষকে যে কতখানি মাতৃভূমি জ্ঞান করতেন তা তাঁর একটি কবিতাতেই স্পষ্ট। দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতাতেই সাক্ষ্য হয়ে রইল।

My country! In thy days of glory past
A beautious halo circled round the brow
And worshipped as a deity thou wast–
Where is that glory; where that reverence now?
The eagle pinion is chained down at last;
And grovelling in the lowly dust art thou;
The ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well, let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen county! one kind wish for thee.

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ফকিরা অফ জঙ্গিরা বিখ্যাত কাব্যের উৎসর্গ পত্রের কবিতাটি সুচারু ও সুন্দরভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ,

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির্ম মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার, হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালনিবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্তি রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের একমাত্র পুরস্কার গনি
তব শুভধ্যায় লোকে অভাগা জননী।

ডিরোজিও এদেশের ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপনা গৃহে ছাত্রদের সমাজ, নীতি, ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করবার সুযোগ দিতেন। সুলেখক

লাল বিহারী দে এবং ডিরোজিও অধ্যাপনা গৃহকে প্লেটোর একাডেমস্ অথবা অ্যারিস্টেটলের লাইসিয়ামের ক্ষুদ্র রুপ বলে বর্ণনা করতেন। সেই প্লেটোর একাডেমির ছায়া ঘিরে তিনি নিজে একাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে ছাত্রদের বক্তব্য রাখবার শুধু অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। স্থানটি ছিল মানিকতলায় সিংহবাবুদের উদ্যান। সেখানে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং দেশপ্রেম ও কুসংস্কার কে নিয়েই আলোচনা চলত। এই সভার গুরুত্ব বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল। উপস্থিত হতেন গর্ভনর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগন এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও কখন সখনও উপস্থিত হতেন।

কবি মধুসূদন যে সময় হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন সেই সময়টা সম্পূর্ণ ইংরাজিয়ানার জোয়ারে পরিপূর্ণ। শুধু মধুসূদন কেন হিন্দু কলেজের প্রায় অধিকাংশ ছাত্র, নিজের নাম বাংলায় পর্যন্ত লিখতে ভুল করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডিরোজিওর মুন্সীয়ানা এবং প্রতিবাদ সভা কখনই হিন্দু কলেজের বর্তমান ছাত্রগন সম্যক হতে পারেন নি। মধুসূদন প্রমুখ ছাত্রগন শুধু শুনেছিলেন ডিরোজিওর সাগরসম কর্ম কাণ্ড।

হিন্দু সমাজে সহ মরণ প্রথার মত কুৎসিত কুসংস্কার, বনের জন্তু হনুমান পূজো, কণ্ঠে তুলসীমালা আর কপালে তিলক কেটে প্রাচীন কুসংস্কারকে হজম করা অথবা মস্তকের শিখা ইত্যাদির বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের এইসব কুৎসিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর লড়াই করতে লাগলেন। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এক অভিনব দিক সৃষ্টি হল, তিনি ছাত্রদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতা। তিনি বলতেন চিরাচরিত প্রথা অথবা শাস্ত্রানুশাসন মেনে নেবার আগে ভাবতে হবে মানব হিতার্থে তার মূল্য কতখানি। এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ শাস্ত্রকার তাদের নিজস্ব শক্তিকে কায়েম করবার জন্য সাধারণ মানুষকে ধর্মের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলত। সুতরাং নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে বিবেক দিয়ে তার বিচার হবে, কোন ধর্মই অভ্রান্ত নয়। তার মধ্যে যা সত্য যা মানব কল্যাণকর যা নিরপেক্ষ তা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে।

সেই সময় রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম সম্পর্কে বঙ্গদেশে ভীষণভাবে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে খুব বেশি সভা বসত। কখনও ধর্মসভা, কখন ব্রাহ্মসভা, বিষয় ছিল সতীদাহ প্রথাকে নিয়ে। এই সতীদাহ প্রথার আন্দোলন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের এই সব আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দান করতেন। হিন্দু কলেজে মধুসূদনের প্রবেশের অনেক আগে থেকেই ডিরোজিওর প্রভাব প্রোথিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে ডিরোজিও ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তার বাচন ভঙ্গি তাঁর পাণ্ডিত্য ও বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন ছিল উন্নত, যে কোন ছাত্র তার মুখ নিঃসৃত বক্তব্য শোনবার জন্য অধীর হয়ে থাকতেন। ডিরোজিও ছাত্রদের এমনভাবে পড়াতেন যে ছাত্রগণ মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। দূর দূরান্ত থেকে বহু ছাত্র বহু বাধা পেরিয়ে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত উপেক্ষা করে ডিরোজিওর কাছে পাঠ শুনবার জন্য আসতেন।

ডিরোজিওর প্রেম, ভালবাসা আর অফুরন্ত স্বাধীনতা ছাত্রদের মনে জেগেছিল সত্য শিক্ষা

ও জ্ঞানের ঝর্ণা। ছাত্রগণ মোহিত হয়ে পড়ত তাঁর বক্তব্য শুনে। তাঁর মত তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত সে দিন ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ডিরোজিও শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি কবি ও ভারতপ্রেমিক ছিলেন এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ছাত্রদের এত ভালবাসতেন যে শুধু হিন্দু কলেজেই তাঁর পাঠ দান শেষ হতো না। তিনি ভাল ভাল ছাত্র ও উৎসাহী যুবকদের সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নীতি শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য থেকে ভাল ভাল কবিতা পাঠ করে শোনাতেন এবং প্রকৃত যথার্থ অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। তাছাড়া স্বদেশ প্রেম, আত্মবিশ্বাস, সততা, আত্মমর্যাদা বিষয়েও জ্ঞান দান করতেন। ছাত্রগণ তাঁর কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকত। কি মন্ত্র তাঁর জানা ছিল যে যুব সম্প্রদায় ডিরোজিও ছাড়া অন্য কারো কথা ভাবতেই পারতেন না। ছাত্রগণ যাতে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়, স্বাধীন চিন্তাশীল হয়, জাতীয় কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার জন্য ডিরোজিও ছিলেন সদা ব্যস্ত। তাঁর ফকীরা অফ জঙ্গীরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা যেমন মর্যাদা লাভ করেছিল ঠিক তেমনি মর্যাদা লাভ করেছিল হেজারস ও ইস্ট ইণ্ডিয়া নামক দুখানি পত্রিকা যা তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেই সম্পাদনা করতেন এবং ছাত্রদের লিখবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দান করতেন। এই উৎসাহ দানের ফলে ছাত্রগণের ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ হয়েছিল।

ডিরোজিওর মহান হৃদয় ও তার উদারতার জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এই মহান ব্যক্তির জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কাছে অনেক রথী-মহারথীকে মাথা নিচু করে থাকতে হত। তাই বলে তিনি নিজে গর্ব অনুভব করতেন না। তিনি বলতেন, প্রচেষ্টাও আত্মবিশ্বাস থাকলে পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব হয়। এই পৃথিবীর যত জ্ঞান যত পাণ্ডিত্য সবই তোমরা হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারলে মানুষকে দিতে পারবে, আর ধরতে না পারলে নিজেই অন্ধকারে হাতড়াতে থাকবে, নিজেকেই নিজের চিনতে অসুবিধা হবে।

এই মহান মানুষটি মাত্র তেইশ বছর বয়সে মারা গেলেন আর আঠারো বছর বয়সে যেসব কবিতা রচনা করেছেন তা বোধ করি অনেক নামী দামী বিখ্যাত কবি দিগকে লজ্জা পেতে হবে। এত অল্প বয়সে পৃথিবীর কোন দেশের কোন ব্যক্তি এত বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছেন কিনা তার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। ভারতের দুঃখ কষ্টে তিনি মর্মাহত হতেন।

ভারতের কুসংস্কারকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছেন। নব্য শিক্ষিতগণ তাঁর উপদেশ শুনে যথেষ্ট আন্দোলন করেছিলেন, তিনি কাউকে পরাধীনভাবে বেঁচে থাকতে বলেন নি। তাই বলে যদি কেউ স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিজাতীয় কর্ম অথবা অখাদ্য ভোক্ষণে এগিয়ে যায় তার জন্য তিনি দুঃখ পেতেন।

আঠারো-কুড়ি বছরের যুবক প্রবীণদের মত যুব সমাজকে দিতেন উপদেশ, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, মাত্র এই সামান্য বয়সে কি ভাবে তিনি যুব সমাজকে এক সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে বাধ্য করিয়েছিলেন। কি এমন শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল যা আজো সাহিত্যের পাঠকেরা যদি তাঁর জীবনী পড়েন বিস্ময়ে হতবাক তাঁদের হতেই হবে। তাঁর শিষ্য অথবা ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলেই যারা হিন্দু কলেজে পড়তেন তারা বিদ্যা অর্জনে প্রভূত যশোলাভ করেছিলেন, পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা। যাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ

করা যেতে পারে। যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ।

এছাড়া অনেকে, পরবর্তী কালে যারা হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরাও ডিরোজিওর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। তাঁরই চিন্তা ও পাণ্ডিত্যে নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই সারিতে নাম করা যেতে পারে মধুসূদন দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দিনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তবে মধুসূদনের সমসাময়িকগণ সরাসরি ডিরোজিওর কাছে শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। তার কারণ ডিরোজিও ততক্ষণে কলেজ পরিত্যাগ করেছেন। ডিরোজিওর প্রতিটি ছাত্র অথবা শিষ্য যশোলাভ করেছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে আরও দু একজনের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য যাঁরা আজও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। যেমন রাধানাথ শিকদার, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ। ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষায় গভীর মনোযোগ দিতে লাগলেন। পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইংরাজী ভাষায় প্রচার করা উচিৎ সরকারেব, কিন্তু এই সুযোগে এক দল নব্য শিক্ষিত যুবক হিন্দু সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু দিকের প্রতি আঙুল দেখিয়ে বললেন, ভারতবর্ষ কোন দিন কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে না যতদিন হিন্দুদের গোঁড়ামী নষ্ট না হচ্ছে। শুধু হিন্দু কেন মুসলমান রাজগণ সম্পর্কে একদা মহাত্মা বেন্টিঙ্ক বলেছিলেন, মুসলমান রাজগণ প্রায় ছয় সাত শত বৎসর রাজত্ব করেও সংস্কার মুক্ত হতে পারে নি। তারা শুধু অত্যাচার, নারী শাসন, ধর্মের যন্ত্রণা, পুরুষের ভোগাসক্তের পথ পরিচ্ছন্ন করেছে। নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার, ইচ্ছামত বিবাহ বিচ্ছেদ, একের অধিক ভোগের নিমিত্ত বিবাহ, বলপ্রয়োগ অত্যাচার অশিক্ষা এই সব নানাবিধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘটনার জন্য তারা শুধু সংখ্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে, মানসিক কোন উন্নতি নাই, ছয় সাত শত বৎসর রাজত্ব করেও যা পারেনি, ইংরাজ জাতি এই দেশে অতি অল্প সময়ে সমগ্র ভারতবাসীর মনের মধ্যে ন্যায়, সত্য এবং শিক্ষার আলোকে যুবকদের এক নতুন চেতনা জাগিয়েছে। তবুও কিছু গোঁড়া হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় এর চাপা উত্তেজনায় সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে। রাজা রামমোহনের মত মানুষদের জন্য, এই সব গোঁড়া ব্যক্তিগণও হাঁপিয়ে উঠছে।

সহমরণ প্রথার মত কুসংস্কার ঘৃণা লজ্জা অথবা দেবতার পাদপদ্মে স্বর্ণখণ্ড প্রদান, দধি দুগ্ধ বেলপাতা, তুলসিপাতা, অথবা পাথরে দেব বিগ্রহ হনুমানকে দেবতার আসনে উপবেশন ইত্যাদি, উন্নত চিন্তা ভাবনাকে হত্যা এই সব নানা দুর্বল চিন্তার দিকে তাকিয়ে মহামতি মেক্‌লে বললেন, এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের ব্যাধি দূর হওয়া কঠিন। কারণ এক দল প্রাচীন পণ্ডিত তারা ধর্মের ধ্বজা পুঁতে নারী স্বাধীনতা কৌশলে হরণ করছে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। তাই তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রকারগণের বহু কিছু অসার এবং তারা অপদার্থ, তিনি বললেন, কোন য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারি সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দুসী একবার গজ্‌নী রাজসভায় বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, গজনী রাজসভা মহা সমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখনো তাহা হইতে

মুক্ত প্রাপ্ত হয় নাই। এই সুযোগ নিয়েই চতুর মেক্‌লে ও ডফ্‌সাহেব বললেন প্রাচ্য সাহিত্যে সাগরের জল ভরা আছে। তবে তার মধ্যে মুক্তো কোথায়? রামায়ণ মহাভারত কোরানের মত মহাকাব্যে আছে যুদ্ধ ষড়যন্ত্র, কৌশল, কুশতৃণের গুণাগুণ, অসার উপদেশ, ঘৃত দুগ্ধ দধি বর্ণনা, যৌনাচার অবিবেককে বিবেকবান করা এবং বিবেকবানকে দুর্বল করা, ভ্রষ্টাচারিতা ইত্যাদি। প্রকৃত গ্রন্থগুলি অথচ এক এক সময়ে এক এক কবির হাতে লেখা হয়েছে। মূল গ্রন্থের সঙ্গে এই সব কোরান, রামায়ণ, মহাভারতের গরমিল অনেক বেশি। কপালে তিলক কেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করা এই মতের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিতগণ অসি ধারণ করলেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বড়ই ভীত হয়ে পড়লেন। কলকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত নিষ্ঠাবান পুরুষেরা স্বদেশীয় আলোর ধারাকে বজায় রাখার জন্য হিন্দু কলেজের উৎকট ইংরেজীয়ানার দৌরাত্মকে বন্ধ করবার জন্য ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করা হল। আত্মসংযমের অভাবে, ডিরোজিওর কিছু শিষ্য ও ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল যে হয় নি তা নয়। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া নয়। তিনি সেই শিক্ষা দান করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা। কিন্তু নব্য ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রগণ গো মাংস এবং হিন্দুদের নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ডিরোজিও কোনদিন তাদেরকে এই শিক্ষা দেন নি, ছাত্রগণ অতিমাত্রায় নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করে নিয়েছিলেন, পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

ডিরোজিওর ধ্যান ধারণা, শিক্ষানীতি চিন্তা-প্রতিটি ছাত্র ও শিষ্য হৃদয়ে বিশেষভাবে সংপৃক্ত হয়েছিল, পরবর্তীকালে মধুসূদনও তার থেকে বিরত ছিলেন না।

মধুসূদন অস্থির চিত্তের যুবক, চোখের সামনে শুধু স্বপ্ন ইংল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড না যেতে পারলে কবি হওয়া যাবে না। যে কোন উপায়ে মধুসূদনকে ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। অল্প বয়সের এত প্রকট আত্মবিশ্বাস কবিকে উন্মাদ করে তুলেছিল। কারো কোন উপদেশ তাঁর ভাল লাগত না। কবি তখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

এই তরুণ বয়সে তিনি এত সাহস পেলেন কোথা থেকে ? নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করবার পরিকল্পনাই বা পেলেন কোথা থেকে? হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও অথবা ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেব তো কোনদিন ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বলেন নি।

হিন্দু কলেজে সেদিন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তনয়গণ পড়াশুনা করতেন। যখন কেউ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতেন ডিরোজিও শ্লেষোক্তি করে বলতেন, খ্রীষ্টধর্মে কিছু নাই। এমন কি ভীষণভাবে সেই সব ছাত্রদের উপহাস করতেন। আজ সেই কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধু। হিন্দু কলেজ সেদিন খ্রীষ্টধর্মের অনুকূল ছিল না। থিয়োডোর পার্কার-এর মত জ্ঞানী ব্যক্তিও খ্রীষ্টধর্মের অসারতার কথা বলতেন এবং বক্তৃতায় তার অসারত্বকেও প্রমাণ করতেন। হিউমের নাস্তিকতা হিন্দু কলেজের প্রায় সকল ছাত্রদের মনোগ্রাহী ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধু তাঁর সময়কার পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানার, তবুও তার মধ্যে দুই একজন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করত, আবার পিতামাতার কঠোর শাসনে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতেও সময় লাগত না। ব্রাহ্মণ ডেকে নেড়া করিয়ে গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে, দশজন ব্রাহ্মণকে সমাদরে আমন্ত্রণ

জানিয়ে তাকে হিন্দুধর্মে আনা হত। এছাড়া কিছু অতি বুদ্ধিমান যুবক উন্নত ভবিষ্যতের কথা ভেবে (তাদের কাছে উন্নত ভবিষ্যতের অর্থই হচ্ছে অধিক অর্থ আয়ের পন্থা) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করত। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আন্তরিক অনাস্থা অন্তরে, তবু তারা অর্থের মোহে ইংলণ্ডে যাবার বা বিদেশী নারীকে বিবাহ করবার মোহে এই সব তরুণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করত। এইসব তরুণেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করত শুধু অর্থের জন্য, আদর্শের জন্য নয়।

সেদিন যে সব মহাত্মা হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কোনদিন খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে খ্রীষ্টধর্মের জয়গান করেন নি। তবে তারা ইংরাজী ভাষা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এই সব মহাত্মা জানতেন ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষা শিখলে ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থের রস আস্বাদন করতে পারবে। হিন্দু কলেজে খ্রীষ্টধর্মের কোন নামগন্ধ ছিল না। অথচ মধুসূদন কী ভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন? তরুণ মনের নেশা বড়ই সর্বনাশা। কবি ছিলেন নতুনত্বের পূজারী, সবাই যা করতেন কবি তা করতেন না, তিনি একটু নতুন কিছু সংযোজন করতেন, হিরো হয়ে তিনি সকল বন্ধুদের চমকে দিতেন, কি পোশাকে, কি শিক্ষায়, কি অর্থে। মধুসূদনের এক বন্ধু লিখেছেন সেই সময়কার একটি চিত্র।

'কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন সত্য, কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার দুইটি কারণ ঃ প্রথম কারণ অনেকে গিবন পড়িতেন, হিউম, ব্রাউন ও ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে আরও গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বঙ্গানুবাদ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ ঃ মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ছাত্রদিগের পিতামাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তা জানিতে পারিতেন। এই স্থলে আমি একটি নিজের দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মির্জাপুর মিশনে মেণ্ডিম নামে একজন পাদ্রী আসিয়াছিলেন। কলেজের যে বালক বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উক্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এই ঘোষণা শুনিয়া আমরা ছয় সাতজন কলেজের ছাত্র উক্ত সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি অতি সমাদরে আমাদিগকে বসাইয়া আপন ধর্মের গুণানুকীর্তন করেন। পরে বিদায় হইবার সময় এক এক খণ্ড বাইবেল দেন। এমন বাইবেল পুস্তক পূর্বে আমি কখনো দেখি নাই। আকারে রয়াল উক্টেভো, মেটিক বৃহদাক্ষর বাঁধাই, খরচ পাঁচ ছয় টাকা ন্যূন নহে— মোট কথা পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর। তাহা লাভ করিয়া আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। পথে আসিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে বাইবেল উপহার পাইবার বিষয় কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু হেয়ার সাহেবের অনুসন্ধান কে বলিতে পারে. তিনি বোধহয় গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। তিনি পাঁচ ছয় মাস পরে এক দিবস আমাদের সকলকে চারটার পর তাঁহার নিকট যাইতে কহেন, কিন্তু একই দিনে সকলকে যাইতে বলেন নাই। প্রথমে 'কে' কে ডাকিয়া লইয়া যান, তাহাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া সকল বিষয় জানিয়া নেন। এই রূপে একে একে সকলকে ডাকাইয়া বাইবেলগুলি হস্তগত করেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহার প্রিয় কাশীমালী কে দিয়া আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান। এক্ষণে যেখানে ক্যাথিড্রেল

মিশন কলেজ সেই স্থানে উপরের ঘরে তাহার বৈঠক হইত। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক বিকট মূর্তি ধারণ করেন।

তাহার এমন মূর্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের যেমন কর্ম তেমনি প্রায়শ্চিত্ত হইল। অর্থাৎ প্রত্যেককে এক এক ডজন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আসিবার সময় নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোন গীর্জার নিকট দিয়ে চলিতাম না।' প্রেমিক মধুসূদন বেত্রাঘাত খান নি, মধুসূদন হেয়ার সাহেব অথবা মেন্ডিম সাহেবের কাছ থেকে বাইবেলও নেন নি অথবা বেত্রাঘাত খেতেও যান নি। কবির অটল বিশ্বাসকে কেহ অপমানিত করতে পারে নি। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর যত না বিশ্বাস তার থেকে বেশি খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে ইংলণ্ডে যাবার পথ সুগম করা। তিনি ভাবলেন খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণি গ্রহণ করতে পারলে তাঁর ইংলণ্ডে যাবার রাস্তা মসৃন হবে। তাই তিনি এক খ্রীষ্টীয় মহিলাকে প্রেমপত্র লিখলেন, যার নাম দেবকী। কে সে মহিলা? দেবকী কার মেয়ে, দেবকীর প্রতি তাঁর এত বেশি দুর্বলতা জন্মালো কেন? রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন কবিকে এমন ভয় দেখালেন যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে পুলিশ হাজতে থাকতে হবে। মধুসূদন এসব কথা লজ্জায় তার কোন বন্ধুকে বলতে পারতেন না, অথচ কৃষ্ণমোহনের কেন এত উৎসাহ জন্মেছিল? সেদিন নাম করা বড় বড় ইংরাজের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি ডেপুটি গভর্নর বার্ড সাহেবের সঙ্গেও কৃষ্ণমোহন সেদিন মধুসূদনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বার্ড সাহেব মধুসূদনের প্রতিভা ও ইংরাজি সাহিত্যের জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝে ছিলেন যুবকের সাধ ইংলণ্ড যাবার তাই তিনি বুঝিয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য।

কবির মনের ভাব বুঝতে বুদ্ধিমান কৃষ্ণমোহনের কোন কষ্ট হয়নি। তিনি অপরকে দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ইংলণ্ড যাবার রাস্তা সুগম হবে। সংসার-অনভিজ্ঞ কবি সেইসব প্রলোভনে প্রলুব্ধ হলেন। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সবই যেন তাঁর কাছে বিষদৃশ্য হয়ে উঠল। কৃষ্ণমোহনের কাছে তিনি দিনে দুবার তিন বার যেতে লাগলেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণমোহন বুঝেছিলেন এই স্বকীয় তরুণ মধুকে বিপথগামী করতে তার সময় লাগবে না। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে মধুসূদন। অদ্ভুত প্রলোভনে মধুসূদনকে করায়ত্ব করে ফেললেন অতি সহজভাবে। এদিকে দেবকীর স্বপ্নও দেখছেন কবি? কে এই দেবকী? এ কি কৃষ্ণমোহনের কন্যা? দেবকী খ্রীষ্টীয় কন্যা। বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি দেবকী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা নন, দেবকী একজন খ্রীষ্টান বালিকা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহ ধন্যা। বন্ধু গৌরকে পর্যন্ত লিখলেন আমি এখন প্রেমপত্র লিখছি। অথচ আশ্চর্য বাবা সাগরদাঁড়ীর এক জমিদার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের ব্যবস্থা করছেন। কবি বন্ধুকে লিখেছিলেন—তুমি পারো তো বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ো আমি কোন কালাপাহাড়কে বিবাহ করব না. উল্লেখ করা যেতে পারে কবির ভ্রাতুষ্পত্রী কবি মানকুমারী বসুর কথা।

তিনি লিখছেন যা, তা অবিকল উল্লেখ করলাম। 'মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের কন্যার সহিত

তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মধুসূদন এই বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মধুসূদনের পিতামাতা 'ছেলে মানুষের কথা' বলিয়া এ অনিচ্ছার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নি। কন্যার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, পাত্রীও সুন্দরী, সুতরাং অনিচ্ছার কারণও বোধগম্য হইল না। মধুসূদনও বিশেষ কোন জেদ প্রকাশ করিলেন না। পরে যখন বিবাহের পত্র (পাকাদেখা) ঠিক হইয়া গেল, তখন মধুসূদন মাতাকে বলিলেন, 'মা একাজ কেন করিলে, আমি তো বিবাহ করিব না। মাতা পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া ভাবি বৈবাহিক ধন মান ও ত্বদীয় কন্যার রূপ গুণের বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন সকল কথা নীরবে শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, 'মা তুমি যতই বল, বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না।' পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠলেন। যাহাতে পুত্রের শীঘ্র বিবাহ হইয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।'

হিন্দু কলেজ অধ্যায়নকালে মধুসূদনের মধ্যে জেগেছিল এক বৈপ্লবিক ভাব, এ বয়সে তাঁর মনে হত, যা কিছু স্বদেশীয় তা খারাপ আর যা কিছু বিদেশীয় তা সুন্দর, পিতামাতার অকৃপণ ভালবাসা পেয়ে মধুসূদন স্পর্দ্ধার উত্তঙ্গ হিমালয়ে উঠলেন। তখন এই শিখর চূড়া থেকে কে তাকে নামাবে, ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করা ছাড়া তার জীবনে আর কিছুই ছিলনা, পিতামাতার দেখা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে সে বিবাহ না করবার সাহস পেল কোথা থেকে? কবি মান কুমারী বসু নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন।

'কলিকাতায় থাকিয়া দুই একটি হিন্দু যুবকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া ছিলেন বলিয়া, তিনি এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার পিতামাতা কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহের স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে তাঁর ইংলণ্ড গমনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া এবং আরো কতকগুলি কারণে মধুসূদনের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না। তিনি পিতামাতার নিকট আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, তিনি আবার কোন পিতৃব্য পুত্রকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন, 'বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না, আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্য বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।' অপরিণামদর্শী মধুসূদন তখন জানিতেন না, যে তাহার সঙ্কল্পিত কার্যের বিষময় ফল পিতার অপেক্ষা তাহাকেই অধিক ভোগ করিতে হইবে। আবার কবি মানকুমারী বসু এক স্থানে লিখেছেন—

মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এইরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি জ্ঞাত কারণে মাতা একান্তই অধীরা হন। পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহার মন ভাল হইবে তিনি শীঘ্রই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন আবার। মহাসমারোহে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের বিবাহ শেষ করিবেন এইরূপ স্থির হইল। বিবাহের ২০/৩০ দিন পূর্বে মধুসূদন দত্ত খিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ করার উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তে র খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস এইরূপ মনে হয় না। বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা শুনিলে এইরূপ বিশ্বাস সহজেই উপস্থিত হয় যে, মধুসূদন অশিক্ষিত, হীনচেতা, হিন্দু মহিলার পরিবর্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন, বিহারিণী, উন্মুক্তমনা, খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। আর এক কথা মধুসূদন জনৈক আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, 'আমার বড় ইংল্যাণ্ড

দেখিতে ইচ্ছা করে। যাহারা পরের দেশ (কলিকাতা) এমন সুন্দর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত সুন্দর! ইহাতে বোধ হয় ইংরাজদিগের দেশ দর্শনও মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বনের অন্যতম উদ্দেশ্য।'

হয় বিশ্ব বিজয়দর্পী নেপোলিয়ন, নয় সর্বত্যাগী বুদ্ধ অথবা যীশু, হয় রত্নাকর নয় বাল্মিকী, অথবা হয় আল্পস নয় মহাসাগরের গভীর তলদেশ, হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার শীতল বরফাচ্ছন্ন স্নেহ নয় মরুভূমিক রুক্ষ ও তপ্ত বালুকা। 'বীর রসে গাহিব মা মহাগীত' পারলেন না কবি বীর রসে নিজের জীবনের ট্রাজেডি সমাপন করতে।

শ্রী মধুসূদনকে দেখতে কেমন ছিল?

গায়ের রঙ ছিল কালো তবে সে কালোয় উজ্জ্বলতা ছিল। মুখোশ্রী ছিল অতীব প্রেমময় সুন্দর। একদৃষ্টিতেই মনে হবে প্রতিভার আকর। চুল পরিপাটি ঢেউ খেলানো কুঞ্চিত, মধ্যে সরল সিঁথি, হরিণের মত ভাষা ভাষা নয়ন, নয়ন দুটি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ফিরিঙ্গীদের মত গোঁফের সঙ্গে কুঞ্চিত দাঁড়ি একাকার হয়ে গেছে, চলনে-বলনে এক অদ্ভুত মাদকীয় ভঙ্গি, পড়াশুনা ছিল মধুসূদনের সব বড় থেকে বন্ধু। পরবর্তী কালে কবিকে অমরত্ব দান করেছিল তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য। মহাকবি হবার স্বপ্ন দেখেছেন ছাত্রাবস্থা থেকে, এই সেই দয়াল মহানায়ক মধুসূদন।

মধুসূদনের জীবন যেন দিক চক্রাবাল, রামধনুর সপ্তরঙে রাঙায়িত। মধুসূদন কি ছিলেন না? কবির নীতি আদর্শ ও আত্মবিশ্বাস শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয়েছিল, তিনি যখন যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন তখনও আমরা দেখেছি তাঁর ব্যক্তিত্বের আত্মশক্তি, একটি ছোট ঘটনার মধ্যেই তা ধরা পড়ে। দেখা যাক সেই বয়সের কবি কেমন ছিলেন?

কবি মধুসূদন শুধু কি দেশপ্রেমিক ছিলেন? তিনি বন্ধুদের সঙ্গে সহপাঠীদের সঙ্গে প্রাণখোলা গল্প করতেন, আবার বয়ঃকনিষ্ঠদের শিষ্টচারের অভাব দেখলে ধমক দিতেও কসুর করতেন না। কবির হাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মত লেখকগণও রেহাই পাননি। এমন কি বন্ধুবর্গ অবান্তর কথা বললে সমুচিত শিক্ষাও দিতেন।

কবি বিশিষ্ট বন্ধু ও সহপাঠীদের সঙ্গে প্রায় সময়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে কাব্যালোচনা করতেন। বন্ধু জগদীশনাথ প্রয়োজনে তাঁর যথার্থ সমালোচনা করতেন। জগদীশ শুধু সমালোচক ছিলেন না সুন্দর গানও করতে পারতেন। গানে সুর দিতে পারতেন, কণ্ঠ ছিল অতি সুমিষ্ট। জগদীশের গান শুনে কবি একদিন বললেন, ওহে জগদীশ লোকে বলে অমিত্রছন্দ গানের উপযুক্ত নয়। অমিত্রছন্দ কি গীতের উপযুক্ত হতে পারে না? জগদীশনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন লোকে বহু কথা বলে, কেউ কি একবারও চেষ্টা করেছে অমিত্রছন্দ গীতের উপযুক্ত কি না? সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে প্রমাণ করেদিলেন।

কবি তাঁর গান শুনে লাফ মেরে উঠে জগদীশকে জড়িয়ে ধরে নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। বললেন জগদীশ তুমি এই সুরে গান কর, ভারী চমৎকার সুর সৃষ্টি, তোমার এই সুর প্রতিটি

মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাহলে আমি নিশ্চয়ই অমর হব, তোমার এই সুরের প্রবাহ মর্ত্য জগতে যেন লক্ষ কোটি যুগ বেঁচে থাকে, গান কাব্য সাহিত্য নিয়ে সেদিন বেশ ভালো মজলিশ চলছিল হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে প্রবেশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেই পরিস্থিতি বুঝে চুপ করে বসে পড়লেন। .

কবি মধুসূদন ও জগদীশচন্দ্র গভীর মনোযোগ সহকারে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কবির আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করে বসলেন দু-একটি, প্রশ্ন করায়. মধুসূদন বললেন, বঙ্কিম তুমি ছেলেমানুষ, বড়দের কথা শুনে যাও এখন প্রশ্ন করার সময় নয়, আমাদের আলোচনার শেষে তুমি প্রশ্ন করবে, গুরুজনদের কথার মধ্যে কথা বলতে নেই, এটা খুব খারাপ অভ্যাস। শিষ্টাচারের অভাব দেখলেই কবি রেগে যেতেন। কবি বলতেন, তোমরা মানুষের মত আচরণ করতে শেখো, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চল। সাহেবরা এত উন্নত কেন? তাদের কতকগুলি পবিত্র অনুশাসন আছে। কবি আরো বললেন শোনো আমি তখন জগদীশের বৈঠকখানায় বসে বসে সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত করে উদ্‌গীরণ করছিলাম। কিছু বন্ধুবর্গ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিলাতের স্ত্রী লোকেরা কেমন সুন্দরী। বন্ধুবর্গের শিষ্টাচারের কতখানি অভাব তা কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কবি উত্তরে বললেন, শোনো বাঙলার কোন এক ধনী পুত্র বিলাতে গিয়ে কোনো এক ইংরাজ মহিলার রূপে মুগ্ধ হয়ে বলেই ফেলেছিলেন " I Love You", ইংরাজ মহিলা অর্বাচীন যুবকের কথা শুনে হাঁ-হাঁ করে উচ্চ হাস্য আরম্ভ করল। তার হাস্য শুনে পাশের ঘরের এক তরুণী বেরিয়ে এসে যখন বিষয়টি জানল তখন তারা সমবেত কণ্ঠে অর্বাচীন বাঙালী যুবকের কথায় হাসির রোল তুলল। যুবক বাঙালী, সুন্দরী ইংরেজদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ে মুর্চ্ছা গেল।

এই বলেই কবি চেয়ার থেকে উঠে অভিনেতার মত হাত নেড়ে বললেন, উপযুক্ত না হয়ে কোনো কাজ করতে নেই, তাতে লজ্জার শেষ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। বেশ কিছুদিন বাদে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে ঘটনাটি বলায় নবীনচন্দ্র সেন চমকে উঠে বলেছিলেন, আমি একবার সাহেব কবিকে দেখতে যাব। আমার বড় সাধ দেখার। ওনার অমিত্রছন্দ আমার ভীষণ ভালো লাগে। অমন প্রতিভা না দেখলে জীবনে অপূর্ণতা থেকে যাবে। নবীনচন্দ্র সত্যই একদিন কবির কাছে এলেন। এই তাঁর প্রথম আসা, পরবর্তীকালে বহুবার এসেছিলেন।

মধুসূদনের বেশ কয়েকটি বছর কেটেছিল হিন্দু কলেজে। ঐ যুগে প্রায় শ্রেষ্ঠ মনীষীরাই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বর্তমান হিন্দু কলেজে একটি বোর্ডও দেওয়া আছে কারা কারা পড়েছিলেন, সেখানে সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য মনীষীদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দ কৃষ্ণ বসু, কেশব চন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, প্যারীচাঁদ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, রামকৃষ্ণ মল্লিক, কালীপ্রসাদ ঘোষ, গৌরদাস বসাক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এই মহাবিদ্যালয় ছিল শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র অথচ ঐ বিদ্যালয়ে আজ সেই সময়কার কোন তথ্যই নেই, মধুসূদনকে আরো জানবার জন্য বর্তমান হিন্দু কলেজে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, মধুসূদনের সময়কার কোন নথীপত্র আমাদের কাছে নেই, খুব দুর্ভাগ্য ইতিহাস কি ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম, শুধু হতাশ হয়েই ফিরলাম হিন্দু কলেজ থেকে। মধুসূদন এই কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে গণ্য ছিলেন।

মাত্র সতেরো আঠারো বছর বয়সে হিন্দু কলেজে পড়ার সময় বহু ইংরাজী কবিতা লিখেছিলেন, তাঁর ঐ বয়সের বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ঃ

Comet, literery Blossom, literary Gaztte, literary Gleaner, Bengal Spectator, এবং জ্ঞানান্বেষণ নামক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।

বাবু গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে যে কি ভীষণ ভালবাসতেন তা জরিপ করা যায় না। একবার বন্ধুকে গৌরদাস অনুরোধ করলেন তুমি বাংলায় একটি কবিতা লেখ, গৌরদাসের কথা শুনে মধুর ভীষণ গর্ব হল। কবি আট লাইনের একটি কবিতা গৌরদাস বসাকের নামেই লিখলেন, প্রতিটি লাইনের আদ্যাক্ষর এক সঙ্গে করলে গৌর দাস বসাক হয়, কবিতার নাম দিলেন বর্ষাকাল। মনে হয় ঐটিই তাঁর হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক বাংলা প্রথম কবিতা।

বর্ষাকাল

গ — গভীর গর্জন সদা করে জলধর
উ — উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
র — রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দা — দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
স — সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
ব — বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
সা — স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
ক — কলয়ে করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।

কবিতাটির মধ্যে ভাগবত ভাষাগত এবং ছন্দের যথেষ্ট দোষ আছে, এদোষ মধুসূদনের নয়, হয়ত মধুসূদন বিশেষ কৌতুক করেই ভ্রম করেছেন তা ছাড়া তিনি বলতেন 'বাংলা ভাষা তো ভুলে যাবার ভাষা' এ ভাষা তো মুদি অথবা দোকানদারদের ভাষা, এ ভাষা অশিক্ষিত মানুষদের ভাষা, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর, শুধু তাঁর কেন হিন্দু কলেজের সব ছাত্রদের বিশেষ অবজ্ঞা ছিল। অথচ যে অবজ্ঞা করে তিনি গৌরদাস বসাককে কবিতা লিখেছেন সেই ভাষায় তিনি যে কিংবদন্তী হবেন কে ভাবতে পেরেছিল, তিনি যে আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

হবেন কে ভাবতে পেয়েছিল? হয়ত বা মহাকাব্যের শেষ মহাকবি শ্রী মধুসূদন। ঐ সময়ে রচিত আর একটি কবিতা—

হিম ঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
বামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত,
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিলে প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার রস আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশা তরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে
নিরাশা করয়ে তারে কেমন মানসে।

বাংলা ভাষায় বন্ধু গৌরদাসের অনুরোধে লিখেছেন বটে তবে তা যেন অনেক অবজ্ঞা অনেক উপেক্ষা করে, তাই তো কবিতার ছন্দ শব্দ প্রয়োগে এবং বাক্য নির্বাচনে না না ভাবে বিশেষ দুর্বলতা দেখা গেছে, অথচ সেই উপেক্ষিত ভাষাকে অবলম্বন করে কবি হলেন মহাকবি, হিন্দু কলেজেই মধুসূদন ইংরাজী ভাষাকে নিজের ভাষা-ও রাজার ভাষা রূপেই মনে প্রাণে, চলনে বলনে স্বপ্নে বিশেষ ভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। ইংলণ্ডে যেতেই হবে, ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হতে হবে, ইংরাজের সমাজ চাল চলন পরিচ্ছদ জীবনে গ্রহণ করতে হলে খ্রীষ্টান হতেই হবে।

সেই সময় ঠিক হিন্দু কলেজের সামনেই দুই খ্রীষ্টান যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশ ঘোষ খ্রীষ্টান পাদরীদের অর্থ সাহায্যে একটি গির্জা নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এমন কি অনেকটা কাজও এগিয়ে গিয়েছিল। খবর ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজের পরিচালক শোভাবাজারের রাধাকান্তদেব এবং রামকমল সেন ও ডেভিড হেয়ার সাহেবের বিরোধিতায় তা আর নির্মাণ হল না। মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের ছাত্র ছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে মধুসূদন হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিলেন, তাছাড়া মধুসূদন অকালপক্কও ছিলেন, তিনি মনে মনে Blue Eyed girl খুঁজেছেন, ঐ সময়ের লেখা একটি কবিতা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর প্রেমিকা বাঙালী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো বালিকা হবে না। মধুর কথায় গৌরদাস মাঝে মাঝে বিস্মিত হত। গৌরদাস বলতেন, মধুর জ্বলন্ত প্রতিভা কি চায়? তার একটি ছোট্ট কবিতায় তার আকাঙ্খার কথা বিশেষভাবে প্রকাশ হয়েছে।

I Loved a maid, A Blue Eyed maid.
As fair a maid can e'er be...O
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection, O
For her I sighed. and e'er shall I sigh
Tho;she shall ne,er mine, o
For This sad heart's starless sky.
None but herself can light. O.

বন্ধু গৌরদাসকে আবার লিখলেন একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে, যার চরণের আদ্যাক্ষর একত্রিত করলে গৌরদাস বসাক হবে। কি গৌরবময় প্রতিভা ঈশ্বর মধুসূদনকে দিয়েছিলেন তা ভাবা যায় না। এসব নতুন আঙ্গিকের চিন্তা ভাবনা সেই সময় তো কবির মধ্যেই ছিল। ঠিক বাঙলাতে যেমন লিখেছিলেন গৌরদাসের নামকে কেন্দ্র করে ঠিক তেমনই এবারে ইংরাজীতে কবিতাটি লিখলেন কবির মনের কথা, একমাত্র গৌরদাস বসাককেই কবি সবকিছুই জানাতেন, মধুসূদনের হৃদয়ের মধ্যে আছে Blue Eyed maid আর তাঁর পিতা চিন্তা করছেন এক গ্রাম্য অপরিণত বালিকা? লিখলেন কবিতা গৌরদাস বসাককে—

G-o! Simple lay! and Tell that fair,
O- h! 'its for her, her lover dies!
U-ndone by her, his heart sincere
R-esolves itself Thus into sighs!
D-ear cruel maid! tho'ne'er doth she
O-nce think, for her thus breaks my heart,
S-ad fate! Oh! Yet must I love thee,
B-e thou unkind, till life doth part!
Y-oung peri of the East! Thou maid divine!
S-weet one! oh! let me out thus die:
A-'ll kind, to these fond arms of mine
C-ome! and let me no longer sigh.

মধুসূদন মাথা নোয়াবার নন, আত্মসমর্পন করার ছেলেও নন। ২৭শে নভেম্বর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু গৌরদাসকে লিখলেন স্বামী জীবিত অবস্থায় ঐ বালিকাটির বৈধব্য হতেই হবে কারণ বাবা তো কোমর বেঁধে ঐ জমিদার বালিকার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ব্যাপারে সব পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমি তো ইংল্যাণ্ড চলে যাব। কোনো দিন দেখা হবে না। তাঁর বৈধব্য যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারব না, ঠিক সেই কারণেই বাঙালী বালিকার সঙ্গে আমার বিবাহ সম্ভব নয়, গৌরদাসকে পরিষ্কার ভাবে ২৭শে নভেম্বর ১৮৪২ লিখলেন—

It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine my betrothed is the daughter of a rich Zaminder; poor

girl! for a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of futurity!

You know, my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I can't remove it from my heart. Depend upon it in the course of a year or two more I must either be-E-D or Cease "to be" at all; one of these must be done.

হিন্দু কলেজ থেকে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল। অথচ আশ্চর্য হিন্দু কলেজে পড়ার সময় কোনো বন্ধুকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের যে অভিপ্সা, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের গোপন পরিকল্পনা তা বোধ করি হিন্দু কলেজেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই তো তিনি হঠাৎ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেই পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই উদ্বিগ্ন অবস্থায় ফেলে পাদরী সাহেবদের সহায়তায় পালিয়ে রইলেন। কিছুদিন কেল্লায় ছিলেন ডাঃ কারবাইন সাহেবের বাড়ীতে। যখন মধুকে নিয়ে ভীষণ গণ্ডগোল বেঁধেছে তখন তিনি কেল্লার বড় কর্তা পাউনি সাহেবের বাড়ীতে মর্যাদার সঙ্গে রইলেন।

হিন্দু কলেজে পড়ার সময় মধু স্বাধীনভাবে নিজের খেয়াল খুশি মাফিক বিখ্যাত হবার নেশায়, যশের নেশায়, বিদ্যাচর্চার নেশায় আপন মনে কাজ করে চলেছেন, এমন কিছু কিছু কাজ করেছেন যা পিতা মাতার পক্ষেও সম্ভব ছিল না মেনে নেবার। একমাত্র পুত্র কত আশা কত ভরসা কিন্তু হায়! সব যেন বৃথাই গেল রাজনারায়ণের। একদিন বাধ্য হয়ে মধুসূদনকে পিতা রাজনারায়ণ বললেন, তুমি যদি অবাধ্য হও তাহলে তোমাকে খিদিরপুরে রাখব না। তোমাকে সাগরদাড়িতে থাকবে হবে, এবং আমি সেই মত ব্যবস্থা করেছি। অভিমানী পুত্র মধুসূদন, সেই কথা শুনে মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেলেন একখানি পত্র লিখলেন বন্ধু গৌরদাসকে—

Hindu College

True-too true. My dearest Gour! The storn has, at hast burst upon me. I am ordered depart form Town this very night, for our country house.

But oh! Where shall I go? Had I had the power of opeing my heart. I could than show you the state of my feeling. Language cannot paint them! To leave The friends I love, particularly **ONE**-(Imagine, who that "one" could be) my poor heart cannot but break well may I explain in the language of the poet oh! insupportable, oh! heavy grief! I wish I could see you,- but oh! That cannot be! I am not allowed, Dear, Dear. Gour! Dearest friend; don't forget me!

If I do not start to night, I shall see you tomorrow at the colleage. As I am to embark at Balliaghata, I shall once step into the college when I go there. Your Byron shall be sent tomorrow with the fatal letter to mr.

Kerr. Farewell! I do not know when I shall return from our country house. When you go to the mechanic's give my compliments. To harris, "Farewell Forever".

I remain as I have been dearest Gour your ever obed't and devoted but unfortunate friend.

Khidirpur
7th August, 1842 M. S. Datt
Sunday

কবি মধুসূদনের সাহিত্যানুরাগ, প্রেম বিলাসীতা, উচ্ছৃঙ্খলতা হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। তিনি স্বাধীনতার সুউচ্চ পর্বতে উঠেছিলেন। তাঁকে ধরে রাখার মত কোনো ক্ষমতা কোনো শিক্ষকের ছিল না, হিন্দু কলেজে রিচার্ডসন সাহেব ছিলেন মধুসূদনের শক্তি ও আদর্শ। তাই তো মধুসূদন পিতার অজ্ঞাতে নিজের মনের মত যাবতীয় কাজ করতে লাগলেন, এমন কি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতেও কণ্ঠিত হন নি। বার বার কবি বলেছেন, আমার ইংল্যাণ্ড দেখতে ইচ্ছা করে যাহারা পরের দেশ এমন সুন্দর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত সুন্দর। সেই মধুসূদন অশিক্ষিত হীনচেতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু মহিলার পরিবর্তে শিক্ষিতা স্বাধীন বিহারিণী উন্নতমনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পানি গ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মধু যে নীল নয়না বালিকাকে বিয়ে করবে, ইংল্যাণ্ডে যাবে, সাহেব হবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকবি হবে, ইংরেজ জাতিকে বুঝিয়ে দেবে ভারতীয়গণ তোমাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে বাংলার মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে।

এসব স্বপ্নের দানা বেঁধে ছিল হিন্দু কলেজ থেকে। কবি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর একটি পত্র সংযুক্ত করে এই অধ্যায় শেষ করছি। এটি ঠিক পত্র বলা যায় না, কবির সম্পর্কে তার বক্তব্য

কবে আমি দেখিব মধুসূদনবদনসরোজং,

রাজনারায়ণ বসু

আমি (১৮৬০ সালের শেষে) মেদিনীপুর যাইবার পূর্বে কবি কুলসূর্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম। মধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া বিশপ্স কলেজে পড়িতেন যান। তৎপরে অনেক দিন মাদ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যেসময় দেখা করিলাম তিনি তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। ঐ বৎসরের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালেখি হইয়াছিল।

বিধিধার্থ সংগ্রাহক নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ওই লেখালেখি আরম্ভ হয়। ঐ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য Indian field নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই-তিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুর পাঠাইয়া দেন। আমি ঐ সময়ে মধুর এমনই গোঁড়া ভক্ত হইয়া

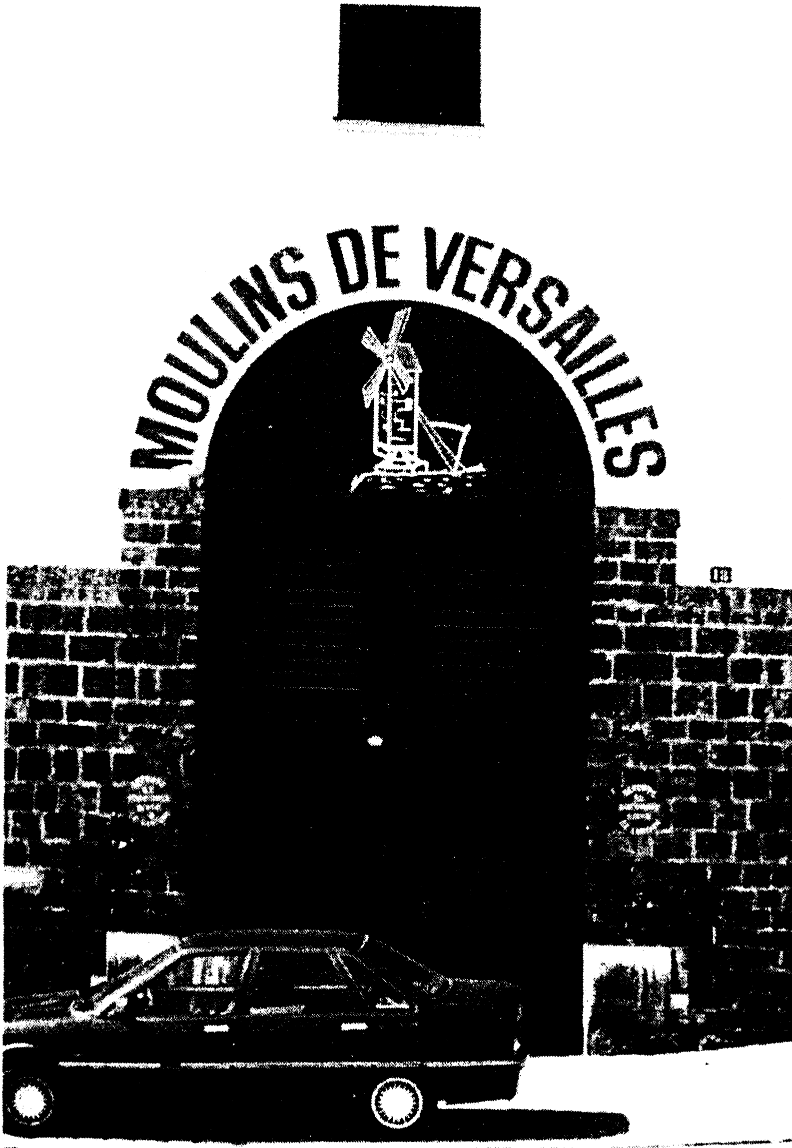
পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম কবে 'আমি দেখিব মধুসূদনবদনসরোজং।' আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সেদিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, My dear Raj, this will surely make me immortal; আমি বলিলাম, 'তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দুষিত। জয়দেব বলিয়াছেন—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥

আরো বলিয়াছেন—

যদ্যাকণ্ঠাকুলা সুকৌশলমনুধ্যানং চরদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছদীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতং॥
তৎসর্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার উপর মুক্তাবর্ষন করিতেছেন। মধুর আত্মশ্লাঘা কিন্তু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলি যুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাঁহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতো হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু"। তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না, এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্তব্য"। তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেদিন ইজার চাপকান পড়িয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজ স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেদিন তাঁহার মাদ্রাজ্যের একটি ফিরিঙ্গি বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।



Moulins De Versailles
Ancient Mills
in side of Madhusudan's House



12th Rue Des Chantiers
Versailles-France
এই বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে থাকতেন।



Versailles-France
12th Rue Des Chantiers
বাড়ীটির একটি অংশ



Versailles-France
12th Rue Des Chantiers
বাড়ীটির অপর আর একটি অংশ



স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

বিশপ্স কলেজে মধুসূদন
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭

এমন দৃঢ়চেতা যুবক, এমন কৃতি ও মেধাবী ছাত্র পৃথিবীত বিরল-যিনি বিশপ্স কলেজে পড়তে পড়তে একজন বহুভাষাবিদ্ বলেই পরিচিত হলেন। ইংরেজি ভাষা তাঁর কাছে মাতৃভাষার সমতুল্য, এছাড়া তিনি গ্রীক, লাতিন, জার্মান, ইতালী এবং ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইতালী ও ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলতেন এবং কবিতাও লিখতেন, এছাড়াও তিনি সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু হিন্দুস্থানী ও হিব্রু ভাষাও জানতেন, পরবর্তীকালে বিদেশে গিয়ে আরও ভালোভবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ঐসব ভাষা আরো সহজভাবে তাঁর কাছে পরিচিত হল, কারণ তিনি বিশপ্স কলেজে ঐ সব ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশপ্স কলেজে প্রবেশ করার কিছুদিন আগে হিন্দু কলেজে মধুসূদন ভীষণ গোলযোগ করে বসলেন। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটতে লাগল অথচ তাঁর মহাবিপ্লবের কথা কাউকে বলতেন না। হিন্দু কলেজে প্রায়শঃ তর্কে জড়িয়ে পড়তেন আর কার সাহেবকেও তাঁর মোটেও ভালো লাগত না।

অধ্যাপক (Kerr) কার সাহেবের প্রতি মধুসূদন ভীষণ বিরক্ত ছিলেন—তবে মধুসূদন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন সাহেবের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। কার সাহেবকে অপছন্দ করতেন বলে তিনি কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পিতামাতার কাছেই থাকলেন খিদিরপুরের বাড়িতে। কবি বললেন—বাবা আমি বিশপ্স কলেজে পড়ব। হিন্দু কলেজে আর নয়। পিতা রাজনারায়ণ বললেন— কেন! হিন্দু কলেজ তো তোমার পক্ষে খুবই ভাল, তোমার পড়াশুনার ব্যাপারে শিক্ষকগণ গর্বিত, তোমাকে ভালবাসে। মধু বলল—বাবা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঐ হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা দীক্ষা আমার মোটেও পছন্দ নয়, ওখানকার একজন শিক্ষক যিনি সত্যই পন্ডিত কি নাম জানো—

রাজনারায়ণ—কি নাম! তোমায় বোধ হয় খুব ভালোবাসে?

মধু হেসে বললেন—নাম রিচার্ডসন সাহেব। আমার পান্ডিত্যে তিনি মুগ্ধ। কি লেখা তাঁর! বাবার সাথে মধু বেশি কথা বলতেন না।

মধু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন হিন্দু কলেজে আর পড়বেন না। তাঁর এই 'না' কে 'হ্যাঁ' করনোর ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতারও ছিল না বোধ করি।

১৮৪২ সালের ২৫শে নভেম্বর রাতে গৌরদাসকে লেখেন—

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from College during D. L.R'S absence. Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to College until D.L.R'S return, be it of whatever duration, I don't care. I have no great liking for any of my fellow Collegians except a few souls who love me;–and I hate the D-D-fellow K-R.

কবি ভীষণ ভাবে কার সাহেবকে ঘৃণা করতেন. তার কারণ কবির ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবন্ধক ছিলেন কার সাহেব, মধুর ভবিষ্যত চরিত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের আচর আচরণ নিয়ম শৃঙ্খলা বোধ করি কার সাহেব বোঝাতেন মধুকে এবং এ ব্যাপারে কার সাহেব ভীষণ কঠোর ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে না থাকলে কার সাহেবের কাছে বিশেষ তিরষ্কার পেতে হতো। রিচার্ডসন সাহেব সে বিষয়ে ছিলেন উদার এবং উদাসীন। কার সাহেব লক্ষ্য করতেন মধুর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রা, তাই তার কড়া শাসন মধুর ভালো লাগত না। কার সাহেব মধুকে ভালোবাসত তাই বলে অতিমাত্রায় প্রশংসা করতেন না, তিনি জানতেন বেশি প্রশংসার ফল ভবিষ্যৎ পরিণতি খারাপ। কার সাহেব মনে মনে মধুর পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা করতেন তবে তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কিন্তু মধু ভুল বুঝে অহেতুক কার সাহেবের উপর রাগ করতেন। একবার রিচার্ডসন সাহেব ছুটিতে গেলেন তখন কার সাহেব ক্লাস নিতে লাগলেন ব্যাস্ মধুও কলেজ কামাই করেদিলেন, গৌরকে বললেন যত দিন রিচার্ডসন সাহেব ফিরে না আসবেন তত দিন কলেজে যাবে না। ২৬শে নভেম্বর গৌরদাসকে একটি পত্রে লেখেন—

To morrow I won't go to College. This is my resoulation. I hate College, I hate K.R. mind I won't go to College tommorrow. I intend writing a note to the D-D follow K-R for leave of Two months. I hope he will grant it. If he won't I don't care, but I will absent, I will-I will.

কার সাহেবের উপর এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে কার সাহেবের মুখ দর্শন পর্যন্ত করতে চাইতেন না, কলেজে পড়া তো দূরের কথা। আসলে কার সাহেব মধুর অকালপক্কতা সহ্য করতেন না। তিনি মধুর মঙ্গল কামনা করেই শাসন করতেন। কিন্তু মধুর বোঝার সে ক্ষমতা ছিল না, কারণ তিনি প্রতিভার আকর তাই এত বেশি অভিমানী।

আবার ২৯শে নভেম্বর মধু গৌরদাসকে লিখলেন—

By the Bye-how are you getting on? Ye Collgeians! H-C (Hindu College) is an earthly "Pandemonium with his D-D Satanic majesty K-R at the head of its vile occupants : (You and a few other excepted, of Course).

এখন মধু বাড়ীতে। মনে প্রাণে কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন, প্রতিবাদী মন বিপ্লবী মন কখনই চুপ করে থাকে না, মনের কথা বলার মত শোনার মত লোক চাই, পিতা রাজানারায়ণ মধুর ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত। মধু পরিষ্কার বলতে চাইছেন না, যে কেন তিনি কলেজে পড়বেন না, আর রাজানারায়ণের বুঝতে কষ্ট নেই যে কার সাহেবের সাথে মধুর বনিবনা হচ্ছে না। ২৭শে নভেম্বর মধু রাতের বেলায় আবার গৌরদাস কে লিখলেন—

I will show you my wretched self now and then, but to colloge I will not, I can not go, I hate the D-D-Fellow K-R-He wounded my feelings.

মধু নিশ্চল পাথর নয়, তার উচ্চাভিলাষ এবং বড় হবার নেশা আছে। মধুর আজন্ম স্বপ্ন বিলাত, বিলাতে যেতে পারলে মধুসদন ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারবেন। রিচার্ডসন সাহেবের সঙ্গে বিলাতের নানাপত্র পত্রিকার বিশেষ সম্পর্ক ছিল, মধুসূদন তা জানতেন। রিচার্ডসন

সাহেব মধুসূদনকে কিছু আশা দেখিয়ে ছিলেন বিলাতের। ঠিক সেইজন্য মধুসূদন রিচার্ডসন সাহেবের বিশেষভক্ত ছিলেন, কার সাহেবের কানেও সে বিষয় গিয়েছিল। এই বিলাত যাবার ব্যাপারে কার সাহেব মধুসূদনকে বিশেষ অপমানও করেছিলেন। সুতরাং মধুর তো রাগ হবেই কার সাহেবের উপর। পিতা রাজানারায়ণের বুঝতে নষ্ট হয়নি, কিন্তু স্নেহবৎ পুত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার মত সাহস ছিল না। তাই বার বার পুত্রকে বুঝিয়েছেন কিন্তু পুত্র Don't care কারণ সামনে তার বিলাত যাবার স্বপ্ন—মধু বার বার গৌরকে বলেছে সামনের ডিসেম্বরে আমার বিলাতের রাস্তা খোলা হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নে বিভোর মধু। মধু জানতেন রিচার্ডসন সাহেব মধুকে বিলাতে নিয়ে যাবেন কিন্তু হায়! সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ডসন সাহেব বিলাত চলে গেলেন মধুকে না নিয়ে—রিচার্ডসন সাহেব বিলাত যাবার পর কার সাহেবই হলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। মধু মন মরা হয়ে গেলেন। পিতাকে বললেন—আমায় শিবপুরের বিশপ্স কলেজে ভর্তি করে দাও। সেই সময় খ্রীষ্টান ইংরেজ বালকগণ উচ্চশিক্ষার জন্য বিশপ্স কলেজে পড়াশুনা করত।

মধুসূদন অসাধারণ মেধাবী ও মনোযোগী তাই পিতা রাজনারায়ণ তাঁকে ঐ কলেজে ভর্তি করে দিলেন। মধুসূদন যাতে সুশিক্ষিত হয়ে যশস্বী হতে পারে তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই করলেন। তবে শিক্ষা দীক্ষায় তখন বিশপ্স কলেজ ছিল অগ্রগণ্য। নানা ভাষা শেখানো হত। বিশপ্স কলেজে তিনি সাধারণ বিভাগে ভর্তি হলেন। ইংলণ্ড থেকে আসা বিশপ্সগণ প্রাচীন ভাষা ও নানা দেশের ভাষায় পড়াতেন, মধুসূদন ধীরে ধীরে সব ভাষায় পারদর্শী হতে লাগলেন। এই সময় তিনি লাতিন, গ্রীক, জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় বালকদের সঙ্গে মধুসূদনের বনিবনা হচ্ছে না, এখানেও ইউরোপীয় ছাত্রগণ যে সুযোগ সুবিধা পাবে ভারতীয় ছাত্রগণ তা পাবে না, কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে ভারতীয় ছাত্রগণ মাঝে মধ্যে প্রতিবাদও করতে লাগলেন। তবে এখন মধু আধা সাহেব আধা বাঙ্গালী। বন্ধুদের বা সহপাঠীদের তিনি বাবুর পরিবর্তে মিঃ-স্কোয়ার প্রথায় সম্বোধন করতে লাগলেন। বিশপ্স কলেজে মধুসূদন ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গী বংশীয় বালকদের সঙ্গে বাস করতেন, তাদের রীতি নীতি অনুকরণ করতেন, স্বদেশী আচার আচরণ বর্জনও করলেন। তিনি ইউরোপীয় ছাত্রদের সাথে থাকতে থাকতে হিন্দুদের সব আচার অনুষ্ঠান ভুলে যেতে লাগলেন, এমন কি বাংলা ভাষাও ভুলতে লাগলেন।

একবার মধুসূদন অসুস্থ হলেন, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভালো কোনো লক্ষণই দেখা গেল না, তখন কবির এক বিশিষ্ট বন্ধু বললেন, সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রঘুনাথ সেনের ঔষধ খেলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। কবি অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—শেষ পর্যন্ত কবিরাজ! কবিরাজ নাম শুনলে সাহেবরা আমাকে ঘৃণা করবে, অতএব মাপ কর ভাই। অসুস্থ অবস্থাতেও বইয়ের পাতা ওল্টাতে ভোলেন নি।

মধুসূদন ভাষাবিদ্ হয়েছিলেন বিশপ্স কলেজে পড়ার সময় থেকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই তেজদীপ্ত প্রতিবাদী যুবক অন্যায়ের সঙ্গে কোনোদিন আপোস করেন নি। এমন কি তিনি ইংরাজদেরও ছেড়ে কথা বলতেন না—তিনি নিজে তাঁর ধর্ম, জাতি সম্পর্কে যাই বলুন

ইংরাজ যদি হিন্দুদের সম্পর্কে বৃথা সমালোচনা অথবা নিকৃষ্ট আলোচনা করে তাহলে মধুসূদন যথার্থ জবাব দিতেন। মধুকে কেউ সাহেব বললে খুশি, কেউ যদি নেটিভ বলে তবে তার পরিণতি খারাপ করে দিতেন। কোনো কিছুতে অসম্মানিত হলে আর রেহাই নেই।

বিশপ্স কলেজে ঢোকা মাত্রই তিনি দেখলেন ইউরোপীয় ছাত্রগণ মাথায় টুপি পরে কলেজে আসত, তাকে কলেজ ক্যাপ বলা হত, টুপিটি চারকোণা বিশিষ্ট ভারতীয় ছাত্রগণ ঐ কলেজ ক্যাপ পর তে পারবে না। মধুসূদন ক্ষেপে লাল, মধু পরের দিন ঠিক ইউরোপীয় ঢঙে কলেজ ক্যাপ মাথায় দিয়ে ঢুকলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করলো।

মধু কি নিষেধ শোনার পাত্র। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন, হয় আমাকে খাঁটি বাঙালী পোষাক পরতে দাও নচেৎ ইউরোপীয় বালকদের মতো কলেজীয় পোষাক পরিধান করতে দিতে হবে। একই কলেজের ছাত্র অথচ ভারতীয়গণ এক ধরনের পোষাক পরবে আর ইউরোপীয় বালকগণ অন্য ধরনের পোষাক পরবে তা হতে পারে না। কলেজের অধ্যক্ষ মধুর ঐ ঔদ্ধত্যের জন্য কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় মধু সে যাত্রায় রেহাই পেল। রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির কৌশল খুব ভালই বুঝতেন। অধ্যক্ষকে রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝালেন, মধুসূদন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, সামান্য কারণে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলে বিশপ্স কলেজ সম্পর্কে দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে, কোনো যুবককে আর খ্রীষ্টান করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের জয় হল। তিনি কাজ হাসিল করে কলেজে আসতে লাগলেন। বিশপ্স কলেজে পড়ার সময়ও মধুসূদনের কোনো অর্থ কষ্ট হয়নি। অনেক জীবনীকার বলেছেন, বিশপ্স কলেজে পড়ার সময় বিশেষ করে খ্রীষ্টান হবার পর মধুসূদন ভীষণ অর্থ কষ্ট পেয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে তাঁর কোনো অর্থ কষ্ট হয় নি। মধুসূদনের লেখায় তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টান হবার পর বিশপ্স কলেজ থেকে বন্ধু গৌরদাসকে বার বার বলেছেন, গৌর তুমি একবার বিশপ্স কলেজে এস, আমার সঙ্গে দেখা কর, আমি তোমার পাল্কি খরচ দেব যাতায়াতের জন্য, তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। পত্রে লিখলেন,

"You will say, you have no conveyance; well, hire a Palkee, do. I will pay I have plenty of money.

পত্র লেখা সত্ত্বেও গৌরদাস দেখা করতে আসেন নি, কিন্তু মধুসূদন যে গৌরকে ভীষণ ভালোবাসেন তাই পুনরায় একটি পত্র লিখলেন—

But why not come and see me here Today? Come, take Mr, Kerr's Permission : Hire a Palkee, I will pay.

এতেই বোঝা যায় মধুসূদনের কোনো অর্থের অভাব ছিল না—কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ বসু কবি ভূষণ তাঁর বিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'জীবন চরিত' গ্রন্থে মধুসূদনের অর্থাভাবে কথা উল্লেখ করেছেন, আমার মনে হয় মহামান্য যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লেখা জীবনচরিত গ্রন্থটির অর্থনৈতিক অভাব কষ্ট মাদ্রাজের পরিবর্তে বিশপ্স কলেজে এসে গেছে সম্পাদনার দোষে। গ্রন্থটির সম্পদনা করেছিলেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। বিশপ্স কলেজে পড়ার

সময় পিতামাতার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পেতেন। বিশপ্স কলেজে তিনি যে কত গভীর ভাবে পড়াশোনা করতেন তা ভাবতেও আজ আমাদের শিহরণ জাগে। ১৮৪৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি কবি বন্ধু গৌরদাসকে লিখলেন—

It's a matter of regret to me that I haven't been able to answer your two kind letters,but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would execuse me-I must beg pardon for this short letter, but upon my ward, I can't afford a minute more so good night!

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের পরেও রাজনারায়ণ মধুকে বলেছিলেন বিলাতে পাঠাবেন, সেই আশা মধুর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, বিশপ্স কলেজে পড়ার সময়েও রাজনারায়ণ ১০০৲ (একশত) টাকা করে দিতেন, ৬০৲ (ষাট) টাকা কলেজের মাইনে এবং ৪০ (চল্লিশ) টাকা হাত খরচ, তাছাড়া মাতা জাহ্নবী দেবীও টাকা পাঠাতেন। কিন্তু মধুর তাতে চলবে কেন? টাকার জন্য বাধ্য হয়ে নিজের অতি প্রিয় কিছু কিছু গ্রন্থ সহপাঠীদের কাছে টাকার বিনিময়ে বন্ধক দিতেন। কবির ভাষায়—I was the neediest rescal in Bishop's College: I used to pawn my books. অর্থাভাবের কথা মধু কাউকে জানাতেন না, তবে এ অর্থাভাব বিশপ্স কলেজ ছাড়ার কিছুদিন আগের ঘটনা, এ অর্থাভাব অকালপক্কতার জন্য। পুত্রের আচরণে এবং মানসিক চিন্তাধারা দেখে যখন রাজনারায়ণ কিছুতেই সরাতে পারলেন না, তখন ভয় দেখানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা রাজনারায়ণের সামনে খোলা ছিল না। রাজনারায়ণ ভেবেছিলেন অর্থ কষ্টের মধ্যে রেখে যদি পুত্রকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা যায়। ঠিক সেই কারণেই তিনি পুত্রের মাসিক টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন কিছু দিনের জন্য। বিধির লিখন খন্ডায় কে, ফল হল ঠিক বিপরীত।

মধু কারো কাছে মাথা নোয়াবার নয়—সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সরকারের ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেবের কাছে দরখাস্ত জমা দিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য। মধুসূদনের শিক্ষা বুদ্ধি দেখে ছোটলাট মোটমুটি সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী কাজের নিয়মকানুন বড় কঠিন, সবই সময় সাপেক্ষ, হ্যালিডে সাহেব বললেন, মধুসূদন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের জন্য তুমি যে দরখাস্ত দিয়েছো তার নিয়ম কানুন মেনে তো আমাকে কাজ করতে হবে, সুতরাং সময় লাগবে। মধুসূদনের পক্ষে অত সময় দেওয়া সম্ভব নয়। দারুণ অর্থাভাব দেখা দিল ঠিক শেষ মুহূর্তে, এই অর্থাভাবের জন্য তিনি কারোর কাছে হাত পাতেন নি। এমনকি পিতার কাছেও নয়। দক্ষিণ ভারতীয় সহপাঠীদের পরামর্শ ও সহযোগিতায়—কাউকে না জানিয়ে মাত্র ২২/২৩ বছর বয়সে বিশপ্স কলেজকে Good By জানিয়ে বঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন, মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে। মাদ্রাজ পৌঁছে—বন্ধু গৌরদাসকে লিখলেন তাঁর ঐ সময়ের কথা—

Dear Gour Babu,

When I left Calcutta, I was helf mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that you alone did not receive a

valedictory visit from me. I never communicated my intention to more than 2 or 3 persons,

মধু বিশপ্স কলেজের কৃতি ছাত্র তবে তাঁর আত্ম সম্মানে আঘাত করলে তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না, সে ইংরাজ সাহেব হোক বা কোনো অধ্যাপকই হউন। ইংরাজ সাহেবরা ভারতীয় নেটিভ বলুক এটা তিনি মানতেন পারতেন না।

ইংরাজ সাহেবরা বৈষম্যমূলক আচরণ করুক ভারতীয় ছাত্রদের ওপর এট'ও তিনি মানতেন না, তিনি কলেজে সাহেব ছাত্রদের মতো পোষাক পরতেন কালো কোমর বন্ধ যুক্ত ক্যাসোক এবং চতুষ্কোণ টুপি—আবার সাহেবদের মতো জুতো পরতেন বাইরে গেলে।

বিশপ্স কলেজে অতি গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন, এমন জেদী এবং তেজী ছাত্র বিশ্বে বিরল। একটা ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশপ্স কলেজে নৈশ্য ভোজের আগে সব ছাত্রদের মদ পরিবেশন করার রীতি ছিল, একদিন নৈশ্য ভোজের সময় ইউরোপীয় ছাত্রদের মদ দিতে দিতে মদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন তাকিয়ে আছে মদের দিকে। অথচ ভারতীয় ছাত্রদের কপালে মদ জুটল না, মধুসূদন স্টুয়ার্ড সাহেবের কাছে মদ দাবী করলেন। স্টুয়ার্ড সাহেব নিরুপায়, তিনি বললেন অদ্য মদ্য শেষ। ব্যাস্, কথা শেষ হতে না হ্তেই মধুসূদন মদের গ্লাসটি টেবিলের উপর ছুড়ে ভেঙ্গে দিলেন। স্টুয়ার্ড সাহেব কলেজের অধ্যক্ষকে রিপোর্ট দিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে কোনো শাস্তি দিতে পারলেন না তবে চিরকালের জন্য বিশপ্স কলেজে মদ্যপান ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল।

ইংরাজ শাসনকালে একমাত্র মধুসূদনই ইংরাজের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে লড়াই করেছেন। তিনি নিজেকে হিন্দু বলে গর্ববোধ করতেন, তিনি সাহেবদের কাছে জোরের সঙ্গে বলতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি তোমাদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। ইংরেজি পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ে লিখে তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যে যে ধনদৌলত আছে তা তোমাদের নাই, কিন্তু বিশ্বে অন্যতম যশস্বী কবি হবার জন্য তিনি বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠানো আরম্ভ করলেন, মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি এক ইংরেজ সম্পাদককে পত্র লিখলেন—

To

The Editor of Bentley's Miscellany London

Sir, It is not without much fear that I spend you the accompanying productions of my juvenile muse, as contribution to your periodical the magnanimity with which you always encourage the aspirants to literary fame induces me to commit myself to you. 'Fame' sir, is not my object at present, for I am really conscious I do not deserve it. All that I require is encouragement, I have a strong Conviction that a puplic like the British discerning generous and magnanimous-will not damp the spirit of a poor foreigner, I am a Hindu a native Bengal and study English at the Hindu college in calcutta. I am now in my eighteenth

year,-a child-to use the language, of a poet of your land, Cowley "in learning but not in age."

Calcutta-Khidirpur I remain
Oct-1842 &-c.

কবি সাহিত্যিক মাত্রই যশ খ্যাতির বিড়ম্বনা থাকে, সবাই চায় তার সৃষ্টিতে বেঁচে থাকতে। কবি মধুসূদনের ছিল ভয়ঙ্কর নেশা শ্রেষ্ঠ হবার, এত অল্প বয়সে কোন বালক স্বপ্নেও ভাবতে পারে না অথচ সেই বয়সে মধুসূদন শেক্সপীয়র মিলটন বায়রনের সমকক্ষ হতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্য তাঁকে তো যোগাযোগ রাখতেই হবে মহামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে, তাই বলে সেই সব মহামান্য ব্যক্তিরা যদি ভয় দেখায়, নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করার জন্য, নিশ্চয়ই তা দুঃখজনক।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বিশপ্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ইংরাজদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, মধুসূদন শ্রেষ্ঠ ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্ক করার প্রধান মাধ্যম করে নিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন সম্পর্কে লিখেলেন—

I was then living in Cornwallis square as minister of christ-church. He called one day and introduce to me as a religious inquirer almost persuaded. To be a Christan. After Two or three interviews and a great deal of Conversation, I was impressed with the belief that his desire of be coming a christian, was, scarcely, greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the Two questions, and while I conversed with him on the first.

I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed disheartened and came to me less freequently after that ... one day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu college. Wishing at the same time, to be a christian and to go to England. My friend felt very much imtcrested in the case and expressed a desire of seeing the enter praising youth.I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next, and at his own desire, gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal".*

মধুসূদন সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যাই ভাবুন অথবা যতই কৌশল নীতি অবলম্বন করুন মধুসূদনের কিছু যায় আসে না, কবি তাঁর নিজের জায়গা থেকে এক চুলও নড়তে নারাজ, রেভারেন্ড বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব উপদেশ শুনেছেন সব প্রলোভন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন কিন্তু মধুসূদনের যে পথ যে লক্ষ্য যে উচ্চাভিলাষ যে মানসিক চিন্তাভাবনা তা

থেকে নড়ানো কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। কবি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার দিকে সকলকে এনেছেন, হয়ত কবি পরাজিত তবে সে সাময়িক ভাবে, মূলত তিনি জয়ী তাঁর লক্ষ্যে। তাঁকে অবজ্ঞা করার ক্ষমতা কারো ছিল না, রেভারেন্ড বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে মধুর মত প্রতিভা সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না, বন্ধুবর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু গৌরদাস বসাক বলেছেন, মধুসূদনের সমকালবর্তীদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহু ভাষাবিদ্ ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ ইংরাজীতে তিনি লিখলেন,

As a linguist and a scholar, he had Scarecly any equal among his contemporaries and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the Europen language, and in the literature, both ancient and modern of European countries.

তবে মানতেই হবে বিশপ্স কলেজে পড়াকালীন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মেছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন মধুসূদন বিশপ্স কলেজে চার বছর পড়েছেন আবার অন্য প্রমাণে পাওয়া যাচ্ছে মধুসূদন বিশপ্স কলেজে তিন বছর পড়েছিলেন, সে যাই হোক ১৮৪৭ সালের শেষের দিকে মধুসূদনের পিতা বিশেষ ভাবে বিরক্ত হয়ে মাসিক অর্থ বন্ধ করে দেন এর থেকে বোঝা যায় মধুসূদন প্রায় চার বছর বিশপ্স কলেজে পড়েছেন, মধুসূদন কত বছর বিশপ্স কলেজে পড়াশুনা করেছেন তা নিয়ে মাথা ব্যথা আমার নেই, এমন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবন ও সাহিত্য লিখতে বসে মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত ও অবাক হয়ে যাচ্ছি। এমন প্রতিভা পৃথিবীর বুকে আর একজন জন্মেছে কিনা আমার জানা নেই।

মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী আর্চ ডিকন ডিল্ট্রীর নিকট ওল্ড মিশন চার্চ ধর্ম মন্দিরে। ঠিক সেই সময়ে সেই বয়সে ধর্ম সঙ্গীতও রচনা করলেন, যে পবিত্র ভাব নিয়ে এই ধর্ম সঙ্গীতটি তিনি রচনা করেছিলেন তা যদি জীবনে স্থায়ী হত তাহলে কত না সুখের জীবন তাঁর হত।

Hymn
By M.S. Dutta
A Hindu youth
Composed by him-to be sung at his-Baptism

I

Long sunk in Superstition's Night,
By sin and satan driven-
I saw not,-cared not for the light
That leads the blind to heaven.

II

I sat in darkness, Reason's eye
was shut,-was Closed in me :-

I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

III

But now at length, thy grace, o lord!
Bids all around me shine :
I drink thy sweet,-thy precious word,-
I Kneel before thy shrine!-

IV

I've broke Affections Tenderest Ties
For my blest savior's sake;
All, all I love beneath the skies,
Lord! I for thee forsake.

9th February 1843

কবি সবাইকে বঞ্চিত করে সব মায়া মমতা ছিন্ন করে ইংরাজের দূর্গে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখলেন—লক্ষ্য বিলাত-ইংলন্ড ! ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর যশলিপ্সা তবে অর্থাভাব দূর করতে পারেন নি। রইলেন গোপনে দুর্গে। পুত্রকে উদ্ধার করার জন্য পিতা রাজনারায়ণ ইংরাজের বিরুদ্ধে লাঠিয়ালদের পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু হতাশ হয়ে সবাইকে ফিরতে হয়েছিল। মধু পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয় স্বজন, পিতা, ও বান্ধবদেরও আমি তোমাদের জীবন যাত্রার অংশীদার হতে চাই না।

মহামান্য যোগীন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম পথ প্রদর্শক, কবির সমাধিলিপি কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে কোন দিন স্থান পেত না, কেউ জানতেও পারতেন না এত মূল্যবান একটি কবিতা মধুসূদন লিখেছিলেন যা আজ আমাদের মুখে মুখে ভাসে। এই কবিতাটি কবির মৃত্যুর অল্প সময় পূর্বে গৃহের ছিন্ন কাগজের মধ্যে পড়েছিল, কবি কামিনী রায়ের সহযোগীতায় কবিতাটি উদ্ধার হয় এবং তা মহামান্য কবিবর যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় -এর হাতে তুলে দেন। এবং যোগীন্দ্র নাথ বসু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'জীবন চরিত' -এ উল্লেখ করেন।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজানারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

মধুসূদন চার বছর বিশপ্স কলেজের জীবনে সবাইকে চমক দিয়েছেন বারে বারে। তাঁর বিদ্যার শক্তিতে, কি অধ্যাপক কি আত্মীয়-স্বজন সবাইকে যেমন মোহিত করেছেন তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার জন্য তেমনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সকলের অজান্তে বিশপ্স কলেজ ত্যাগ এবং বঙ্গভূমি ত্যাগ করে ঝাঁপ দিলেন অনিশ্চিত অন্ধকারে। সকলকে মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে, চললেন অন্ধকার ভবিষ্যতকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ। সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু আর সামান্য অর্থ, ২২/২৩ বছরের তরুণ যুবক স্টীমারে চড়লেন মাদ্রাজ রওনা হবার উদ্দেশ্যে। যশ খ্যাতির মোহ কবিকে কোথায় নিয়ে যায় এবার দেখার সময়। এই ভয়ঙ্কর জীবনকে কবি বেছে নিলেন কেন! বাবা মার বাধ্য সুবোধ বালক হয়ে তো কবি থাকতে পারতেন। না তা হয় না কবি জন্ম থেকেই ছিলেন পথ প্রদর্শক, সকলের পথের সঙ্গে কবির পথ মিলবে কেন? কবি তো স্বয়ং নীলকণ্ঠ ক্ষ্যাপা ভোলানাথ—তাছাড়া কবির এই ভয়ঙ্কর সব ঘটনার পিছনে কৃষ্ণমোহনের গোপন কৌশল ছিল আবার তার ভালোবাসাও অপরিসীম, তাঁর এই ভালোবাসা এবং কৌশল দ্বৈত ভূমিকায় কবির জীবনকে এক ভিন্ন পথের ঈশারা দেখালো,

গৌরদাস তাই তো বলেছেন—

Madhu (he) always to tell me that he would rather die a benediet than wed an illiterate, unsymathc fire girl and in those days an educated femel. Was a rara avis in our society. The one solitary exception being in the family of a native christian celergyman but his hopes in that Quanter, If any were Nipped in the bud.

এক সঙ্গে বহু সমস্যা কবিকে দৌড় করিয়েছে, দেখা যাক মাদ্রাজ প্রবাস কবিকে কেমন রাখে। এ যেন এক দুরন্ত ঝড়, এ যেন এক দুরন্ত সাইক্লোন, কোন থামার চিহ্ন নেই। ধুমকেতুর মত হঠাৎ হঠাৎই জ্বলে উঠেছেন। ধর্মান্তর হওয়ার কারণ তার আশা সবই এক করুন ট্রাজেডি হয়ে গেল! ধর্ম ত্যাগ করলেন ঠিকই কিন্তু ইংলন্ডে আর যেতে পারলেন না, সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের এই মুহূর্তে মৃত্যু হল।

ইংলন্ডগামী জাহাজের খবর এখনো কবির কাছে আসেনি, ঔপনিবেশিকে শাসন ব্যবস্থার মিথ্যা কলা কৌশল কবির জানা ছিল না। শুধু ধর্মান্তর করার জন্য কবিকে আকাশ ছোঁয়া কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীগণ, যখন আশার আলো ক্রমশ ক্ষীন হয়ে এল, বিশপ্স কলেজে তখন কবি ভীষণ বিরক্ত বোধ করলেন নিজের জীবনের উপর। ইংলন্ডের জাহাজ না আসায় তিনি মাদ্রাজগামী স্টীমারে উঠলেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া কবির সামনে আর কোন পন্থা ছিল না। তাঁর জীবনের অহং বোধকে প্রাণের শক্তিকে দুর্বল করে দিল। সেই সময় কবি প্রায় অর্ধ উন্মাদ হয়ে চললেন মাদ্রাজে। সেই সময় স্টীমারে মাদ্রাজ যেতে সময় লাগত চার-পাঁচদিন। কিন্তু মধুসূদনকে পৌছাতে হয়েছিল হয়ে ছিল ১৯-২০ দিন বাদে। কারণ অর্থাভাবের জন্য তিনি লোকাল স্টীমারে উঠেছিলেন, যে স্টীমার সব বন্দর ছুয়ে তবে মাদ্রাজ যাবে। দেখা যাক মাদ্রাজ জীবনের সংগ্রাম, আমাদের কেও কবি নিয়ে চললেন মাদ্রাজে, চলুন কবির মাদ্রাজ জীবন দেখি।

মাদ্রাজ প্রবাসে — শ্রী মধুসূদন

প্রতিভার উত্তেজনা

১৮৪৮ প্রথম ভাগ থেকে ১৮৫৬ প্রথম ভাগ

॥ চব্বিশ বছর বয়সের যুবক ॥

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মধুসূদন ওল্ড মিশন চার্চের ধর্মমন্দিরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন আর্চ-ডিকন ডিল্ট্রীর মন্ত্র উচ্চারণে (Arch-deacon Dealtry)। সেদিন থেকে মধুসূদনের নামের আগে মাইকেল নামটি সংযুক্ত হল, গর্বে তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন Now I am Michael M.S Dutt. মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে না জানিয়ে ধর্মত্যাগ করলেন যদিও সেই বয়সে আরো দুজন বঙ্গসন্তান খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গোবিন্দ সামন্ত এবং লাল বিহারী দে- উভয়েই সুলেখক ছিলেন। চার বছর তিনি বিশপ্স কলেজে ছিলেন, অনেক মাদ্রাজী বন্ধু কবির সঙ্গে কলেজে পড়ত, তাদেরই পরামর্শে কবি মাদ্রাজের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কাউকে না জানিয়ে সবকিছু ফেলে রেখে হঠাৎ অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। মা, বাবা তো দূরের কথা অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাককেও কিছু জানালেন না। কেন এত অভিমান? এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যে তাকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করতে হল? মধুসূদন পিতার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন ভীষণ ভাবে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর রাজনারায়ণ তাঁকে নিজ ব্যয়ে বিলাত যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখেন নি উপরন্তু কলেজে পড়ার খরচ মাসিক যে একশত টাকা তিনি পেতেন তাও রাজনারায়ণ অপব্যয় মনে করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন শেষের দিকে।

মধুসূদনের মনের আগুনকে পিতা রাজনারায়ণ ছেলে মানুষের আবেগ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, মধুসূদন মাথা নোয়াবার মানুষ ছিলেন না—কিন্তু মধুসূদন ছিলেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তাঁকে যেতেই হবে। মধুসূদনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না—অসহায়-সম্বলহীন-মধুসূদন উদ্‌ভ্রান্তের মত কোনো চিন্তা ভাবনা না করে অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দিলেন, তাঁর জীবনের সবথেকে প্রিয় বস্তু—গ্রন্থ, অর্থাভাবের জন্য তিনি সেই গ্রন্থকেও পণ্য করে তুললেন, তাঁর লেখা একটি লাইনে স্পষ্টতই বোঝা যায়।

I was Neediest rascal in Bishaop's collage. I used to pawn my books.

মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে,

অচেনা অপরিচিত বন্ধুহীন, মাদ্রাজে পৌঁছেই তাঁর জীবনে একের পর এক বিপদ আসতে লাগল। অভিমান, ক্রোধ, দুঃখ সব মিলিয়ে পিতার সংগে বাক্ যুদ্ধ, লজ্জায় বিশপ্স থাকার আর উপায় ছিল না, দুহাত ভরে মধুসূদন যে টাকা ব্যয় করতেন আজ তাকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হল। অথচ কারোর কাছে হাত পাততেও পারছেন না। পিতা রাজনারায়ণ টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি পিতা-মাতার মুখও দর্শন করতে চাননি, ধিক্কারে লজ্জায় হঠাৎ ত্যাগ করলেন বিশপ্স কলেজ, তবে মাদ্রাজের ফিরিঙ্গি সমাজ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন

বিপদের সময়। সেই সময় মাদ্রাজ যাওয়া ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল, না ছিল রেল পথ, না ছিল বাষ্প যান, কি ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাস এই যুবকের। ধীরে ধীরে বিপদ কাটতে লাগলে বন্ধু ভাগ্যে। চাকরি পেলেন, Blue Eyed Girl পেলেন, সাহিত্যের জন্য সুনাম পেলেন কিন্তু অসংযত চিত্ত মধুসূদনের মন ভরল না। তবুও না পাওয়ার আগুন তাঁর বুকের মধ্যে।

পৃথিবীতে যারা যশস্বী হন তাঁদের বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে, সে আগুন সৃষ্টির আগুন, পৃথিবীতে দাগ রেখে যাবার নেশা, ঐশ্বর্যের জন্য অর্থ নয়, সৃষ্টির জন্য অর্থ, নচেৎ সৃষ্টি ধ্বংস হবার নমুনা আমরা দেখেছি বহু মহামানবের জীবনে। আত্মার স্বাধীনতা এবং অর্থের স্বাধীনতার যোগসূত্র ঘটলে সৃষ্টির মহত্ব প্রকাশ পায়। আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় এবং কঠোর সাধনা স্রষ্টাকে বিহ্বল করে তোলে, তারও জীবনের ধারাবাহিক কারণ আছে। পৃথিবীতে জন্ম নিতে সবাই জানে না, জন্ম নেওয়া জানতে হয়, জন্মের জন্য চাই কঠোর সাধনা, দৈব শক্তি এর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। যখন দানবীয় ও ঐশ্বরিক শক্তির মিলন ঘটে তখন জীবনে এক প্রকার যন্ত্রণার সুর ভেসে ওঠে। কোটি কোটি মানুষ যারা খায় দায় ঘুমিয়ে পড়ে, যারা ঘুমের ঘোরে থাকে, তারা অবচেতন মনে পৃথিবীতে চলাফেরা করে, নিকৃষ্ট জীবের মত। পৃথিবীকে বিব্রত করবার জন্য অসংখ্য দু'পদযুক্ত জীবেরা পৃথিবীর রূপ রস বিনষ্ট করছে, পৃথিবীকে যারা বাঁচিয়ে রাখে তাদের সংখ্যা তো ভীষণ কম, সেই মহামানবদের জীবন-কর্মধারা আমাদের জীবনে পরম পাথেয়। সেই মহান মহা কবি মধুসূদন দত্তের জীবনেতিহাস কার না ভালো লাগে? এ যেন মহাকাব্যের এক নায়ক। সবাইকে কাঁদিয়ে অজানা অপরিচিত মাদ্রাজে পাড়ি দিলেন। তখনকার সময় মাদ্রাজ যাওয়া ভীষণ কঠিন ছিল, ভয়ঙ্কর জলপথ অতিক্রম করে যেতে হতো মাদ্রাজে।

প্রতিবাদী জীবন এখন কোন্ পর্যায় যায় দেখা যাক, হয় বিশ্ব বিজয়দর্পী নেপোলিয়ান নয় সর্বত্যাগী বুদ্ধ অথবা যীশু, হয় রত্নাকর নয় বাল্মিকী অথবা হয় আল্পস নয় প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ, এই হল মধুসূদন। কোনো মাঝামাঝি পথ নয়—

যা চেয়েছিলেন যা ভেবেছিলেন তা সবই শূন্য-দরিদ্র-ভবিষ্যত, যে বয়সে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা নিতান্তই দুর্বল ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, বাস্তবায়িত জ্ঞানের অধিকারী হয় না, ভবিষ্যৎ ভাবনা তো দূরের কথা নিজের জীবন চেতনার ক্ষমতা থাকে না, সেই বয়সে এক এক জন কালজয়ী ছাত্র জন্মায় যারা বিশ্বকে, জাতিকে, ধর্মকে চমকিত করে তোলে, বিস্মিত করে তোলে। সেই চব্বিশ বছরের তরুণ যুবক মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ প্রবাসের প্রথম দিকেই রচনা করলেন ক্যাপ্‌টিভলেডী—কিন্তু প্রকাশ করার মত প্রকাশক কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস বসাকের কথা। যখনি অর্থের প্রয়োজন হয় তখনি কবি সবাইকে আপন করে নেন, তাই বলে তিনি অর্থকে আপন করে নিতে কখনই পারেন নি। ধার করেও দান তিনি করতেন, এমনই মানুষ তিনি তো বলতেই পারেন বন্ধু গৌরদাসকে 'ক্যাপটিভলেডী'র জন্য তুমি কিছু সদস্য মূল্য পাঠাও। মধুসূদন ঐশ্বর্য্যের পেছনে ছুটেছেন, ধন-দৌলত এবং যশের পেছনে ছুটেছেন। কবি কাব্য সৃষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যের কামনা করতেন, তবে সাধারণ মানুষের ঐশ্বর্য্যের কামনা এবং কবির ঐশ্বর্য্যের কামনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। তিনি সঞ্চয়ের জন্য ঐশ্বর্য্য কামনা করতেন না, খরচের

জন্য ঐশ্বর্য্যের কামনা করতেন। বন্ধুদের তাই প্রায়ই সময়ই বলতেন,—"চল্লিশ হাজার টাকার কমে একটি মানুষের ভদ্র ভাবে চলে না"। তাঁর জীবনে আত্মার যশ ও আনন্দ আর একদিকে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের আনন্দ, দুটি-ই ছিল তাঁর। এ সবই যেন কল্পনার ঐশ্বর্য্য। অর্থাভাব তাঁর জীবনে একসঙ্গী, ধার করে বিলাসিতা করা বা অন্যকে সাহায্য করা যেন তাঁর কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিল, অথচ সুদূর মাদ্রাজে চরম অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি 'ক্যাপটিভলেডী' দুখন্ডে শেষ করলেন। ছাপার দায়িত্ব নিলেন নিজে অথচ তাঁর খেয়াল নেই ছাপার পরেই ছাপাখানার মালিক বিল পাঠাবে এবং তা পরিশোধ করার ক্ষমতা কবির নেই।

লিখলেন বন্ধু গৌরদাসকে—

প্রিয়তম বন্ধু,

তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ, আমার পক্ষে তোমাকে ভোলা অসম্ভব। তুমি নিশ্চয়ই জানিয়ো আমার জানাশোনা লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করিয়া তোমার কথাই মনে হইতেছে, কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে বিরক্তি ও উদ্বেগে আধ পাগলের মত হইয়াছিলাম। মনে করিও না যে, তোমাকেই কেবল বিদায় জ্ঞাপন পত্র দিই নাই। দুই-তিন জন ছাড়া কাহাকেও আমার মনের কথা বলি নাই। এখানে আসিবার পরে জীবিকা উপায়ের জন্য প্রথমে খুব চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। বন্ধু বিহীন বিদেশির পক্ষে ইহা বড় সহজ কথা নয়। ভগবানকে ধন্যবাদ আমার বিপদ একরকম কাটিয়া গিয়াছে, এখন আমি জাহাজের সেই নাবিকের মত যে ঝড়ের মধ্যে কোনো একটা বন্দরে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছি, এই দেখ কেমন একটা উপমা দিলাম! আমার বিবাহ সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছো তা সত্যই—মিসেস্ ডি. জাতিতে ইংরাজ। তাহার পিতামহ এই প্রদেশের একজন নীলকর সাহেব ছিলেন। আমাদের বিবাহের পথে যথেষ্ট বাঁধা ছিল, তাহার বান্ধবেরা এ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমি একখানি কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছি। গ্রন্থকার হিসাবে ইহাই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। কাব্যখানি দুই সর্গে সমাপ্ত। নাম "ক্যাপটিভলেডী" ইহাতে বারোশত ছত্র ভালো, মন্দ, মাঝারি শ্লোকও আছে। আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহা তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে লিখিয়াছিলাম। আমি ইহার স্থানীয় একখানা কাগজের জন্য লিখিয়াছিলাম। ইহার সম্পাদক ভারত বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনি আমার গুণগান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানকার অনেক গুণী লোক যাহাদের মতামতের ওপর নির্ভর করা যায়। তাহারা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কাজেই দেখ ছাপাখানার দৈত্য-দানবেরা আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধু তোমাকে একটা অনুরোধ, এখানে সামান্য কয়েকজন লোককে জানি, কাজেই বই ছাপিবার খরচ উঠাইবার আশা এখানে করিতে পারি না। তুমি কি কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পার না? তুমি চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই পারো। দুই টাকা গ্রন্থের মূল্য। আমাদের স্কুল কলেজের বন্ধুদের মধ্য হইতেই জনা চল্লিশেক সংগ্রহ হইতে পারে তুমি শীঘ্রই আমাকে জানাইবে। কতগুলি বই তোমার দরকার।

এই বার দেখাও, তোমার ভালবাসা কত? আমি সত্যই বলিতেছি বই হইতে লাভ করিবার আদৌ ইচ্ছা আমার নেই, কেবল ক্ষতি না হয় ইহাই চাই ....

গৌর! তুমি কি কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রীরামপুর সংস্করণ পাঠাতে পারো? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ভাই আমি বাংলা ভুলতে বসেছি, তুমি বিশপ্স কলেজে খামের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দিও সদস্যদের চাঁদায় আমি জাহাজ খরচা দিয়ে বই পাঠানোর পরে পত্রে বিস্তারিত জানাবো।

পুনশ্চঃ- অফিসে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, বাসায় ফিরিয়া মিসেস দত্তকে তোমার চিঠি দেখাইব তিনি খুব খুশী হইবেন। মেয়েটি খুব ভালো, আমার ঠিকানা মাদ্রাজ মেল অর্ফ্যান অ্যাসাইলাম ব্ল্যাক টাউন। ইতি—

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯

মধুসূদন যে আশা নিয়ে বন্ধু গৌরদাস বসাককে পত্র লিখলেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থ। কিন্তু হায় গৌরদাস অর্থের কোন কথা উল্লেখ না করে গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে পত্রের উত্তর দিলেন। মূলত গৌরদাস বসাক কাব্য রসিক ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন না। মধুসূদন হতবাক হলেন পত্র পড়ে। তিনি গৌরদাসের কাছে প্রশংসার আশা করেননি, তিনি আশা করেছিলেন অর্থ, কারণ উচ্চাভিলাষী চব্বিশ বছরের তরুণ কবি ইতিমধ্যেই বহু প্রশংসা পেয়েছেন এবং অনেকে কবি লর্ড বায়রণ বা স্যার ওয়াল্টার স্কচের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এথিনিয়ন সংবাদ পত্রও কবির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাই বন্ধু গৌরদাস বসাকের প্রশংসা তিনি চান নি চেয়েছিলেন অর্থ, কবির এক হাতে প্রশংসা পত্র এক গুচ্ছ, অন্য হাতে ছাপা খানার দেনা—ঋণোদ্‌ভ্রান্ত কবি কি ভাবে দেনা শোধ করবেন। ১৮৪৮ শেষ ভাগে মাদ্রাজ সারকুলার পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় তাও নিজের নামে প্রকাশ করেন নি কবির ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'টিমথি পেন পোয়েম' এটাই ছিল কবির ছদ্মনাম, পরে ১৮৪৯ সালে ক্যাপ্‌টিভলেডী এবং ভীষণ অফ্ দি পাস্ট অসম্পূর্ণ কবিতা একত্রে গ্রন্থকারে প্রকাশিত করেছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাস কালেও মধুর অর্থ ভাগ্য ভাল ছিল না, বন্ধুভাগ্য মধুর ছিল দারুণ। তাছাড়া মধুসূদনের ভালোবাসা ছিল সমুদ্রের মত আকাশের মত পবিত্র। বেহিসাবী ভালোবাসা ছিল মধুর বন্ধুদের প্রতি। বন্ধু গৌরদাস বসাক ক্যাপ্‌টিভলেডীর জন্য কোলকাতাতে কোন গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারেন নি তবে বিক্রির ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। কবি সুদূর মাদ্রাজ থেকে পত্রে লিখেও দিয়েছিলেন গৌর তুমি বি.বি. দত্ত, হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, শ্যাম এবং স্বরুপ এরা কি আমাকে চাঁদা পাঠাবে না? এমন কি I have written Mr. Montague of the Hindu Collage to get me a few subscribers, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বহু প্রশংসা পেয়েছেন কবি, তবে কোলকাতা থেকে পেয়েছেন ভয়ঙ্কর সমালোচনা। যখন মাদ্রাজে তার ক্যাপ্‌টিভলেডী এবং ভীষণ অফ্ দি পাস্ট প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন কবি কোলকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বই পাঠিয়ে ছিলেন—কিন্তু আশ্চর্য্য সে সময়ের প্রথম শ্রেণীর কাগজ ছিল বেঙ্গল হরকার, এবং হিন্দু ইনটেলিজেন্সা এই দুটি সংবাদ পত্র গ্রন্থগুলোকে নিন্দাও শ্লেষোক্তি করতে দ্বিধা করেনি। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে কবি গৌরদাস কে লিখলেন—

আমি দেখিতেছি তোমাদের হরকরা এবং হিন্দু ইন্টেলিজেন্সা সংবাদ পত্র বড়ই রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অভিশপ্ত রাস্কেল। আমি বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছি। আমি এমন সব লোকের

প্রশংসা অর্জন করিয়াছি, যাহাতে এইটুকু নিন্দা আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি। 'কবির মাদ্রাজ জীবনে বিস্তর বাধা বিপত্তির মধ্যেও সংসারের দারুন অর্থাভাবের মধ্যেও কাব্য সাধনা থেকে বিরত হন নি। ইংরাজী ভাষা তো কবির চলনে বলনে স্বপনে যে অবস্থার মধ্যে কবি ক্যাপ্‌টিভলেডী রচনা করেছিলেন' সেটা তার উপযুক্ত সময় ছিল না। চঞ্চল অস্থির চিত্ত কবি অক্ষয় কীর্তি লাভের জন্য নিশ্চল হলেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য অর্থাভাবে জর্জ্জরিত, সংসারের অভাব যেন কবিকে গলাধঃকরণ করে রেখে দিল, বেশ কিছুদিন বাদে গৌরদাসের সহযোগিতায় প্রায় পঞ্চাশ জন গ্রাহক সংগ্রহ হয়েছিল আর যে সব বিখ্যাত মানুষেরা কথা দিয়েছিলেন দুই টাকা দিয়ে বই কিনবেন তারা যথা সময়ে গা ঢাকা দিল। মধুসূদনের চরম আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক দারুণ ভাবে বক্রোক্তি করতে ও ছাড়েন নি, তবে কবির কথা মত গৌরদাস বেথুন সাহেবকেও বই দিয়েছিলেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব বই পড়ে হরকরার সম্পাদকের মত নিকৃষ্ট সমালোচনা না করে উপদেশ দিয়ে গৌরদাসকে লিখেছিলেন মধুসূদন সম্পর্কে, তোমার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাবে গ্রন্থের জন্য। নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সুযোগ আমার কাছে কিছু বলার, তোমরা জানো আমি বার বার দেশের বিভিন্ন সভায় আলোচনা চক্রে বলে থাকি নিজের মাতৃভাষায় বহু মূল্য সম্পদ আছে তা তোমরা সংগ্রহ করে মাতৃভাষার উন্নতি কর। নিজের ভাষায় যদি তোমার বন্ধু গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে আরো সম্মান ও মর্যাদা পাবে—যদি তোমার বন্ধু মাতৃভাষায় লেখেন অনেক উন্নতি করতে পারবেন এবং মাতৃভাষায় নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন।

কবিকে মাতৃভাষায় আত্মনিয়োগের জন্য বিশেষ উপদেশ দান করেছিলেন। কিছু দিন বাদে গৌরদাস বসাক কবির কাছে বেথুন সাহেবের পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আঘাতের পর আঘাত এসেছে 'ইংরাজী সাহিত্য চর্চার জন্য। সে সময়ে সকল মহান ব্যক্তিদের একই কথা- মধুসূদন বাংলা ভাষায় চর্চ্চা করলে বাংলা ভাষার অনেক উন্নতি হত। তিনি গৌরকে একপত্রে লিখলেন "Old Gour Dass Bysak. Can't you send me a Copy of the Bengali Translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana Serampur Edition. আট বছর প্রবাস কালে কবি বাংলা ভাষা সত্যই ভুলতে বসেছিলেন। তদুপরি কঠোর সমালোচনা। ঠিক সেই জন্যই কবি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন রামায়ণ মহাভারত পাঠাতে। মাদ্রাজ থাকাকালীন তাঁর আজন্ম স্বপ্ন যে ভ্রম ছিল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর সে ভ্রম দুরীভূত হল, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শেক্সপীয়র মিল্টনের ভাষায় চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বিদেশী কবির পক্ষে। বেথুন সাহেবের উপদেশ তাঁর মনকে মাতৃভাষার সাধনায় আকৃষ্ট করেছিল যেমন তেমনি মনে মনে ক্ষুব্ধ ও হয়েছিলেন প্রথমার্ধে।

মধুসূদন কোন দিন শান্ত হতে পারেন নি, হৃদয়ের মধ্যে আগুন, সে আগুন যশের আগুন, সম্পদের আগুন, ঐশ্বর্যের আগুন, এই অগ্নিকে নির্বাপিত কোরবার জন্য মুষ্টিমেয় কিছু শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তবে ঐ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কোরবার জন্য অনেক ব্যক্তি উসকে দিতেন, তার মধ্যে অন্যতম রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র

মধুসূদনকে শান্ত করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি মধুসূদনকে স্বপ্নের চাঁদের পাহাড়ে বসিয়ে তাঁর দুর্নিবার আকাঙ্খাকে জোরদার করে তুলে ছিলেন।

বিশপ্স কলেজে পড়াকালীন মধুসূদনের জীবনের মোড় ঘুরে গেল, প্রয়োজনাতিরিক্তি অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা মধুসূদনকে স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে গেল। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলের এত স্পর্ধা আসে কোথা থেকে ! সেই বয়স থেকেই মনোনীত পত্নীলাভ, ইংলন্ড গমন, ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া এ সবই ভাব জন্মেছিল রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের প্রলোভনে। সেই অপরিণত বুদ্ধিই মধুসূদনকে ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে লাগলো যৌবন থেকেই। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন তাঁকে ইংলন্ড যাবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পাকাপাকি ভাবে নীল চক্ষু নারী—এবং বড় বড় নাম করা সাহেবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এমনকি ডেপুটি গভর্নর বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচয়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠা, পিতার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা, ধর্মমত ও সামাজিক আচার নিয়েও তুমুল বাক্‌বিতন্ডা, উদ্ধত আচরণ এ সবের প্রশ্রয় দাতা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন। বিশপ্স কলেজে পড়ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক ছাত্র, সেই সব ছাত্রদের সঙ্গে মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়েছিল, তারা ও বলত মধু তুমি জিনিয়াস। মাদ্রাজে তোমার যোগ্য মর্যাদা দেবার মত মানুষ অনেক আছেন।

পৃথিবীতে কোন কোন সন্তান জন্মায় সংসারকে সুখী করবার জন্য আবার কেউ কেউ জন্মায় সংসারকে অশান্তির মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে ফেলার জন্য। মধুসূদন বোধ হয় জন্মেছেন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলার জন্য। যুবক মধুসূদন এতদিন বুঝতে পারেনি অভাব কাকে বলে, যন্ত্রণা কাকে বলে পিতার অজান্তে স্নেহময়ী মাতা জাহ্নবী রীতি মত অর্থ যোগান দিয়ে যেতেন। দারিদ্রতা যে কি মর্মভেদী যন্ত্রণাদায়ক মাদ্রাজে এসেই উপলব্ধি করলেন। মাদ্রাজ শহরে তিনি নতুন, কাউকে চেনেন না কপর্দক অবস্থা, দক্ষিণ ভারতীয় যে খ্রীষ্টান বন্ধু সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি নিয়ে এলেন মধুসূদনকে খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের গ্রামে, মাদ্রাজের উপকণ্ঠে দেশীয় খ্রীষ্টানরা থাকতেন। তাঁর জেদ এত প্রবল যে-কোন হিন্দুর কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে রাজী হননি তাই তিনি খ্রীষ্টান পল্লীতে এসেই যথেষ্ট পরিচিত হলেন। সকলের সহানুভূতি পেলেন। সকল খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের সাহায্য পেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আক্রান্ত হলেন বসন্ত রোগে, সে দিন খ্রীষ্টানগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেনি, উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাযত্নে সুস্থ করে তুলেছিলেন, নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়েই বুঝতে পারলেন ভদ্রভাবে বাঁচার জন্য অর্থোপার্জন কত কঠিন। মধুসূদনের বন্ধু ভাগ্য ভীষণ ভাল। ফিরিঙ্গি ও খ্রীষ্টানদের সহায়তায় তিনি মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে ব্রাকটাউন (বর্তমানে জর্জ টাউন) এ একটি অনাথ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের পদ পেলেন এই শিক্ষকতার ব্যাপারে হেডমাষ্টার ই.বি. পাওরাল সাহায্য করেছিলেন। এ বিদ্যালয়ে একটি বালক বিভাগ ও একটি বালিকা বিভাগ ছিল। মধুসূদন শিক্ষকতা পেলেন—Madras male orphan Asylum বিদ্যালয়ে। এতকাল তিনি সাহিত্য করতেন শুধু যশের জন্য আনন্দের জন্য, হিন্দু কলেজে বিশপ্স কলেজে কবিতা লিখতেন নিজের খেয়ালে মিলটন শেক্সপীয়র হবার জন্য। এবার তাঁর সাহিত্য হল অর্থাগমের জন্য প্রাণধারনার্থের জন্য সাহিত্য সেবা করতে লাগলেন। মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ

কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর পান্ডিত্য মানুষের কাছে প্রচার হতে লাগল। মাদ্রাজের বহু জ্ঞানী গুণী মধুসূদনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই সময়ে বালিকা বিভাগে পড়তেন স্কচ কুমারী 'Blue Eye' আজন্ম স্বপ্নের নারী রেবেকা মেকাটাভিশ। রেবেকাকে দেখেই তাঁর পছন্দ এই নারীই বোধ হয় তাঁর শৈশবের স্বপ্ন ছিল। রেবেকার পিতামহ ছিলেন একজন নীলকর সাহেব—পিতামহ কডাপা জেলার নীল ব্যবসায়ী আরথ্‌বুথন্ড কোম্পানীর এজেন্ট নাম ডুগাল্ড ম্যাকটাভিশ। মধুসূদন জানতেন অশিক্ষিত নীচমনা স্বার্থান্বেষী অন্তঃপুর নিবন্ধা বাঙ্গালী বালিকার অপেক্ষা শিক্ষিতা উন্নতমনা উদার্যময় স্বাধীনতায় অভ্যস্থা ইউরোপীয় মহিলা শতগুণে ভালো। তিনি নিজে বার বার বলতেন বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরাজ মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না। কিন্তু মধুসূদনের মত সহায় সম্বলহীন ছেলের সঙ্গে রেবেকার বিবাহ দেবে কেন রেবেকার পিতামহ। তদানীন্তন 'Advocate General' এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জর্জ নরটন সাহেব, সংবাদপত্রে মধুসূদনের বিভিন্ন লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মধুসূদন একজন পণ্ডিত কৃতবিদ্য যুবকরূপে মাদ্রাজ্যের শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, নরটন সাহেব এই যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্মতি দান করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিবাহ হল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে, তাঁর স্বপ্নের সেই 'Blue Eye maid' কে পেলেন। জর্জ নর্টন না থাকলে তিনি রেবেকাকে স্ত্রী রূপে পেতেন না। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ক্যাপটিভ্‌লেডী জর্জ নরটন সাহেবের নামে উৎসর্গ করলেন। এই জর্জ নরটন ছিলেন রেবেকার অন্যতম এক ধর্ম পিতা, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই মাদ্রাজ চার্চে মধুসূদন রেবেকাকে বিবাহ করেন। বিবাহের নিয়ম অনুসারে চার্চের রেজিস্টার বুকে পিতার নাম লেখাতে হয়, লেখালেন তবে এক অন্য আত্ম মর্যাদায়, তাঁর মধ্যেই অহমিকার দাপট ছিল ভয়ংকর। সেই চার্চের রেজিস্টারে পিতার নাম পর্যন্ত সাহেবীয়ানায় লেখালেন, তিনি লিখলেন না শ্রী রাজনারায়ণ দত্ত, লিখলেন Narain Dutt, Adovcate, Supreme Corurt of India, Calcutta. তখন রেবেকার বয়স সতেরো এবং মধুসূদনের চব্বিশ বছর ছ'মাস ছ'দিন। বিবাহের পরের বছর ছিল ১৮ই আগস্ট ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ, বার্থা বেঞ্চ কেনেট দত্ত নামে মধুসূদনের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে রেবেকার গর্ভে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ এবং উল্লাসে বন্ধু গৌর দাসকে লিখলেন 'Do you know now I am father - Heigh ho! My stars are brightening. যদিও পত্রখানি লিখে ছিলেন রেবেকা সন্তান সম্ভবা হবার সময়। কিন্তু দুঃখের কথা প্রথম সন্তান হবার পর রেবেকা অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মধুসূদন রেবেকার শরীরের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন হাওয়া পরিবর্তন না হলে রেবেকাকে বাঁচানো যাবে না। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বার্থের জন্মের পরের বছর জলপথে উত্তরদিকে যাত্রা করলেন। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি আবার গর্ভবতী হন। দ্বিতীয় কন্যার জন্ম দিলেন রেবেকা, নাম রাখা হল ফিবি রেবেকা সালফেট দত্ত, জন্ম হল ৯ই মার্চ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। আবার ১৮৫২-এ তিনি গর্ভবতী হন। প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হল রেবেকার, নাম দিলেন জর্জ জন ম্যাকাটাভিশ দত্ত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল তার নাম দেওয়া হল মাইকেল জেমস্‌ দত্ত। কিন্তু দুভাগ্যের বিষয়

মধুসূদন তখন কলকাতায় ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রিল জেমস্ মারা যান। মূলতঃ রেবেকা ছিলেন নাগপুরের কন্যা। বাবা ছিলেন হর্স আর্টিলারির ব্রিগেডের গানার- নাম রবার্ট টম্পসন এবং মায়ের নাম ছিল ক্যাথারিণ টম্পসন। বারো বছর বয়সে রেবেকা তার পিতাকে হারান, সেই থেকেই মাদ্রাজ ফিমেল অ্যাসাইলামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধর্ম পিতা হয়েছিলেন ডুগাল্ড ম্যাকাটাভিশ। রেবেকা খুব বেশী লেখাপড়া করেন নি তবে প্রথম প্রেমেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন মাইকেলের কাছে। রেবেকাকে এতই ভালোবাসতেন যে ক্যাপটিভ লেডীর উপক্রমনিকায় রেবেকাকে সম্বোধন করেই লিখেছিলেন।

প্রথম কন্যা সন্তান হওয়া মাত্রই কবি গৌরদাসকে পত্র লিখে জানালেন প্রিয় গৌর আমার কন্যা হয়েছে, মাকে জানাবে না বাবাকে জানাবে। কি অদ্ভুত সন্তান। যে মা পুত্রের জন্য পাগল পিতার অজান্তে মা-ই মধুকে অর্থ সাহায্য করতেন তার পুত্র এই আনন্দের সংবাদ মাকে দিতে বারণ করল গৌরদাসকে। চব্বিশ বছরের যুবক কবি মধুসূদন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় বিয়ে করলেন রেবেকা ম্যাকাটাভিসকে। জর্জ নরটন সাহেবের সহায়তায় তার আবাল্য স্বপ্ন আজ সার্থক হল, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হলেই তো হবে না, জীবনও সার্থক হতে হবে, এবার জীবনের আসল সংগ্রাম, চাই প্রচুর অর্থ। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। 'Madras Circular' কাগজে ধারাবাহিক লিখতে লাগলেন তিনি, এছাড়া 'Timothy PENPOEM, Eqr' ছদ্মনামে অনেক বেশি বেশি লিখতে লাগলেন। 'Captive Ladie' কাব্যটি কবি ১৮৪৮ সালের প্রথমার্ধেই হাত দিয়েছিলেন কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৯ সালের মার্চের শেষের দিকে যদিও কবির ভূমিকাতে ১৮৪৬ সালের উল্লেখ আছে, তিনি গ্রন্থ প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই বন্ধু গৌরদাসকে পত্র লিখেছেন, গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাসকে আবার একটি পত্র লিখলেন 'The Captive is nearly ready I am going it to George Nortton Esqr. The Advocate general of the presidency and a great encourger of literature. I wrote to him for his permission to dedicate the poem to him and sent the whole of the 1st part of the 2nd cantos for his perusal. You have no idea what a kind a flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work exhibiting such great powers and promise dedicated to him. I have great hopes from his patronge.

অথচ 'Captive Ladie' যখন ধারাবাহিক হিসাবে পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কবি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর একজন সহকর্মী জোসেফ রিচার্ড নেইলর সাহেবকে, নেইলর সাহেবকে উৎসর্গ করে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাও লিখলেন, ভূমিকাটি লেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেই সময়, কেন জোসেফ রিচার্ড নেইলর সাহেবকে উৎসর্গ করেছিলেন? সে সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেওয়া ভালো, মিঃ নেইলর ছিলেন রেবেকার শিক্ষক, আবার মধুসূদনের সহকর্মী, এছাড়া মধুসূদন উপকারীর উপকার স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। রেবেকার সঙ্গে কবির যখন বিবাহে বার বার বাঁধা আসছিল তখনই মিঃ নেইলর সাহেব বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, এমনকি মিঃ নেইলর বিয়েতে স্বাক্ষীও ছিলেন সেই কৃতজ্ঞতা

স্বরূপ কবি উৎসর্গ করেছিলেন মিঃ নেইলর সাহেবকে। দেখা যাক উৎসর্গ পত্রে তিনি কি লেখেন—

The Captive Ladie

(A fragment of an Indian Tale)

To

J. R. N. ----- r Esqr

mydear N -----r.

Permit me to dedicate The following poem to you. It was begun, and portion of it sketched, under circumastances which seldom invited The Cares of the morrow to interrupt a somewhat Enthusiastic devotion to the camoenae, but as the song says.

Now alas! Those day's of joy are past for haples me! all that I can at present do. is only to arrange the different Sketches in to Something like a readable from. The plot is a simple one. and will I trust, sufficiently develop itself in the course of narrative, appealing as all fragmentary Tales must do. to the imagination of reader to supply it omission.

I think it would be superfluous for me to dwell much on the pleasure which I feel in dedication to you this literary wreck of better and happier days.

Royapuram
25th Nov 1848

In conclusion,
I subscribe myself your
affectionate Friend
Timothy Penpoem

অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার কবি যখন কাব্যাকারে গ্রন্থটি মুদ্রণ করলেন তখন সহকর্মী নেইলর সাহেবকে উৎসর্গ না করে করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ নরটন সাহেবকে। কবি প্রয়োজন বোধে সব কিছু করতেন, মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল প্রথমে প্রয়োজনের তাগিদে রাজা দিগম্বর মিত্রকে পরে আবার করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। উৎসর্গ পত্রে কবি নরটন সাহেবকে বিনীত ভাবে এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন কারণ Blue Eyed girl তাঁর জীবনে এসেছে বলে এমন কি নববিবাহিত স্ত্রী রেবেকাকে খুশি করবার জন্য তার নামে একটি গীতিকবিতাও লিখলেন।

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine,–
Woo'd by melodious worship! well come. Then,
Tho'ours the home of want-I ne'er repine,
Art thou not there-e'en thou-a priceless-Gem and mine.

এই স্বর্চ মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য তাঁকে খুশী করার জন্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের

কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বিখ্যাত হবার জন্য কতই না পরিশ্রম করেছেন। আস্তে আস্তে তাঁর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জর্জ নরটন তাঁর কবিতা পড়ে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ, রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে নরটন সাহেব যথেষ্ট উৎসাহিত ছিলেন। মধুসূদন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিজের যশ ও খ্যাতি বাড়াবার জন্য এবং ইংরাজ সমাজের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হবার জন্য তিনি Madrass circular and general chronicle, Madrass spectator and athaeneum সংবাদ পত্রে লেখা আরম্ভ করলেন এবং তাঁর মূল্যবান লেখা পড়ে তদানীন্তন পণ্ডিতেরা মাদ্রাজে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। প্রাচীন বিষয়কে নিয়েই কবি বেশি চিন্তা ভাবনা করতেন, লেখার মাধ্যমে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেন।

পৃথ্বীরাজের চরিত্রকে নিয়ে তিনি একটি বিশেষ উপাখ্যান তৈরী করলেন, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সার্কুলার পত্রিকায় বের করলেন ভিশন অফ দি পাস্ট এর বহু কবিতা এবং ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল 'Captive Ladie' তাঁর এই কাব্য গ্রন্থ পড়ে তৎকালীন মাদ্রাজ্যের সাহিত্যানুরাগীগণ যথেষ্ট প্রশংসা করা আরম্ভ করলেন। কবি একটি উপক্রমিকা লিখলেন— The following tale in founded or a circumastance pretty generally know in India. And If I mistake not. Noticed by some European Writers.–A little before the famous Indian Expeditions mahommed of Ghizini, the king, of kanoje celebtated the 'Rajshooya jujnum' or as I have Translated it in the Text, the; Feast of victory' Almost all the contemporary princess, being unable to resist his power. Attended it with the exception of the king of Delhi. Who being a lineal discendant of the great pandu princes- the heroes of the far famed mahabharat of vyasa refused to sanction by his presence the assumption of dignity for the celebration of this Festival was a universal assertion of claims to being consider as the lord paramount over the whole country. which by right of descent belonged to his family alone the king of Kanoje higly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chief. On the last day of the Feast. the king of Delhi having with a few chosen followers, entered the place in disguise, carried of this image together, as some say, with one of the princesses royal whose hand he had once Solicited but in vain, owing to his obstinate mainteanance of the rights of his ancient house the fair princess, however was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who eventually effected her escape in the disguish of a Bhat of Indian Troubadour. The king of Kanoje never forgave this insult, and, when mohommed invaded the kingdom of Delhi, Sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after Crushed him also-I have slightly deviated from the

above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the Feast of victory.

'I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the following poem. It was originally composed ingreat haste for the colums of a local journal the madras Circular and general Chronicle' in the midst of Sence where is required a more than ordinary effort to abstract one's thought from the ugly realities of life want and poverty with the battalians of sorrow which they bring leave but little inspiration for their victim.

Royapoorum 1848

Captive ladie প্রকাশের পর শুধু Captive ladie কেন vision of the past এবং আরো বহু কবিতা ধারাবাহিক হিসাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকের দল রেরে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল. Timthy pen poem এর ছদ্ম নামে লিখলেন—Captive ladie কাব্যটির মধ্যে তিনি পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্র ও সংযুক্তার বিভিন্ন কাহিনীকেই রসদ করেছিলেন এই গ্রন্থের ভূমিকার এক বিশেষ স্থানে উল্লেখ করেছেন, " I have Slightly devited from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the feast of victory. মধুসূদনের নিন্দুকের যেমন অভাব ছিল না তেমনি প্রশংসা করার ও লোকের অভাব ছিল না। বাংলার সম্পাদকগণ তো কবির বিরুদ্ধে তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে রীতিমত বাজার গরম করে তুলেছিল তার মধ্যে বিশেষ ভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ছিল হরকরা সংবাদ পত্রের মালিক ও হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার মালিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিন্তু মাদ্রাজের সংবাদ পত্রগুলো কবিকে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিল। একজন পাঠক তো পত্র লিখলেন Madras circular এর সম্পাদকের কাছে— যদিও পত্র লেখক ছদ্মনামে পত্রখানি লিখেছিলেন মাদ্রাজ সার্কুলার সংবাদ পত্রের সম্পাদকের কাছে, সেই ছদ্ম নামটি ছিল ('An admirer') দেখা যাক পত্রখানিতে কি লিখলেন।

To
Timothy pen poem Esq
Sir,

Your appearance in the poet's corner of the Circulator ought to be welcomed by every reader of taste. The classical elegance of your composition, the admirable command which you evidently possess over the resources of English language, and your thorough knowledge of the mysteries of the "Divine Art" are well calculated to attention of no ordinary kind. When I read the first two portions of your "Vision", it struck me that your were none of the Benighted; you have since confirmed this by lines of exquisite pathos and melodies :-

The home of youth, 'tis far, oh! far away,
The hopes of youth, they've fled and taught to weep,

The friends of youth, e'en they, oh! Where are they?
Ask memory and the dreams which haunt the sleep,
Wing'd messengers and sweet from past! thy donjon.
keep!

প্রশংসা পান নি তা নয়, প্রশংসাও পেয়েছিলেন তবে Captive ladie লেখার সময় তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল, জীবন সংগ্রামে তিনি পর্য্যুদস্ত। কাব্য সৃজনে মনোসংযোগ করতে পারেন নি। তাই Captive ladie তে বিশেষ ত্রুটি আছে তা বার বার স্বীকার করেছেন কবি। কবির বিয়ের পর বছর দুই দাম্পত্য জীবন মোটামুটি সুখের ছিল, সংসারে দায়-দায়িত্ব যতই বাড়তে লাগল ততই মধুসূদনের মেজাজ খারাপ হতে লাগল।

মধুর অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এদিকে ছাপাখানাকে Captive ladie তাঁর মুদ্রণের টাকা পরিশোধ না করতে পারলে চূড়ান্ত অপমান। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাসকে একটি পত্র লেখেন It contains (Captive ladie) about twelve hundred lines of good bad and indifferent octo-syllable verse and (Truth pon my honour) was written in less that three weeks. এই সব চিন্তার মধ্যেও কবির সংসার বাড়তে লাগল।

চার সন্তানের জননী হলেন রেবেকা—দুই কন্যা ও দুই পুত্র। অর্থাভাব কোন দিন মধুসূদনের মেটেনি। মাদ্রাজের প্রায় সমস্ত কাগজে তিনি লিখে আয় করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন তবুও অভাবের শেষ নেই, তাই বলে শিক্ষা চর্চায় তিনি পিছিয়ে থাকেন নি। গৌরদাসও মধুসূদনকে লিখলেন তুমি বৃথা সময় নষ্ট না করে যদি মাতৃভাষায় আত্মনিয়োগ করতে তাহলে মাতৃভাষার যথেষ্ট উন্নতি হত, সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন বাবু গৌরদাস বসাককে লিখলেন—

My life is more busy than that of a school boy, Here is my routine 6-8 Hebrew, 8-12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not Preparing for great of object of Embellissing the tongue of my fathers. যেসব সংবাদপত্রে তিনি লিখতেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Madras circular, genearal chronicle, Madras spectator, Athaeneum.' রাত্র দিন লিখে এবং শিক্ষকতা করে যে অর্থ আয় করতেন তাতে ইংরাজ স্ত্রী ও চার পুত্র কন্যাকে ঠিক মতো চালাতে না পারায় স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ত কলহ দৈনন্দিন কার্যে পরিণত হল। কবি ইংরাজ কন্যাকে নিয়ে যে শান্তির নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন তা শান্তির বদলে অশান্তিতে পরিণত হল। ধনী নীলকর কন্যার বয়স তখন সম্ভবত ২১ মধুসূদনের ৩০ বছর, তারমধ্যে চার সন্তানের পিতা, মাদ্রাজ শহরে প্যানেথিয়ান রোডে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি হাইস্কুল বিভাগ ও একটি কলেজ বিভাগ খোলা হয়—জর্জ নরটন সাহেব মধুসূদনকে হাইস্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেন, ফলে মধুসূদন স্থায়ী ভাবে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আসীন হলেন, এই পদটি অত্যন্ত মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিল সে দিন, কিন্তু এতেও তিনি খুশী নন যদিও এটি সরকারী চাকরী। চাকরী করতে করতে তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি একটি পত্রে লিখলেন—

I am at present sub-editor of this Spectator. The only daily in this Town, তিনি যে সরকারী চাকরী করছেন তার উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু গোপনে অন্য মহিলার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, চারটি পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও। এইসব নানা চারিত্রিক ত্রুটির জন্য সরকারী চাকরী হারিয়ে ছিলেন মধুসূদন, নরটন সাহেবের চোখে ধুলো দেওয়া খুবই কঠিন। কবি রেবেকাকে বার বার বলেছেন—তুমি আমার জীবনের তাগিদ কি তা বোঝো না, স্কচ রেবেকা অত বোঝে না, অল্প বয়সে চারটি সন্তানের জননী তদুপরি অভাব অথচ মধুসূদন তার মনের অবস্থা একবার বুঝলেন না, উচ্ছৃঙ্খলতা তাকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে রেখেছে। অসংযত চিত্ত মধুসূদনের সুখের সম্ভাবনা কোথায়, গার্হস্থ্য জীবন যে কি, সে বিষয় মধুসূদনের কোনো জ্ঞান ছিল না, তাই জীবন কে নিয়ে তিনি ছেলে খেলা করেছেন—বৈবাহিক প্রেমে তিনি সুখ পান নি—আত্মবিলাপ কবিতাতে উল্লেখ করেছেন—

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে
পুড়িয়া মরিলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়।
না দেখিলি না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।

অথচ প্রথম প্রেমেই ক্যাপটিভ লেডীতে নিজের আবেগ উচ্ছ্বাস উল্লেখ করেছেন মনোনীত পত্নীকে।

Come list thee, gentle one-and whil'st the lyre.
Breathes softer melody for thee, mine own.
I'll weave the sunny dreams, those eye inspire,
In wreathes to consecrate-to thee alone,-
love's offering, gently one!-to Beauty's queenly Throne.

ভরা সংসার দুই পুত্র দুই কন্যা ও স্ত্রী রেবেকাকে গোপন করে আবার নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন মধুসূদন অথচ আশ্চর্য গোপনে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া (ফরাসী) যুবতীকে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে ১৮৫৫ সালে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রেমের কোনো নিয়ম নেই। সকলের অজান্তে মধুসূদন হৃদয়ের পূর্ণ সঙ্গিনী হিসাবে হেনরিয়েটাকে পেয়েছিলেন। অথচ হেনরিয়েটার পিতা অধ্যাপক মহাশয়েরও জানা ছিল সব ঘটনা, তদুপরি কন্যার জন্য (হেনরিয়েটা) তিনি বিশেষ চিন্তা করেন নি। তিনি ভেবে ছিলেন মধুসূদন অর্থবান মানুষ তার কন্যা খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে, তার থেকেও যেটি সবথেকে বড় বিষয় তা হল হেনরিয়েটার পিতা জর্জ জাইলস্ হোয়াইট যদিও তিনি মধুসূদনের সহকর্মী, হেনরিয়েটার মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার বিবাহ করলেন, তার মেয়ের থেকেও কম বয়সী একটি মেয়েকে। হেনরিয়েটা তার বাবার এই বিবাহটাকে মেনে নিতে পারেন নি। হেনরিয়েটার বয়স তখন চোদ্দ বছর। অথচ তার নতুন মা এমিলি শট্ এর বয়স

মাত্র তেরো বছর পিতার বয়স ৪৭। পিতার সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন হেনরিয়েটা এবং তার ভাই। তখনই মধুসূদনের স্নেহে ও ভালোবাসায় হেনরিয়েটা এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও হেনরিয়েটার বয়সের সঙ্গে মধুসূদনের বয়সের ফারাক অনেকটাই ছিল কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। একি পিতার প্রতি হেনরিয়েটার প্রতিশোধ? না সাগরের বুকে শিলা খন্ড আঁকড়ে ধরা। মধুসূদনের স্নেহ ও প্রেমে হেনরিয়েটা উৎসর্গীকৃত। হেনরিয়েটার পিতা না জানার ভানই করেছিলেন।

এই নক্কার জনক ঘটনা রেবেকার কর্ণাগোচর হওয়া মাত্রই এই সংবাদে রেবেকা অবিশ্বাস্য অবাক হয়েছিলেন। চার পুত্র কন্যার জননী রেবেকা অগাধ জলে পড়লেন। প্রেমের ব্যাপারে মধুসূদন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়, কিভাবে তিনি এই জঘন্যতম কর্মে লিপ্ত হতে পারলেন তা ভাবলে দেহে মনে শিহরণ জাগে। রেবেকার সঙ্গে তার প্রাণের আর সম্পর্ক নেই। এত বড় ঘটনা মধুসূদন ঘটাবেন রেবেকা ভাবতেও পারেন নি, স্বামী স্ত্রীর গন্ডগোল হতেই পারে তাই বলে পুত্র কন্যা স্ত্রীকে ত্যাগ করে নতুন ভাবে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, গৌরদাস বসাককে অত্যন্ত আনন্দে ২০ শে ডিসেম্বর ১৮৫০ সালে লিখেছিলেন—I have a fine English wife and foure children, একি মধুসূদনের এক রাজনৈতিক কৌশল?

মধুসূদন আইনানুমোদিত বিবাহ বিচ্ছেদ না করে বেরেবাকে পরিত্যাগ করে হেনরিয়েটাকে জীবন সঙ্গিনী করলেন। গৌরদাস যাতে বুঝতে না পারে তারই পূর্ব পরিকল্পনা মধুসূদনের, হেনরিয়েটা যদি ঘুনাক্ষরে জানতে পারতেন মাদ্রাজে তাঁর স্ত্রী ও চার সন্তান আছে তাহলে হেনরিয়েটা কখনই এই বিষম বিষ গ্রহণ করতেন না। নিখুঁত ভাবে গোপন করে মধুসূদন এই কাজ করে ছিলেন। হেনরিয়েটার পিতা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অথবা মাদ্রাজ্যে কৃত বিদ্যা ও যশস্বী কেউ ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেন নি এত বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে। মধুসূদন চেয়েছিলেন প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসা মর্যাদা রেবেকার কাছ থেকে, আর ছিল তার স্বাদেশিকতা কিন্তু তিনি তা পান নি। না পাওয়ার আকাঙ্খা মধুসূদনকে উন্মাদ করে তুলত, রেবেকা তার নিজের আত্ম অহমিকায় মত্ত আর মধুসূদন প্রেম ও মর্যাদার জন্য পাগল। ভিতরে ভিতরে এই দুয়ের দ্বন্দ্ব উভয়কে হিংস্র করে তুলেছিল। মধুসূদন বুঝতে পেরেছিলেন রেবেকার অভাব হবে না সে চারপুত্র কন্যাকে ঠিক করে মানুষ করে তুলতে পারবে। কারণ, রেবেকার পিতা ধনী, পিতামহ ও ধনী। অশান্তি যখন চরম পর্যায় পৌছাল মধুসূদন রেবেকাকে মনে মনে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন ১৮৫৫ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী।

ভাগ্য তাড়িত মধুর জীবন ছিল সংগ্রামী, কবির বিপদের দিনে রেবেকা মেকাটাভিস ছিলেন কবির একমাত্র বন্ধু। সে দিন রেবেকা না থাকলে মধুসূদনের মৃত্যু ছিল অনিবার্য। মাদ্রাজে উপস্থিত হবার পর কবির হয়েছিল বসন্ত—কি নিদারুণ দিন কেটেছিল সে দিন কবির। রেবেকার সেবায় কবি সে দিন বাঁচতে পেরেছিলেন। সেই পরম প্রিয় স্ত্রী পুত্র কন্যাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ভোলেন নি কবি দরিদ্র নীলচাষীদের অত্যাচারের কাহিনী—কবি মধুসূদন যে কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবেনা। উভয়ের তেজ ও অহমিকা উভয়কেই অন্ধকার পথে ঠেলে দিল।

প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ বাহিনী নীলচাষের ব্যাপারে কৃষকদের উপর কি ভয়ংকর অত্যাচার করত, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও দিত। সেই ইংরাজের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন কবি। দেশের জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করেছিলেন, বলতে গেলে নিজের জীবনকে বিনষ্ট করেছিলেন। সম্পর্ক ত্যাগের অন্যতম কারণ দেশের প্রতি মমত্ব বোধ। কে এই রেবেকা? কি তার পরিচয়? রেবেকার পিতামহ ছিলেন দোর্দন্ড প্রতাপ নীল ব্যবসায়ী এবং বুথন্ট কোম্পানীর এজেন্ট। এই সাহেবও নীল চাষীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার কোরত সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী। সাহেবরা অত্যাচার করছে চাষীদের উপর। বাধ্যতামূলক তাদের নীলচাষ করতেই হবে নচেৎ গুরুতর শাস্তি। মধুসূদন রেবেকাকে বার বার বুঝিয়েছেন তোমার বাবা ঠাকুরদাকে বোঝাও এত অত্যাচার ভালো নয়, এরা দরিদ্র চাষী এই সব দরিদ্র চাষীদের উপর যেন অত্যাচার না হয়। নীল চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচারে কবি ভীষণ কষ্ট পেতেন। রেবেকার মাধ্যমে যদি আইন করে নীল চাষ বন্ধ করা যায় তার জন্য কবি বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রেবেকা এ বিষয়ে নীরব ছিলেন, কবির এক জ্যাঠতুতো ভাই পিয়ারী মোহন দত্ত ছিলেন নীল বিদ্রোহের নেতা, একবার তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। এ সবই তিনি বার বার করে রেবেকাকে জানিয়েছিলেন। মধুসূদনের জাতীয়তা বোধ সম্পর্কে রেবেকার বাবা যথেষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। ঠাকুরদা ডুগাল্ড সাহেব বিয়ের ব্যাপারে খুব একটা মত দেন নি, জর্জ নরটন সাহেব থাকায় তিনি নীরব ছিলেন। তিনি বলতেন, নেটিভদের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ধারা কখনই মিলতে পারে না, দীর্ঘ সাতবছর রেবেকার সঙ্গে সংসার করার পরও দেখলেন এরা নীল চাষ চায় এবং নীল উৎপাদনের জন্য নীল চাষীদের উপর নিদারুন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তখন কবি দিশেহারা, এক দিকে দেশ অন্য দিকে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সামনে পুত্র কন্যা, তিনি বুঝেছিলেন এভাবে অত্যাচারীর সংশ্রবে থাকা যায় না—১৮৫৫ সালে অশান্তি তুঙ্গে উঠল—যে অশান্তি দুটি জীবনকে খন্ড বিখন্ড করে দিল। এবার হেনরিয়েটা হলেন তাঁর জীবনের ছায়া সঙ্গিনী। Madras Spectator সংবাদ পত্রের যখন তিনি Sub-Editor প্রায় তখনই তিনি হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করেন, মাদ্রাজ থেকে শেষ পত্র লিখলেন গৌরদাস বসাককে। কবির পিতার মৃত্যুর পর বাবু গৌরদাস বসাক রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একখানি পত্র লিখেছিলেন, তারই উত্তরে তিনি বাবু গৌরদাস বসাককে লেখেন—

My dearest Friend,

Madras, Speetator Press
20th Dec-1855

Your welcome, though unexpected, letter was put in to my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutelly startled me. I know that my poor mother was no more but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, What am I to do? You Talk of my property what has he left behind. Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal at least for a poor devil like myself but if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recov-

ery therof, of course, I am ready Weigh anchor, at once for a voyage to Calcutta.

Ah! those relatives of mine, Great God! but for you, my noble hearted frined, I would not have heard a word, about my father death for month. Perhaps, years, O Dearest Gour when and where did he die. I feel distracte give me all particulars If I can so manage. I shall leave this by the next steamer (27th) but I am very poor just now, my brother. I have not Thriven so Well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return post.

Of course I am aware that my late father had landed property in jessor. That I am sure of getting out of the Clutches of those biped Vultures what a stupid fellow. I am! All vultures are bipeds! well but you know what I mean. Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by Saying that your wife if is in heaven.

What a widower a second time?

I conclude in haste though not before assure you that I am most affectionately your won friend.

unchanged & unchangeable
M.S. Dutt

P.S. I am at present Sub. Editor of the Spectator. the only daily in this town.

মধুসূদনের মা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন অথচ কোলকাতায় আসার জন্য তাঁর স্টীমার খরচ নেই, তাঁর বাবা মার মৃত্যু সংবাদ কোন আত্মীয় তাঁকে দেয়নি—তারা নাকি সব এক এক জন শকুন, শকুনের দৃষ্টিতে রাজনারায়ণের সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে আছে, গৌরকে তিনি বলেছেন গৌর তুমি তো জানো আমার বাবর কত সম্পত্তি—সুন্দরবনের জমি, যশোহরের সম্পত্তি এবং কোলকাতার সম্পত্তি এ সব তো উদ্ধার করতে হবে, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে খুব বেশী লিখলে না, শকুনদের হাত থেকে যাতে সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারি তার জন্য তোমাকে সহযোগিতা করতে হবে। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেও মধুসূদন কি ভাবে লেখেন I have a fine English wife and four Children. অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই পত্র যখন গৌরদাসকে লেখেন তখন কিন্তু রেবেকার সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়েছে। হেনরিয়েটাকে যে কবি গ্রহণ করেছেন ঘৃণাক্ষরে তিনি গৌরদাসকে জানান নি। কি ভয়ঙ্কর প্রতিভা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন। জীবনে চাওয়ার তাঁর শেষ নাই, শেষ নেই বলেই তিনি দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। রেবেকার সঙ্গে কবির বিবাহ হয়েছিল ধর্মমত এবং নিয়ম মত কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ ধর্মমত বা নিয়ম মত হয়নি, আসলে অল্প বয়সের আবেগ সেই আবেগই হয়েছিল কাল। এ বিবাহ অকস্মাৎ Blue eyed maid, বিয়ে করতে পারলেই তিনি শেক্সপীয়র হয়ে যাবেন এবং ইংলন্ড যেতে পারবেন। অরফ্যান এসাইলাম

বালিকা বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিয়ের পর তিনি অবাক হয়ে গেলেন একি করলাম! এত চতুর এবং বুদ্ধিমান নিজের অসংযত কর্মকে সব সময় গোপন করেছেন, যতটুকু বলার ঠিক ততটুকু বন্ধু গৌরদাসকে বলেছেন, এক স্থানে তিনি অত্যন্ত সংযত হয়ে লিখলেন—

After a fearful gale ....

Mrs. D, is of English Parentage. Her Grand father was an indigo Planter of this presidency. I have great trouble in getting her. Her friends as you may imagine, were very much against the match. However, all is well, that ends well.

কি ভয়ঙ্কর মনোবল। কবির রেবেকার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমের ছেদ পড়া মাত্রই চার পুত্র কন্যা স্ত্রীকে পরিত্যাগ এ কি কোন মানুষের পক্ষেও সম্ভব, কবি নির্বিচারে ত্যাগ করলেন এবং এক মাসের মধ্যেই আবার মাদ্রাজের বিখ্যাত মানুষের কন্যা হেনরিয়েটাকে প্রেম সঙ্গিনী করে ফেললেন, যে Blud Eyed maid পাবার জন্য তিনি ধর্ম ত্যাগ করলেন আবার পরিত্যাগ করতেও তাঁর সময় লাগল না। রেবেকাকে এবং তাঁর চার পুত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করে হেনরিয়েটার সঙ্গে সুখে ঘর বাঁধবেন এ হতে পারে না, মধুসূদন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন মাদ্রাজে থাকার তাঁর আর কোন অনুকূল অবস্থা নেই, যে কোন সময় তাঁকে বিপদাপন্ন হতে হবে। কারণ ইংরাজ জর্জ নরটন অথবা কবির শ্বশুর মিঃ ডুগাল্ড সাহেব মধুসূদনকে ছেড়ে দেবে না। উপযুক্ত সময় গৌরদাস রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্র পড়া মাত্রই তিনি ছদ্মবেশে নরটন সাহেবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্টীমারের টিকিট কিনলেন, এখন তিনি মাইকেল এম্. এস্. ডাট নন্ এখন তিনি মিঃ হোল্ট। মিঃ হোল্টের ছদ্ম নামে মাদ্রাজ থেকে এক প্রকার পালিয়ে এলেন। এদিকে হেনরিয়েটা এসব কিছুই জানে না, নিঃষ্পাপ মহিলা মধুসূদনের কথা মত পড়ে রইলেন মাদ্রাজে, হেনরিয়েটাও কাউকে না জানিয়ে স্টীমার চড়লেন কোলকাতার উদ্দেশ্যে. বেশ কিছুদিন বাদে গোপনে একা একা পাড়ি দিলেন স্বামীর উদ্দেশ্যে।

গৌরদাসকে বহু পত্র লিখেছেন মাদ্রাজ থেকে কিন্তু একবার ও কোথাও হেনরিয়েটার কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বার বার বলেছেন I have a fine English wife and four Children. অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর বৈবাহিক জীবনের কোন ঘটনা কোথাও উল্লেখ করেন নি, আঘাত সংঘাত মনোমালিন্য অপছন্দ কোন বিষয় তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন নি, অত্যন্ত সংযত ও বুদ্ধিমানের মত সব ঘটনা নীরবে মেনে নিয়েছেন। কবি কোথাও বলেছেন এ বিবাহে ঠিক আমি সন্তুষ্ট নই, কারণ রেবেকা বেশী শিক্ষিতা নয়, অথচ অন্য স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেবেকার পিতামহ ডুগল্ড ম্যাকটাভিস এবং তার পিতা এই অজ্ঞাত অপরিচিত বিত্তহীন নেটিভের হাতে রেবেকাকে তুলে দিতে রাজি ছিলেন না। শুধু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জর্জ নরটন সাহেবের মধ্যস্থতায় মধুসূদনের বিশেষ আগ্রহে ও উৎসাহে এ বিয়ে হয়েছিল। মধুসূদনের হাতে ডুগাল্ড সাহেব তুলে দিতে নারাজ ছিলেন, এদিকে রেবেকা আবার মধুসূদনের ছাত্রী, ভাব বিনিময় প্রেম বিনিময় গোপনে উভয়ের মধ্যে চলেছিল দীর্ঘ দিন

ধরে, প্রেমের বশবর্তী হয়ে রেবেকা এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিল। তা ছাড়া রেবেকার ধর্ম পিতা ছিলেন জর্জ নরটন। যদিও বিয়ের পর একটি বছর তাঁদের দাম্পত্য প্রেম বেশ সুখের ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই Captive Ladie প্রস্তাবনাতে তাঁর প্রিয়া রেবেকার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগ ভালবাসা এবং প্রেমকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন, অথচ ক্যাপটিভলেডী প্রকাশের পর থেকেই কবি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

Captive Ladie প্রকাশের পর কবি যে অর্থাগমনের আশা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল, টাকা যেমন তিনি ধুলিমুষ্টির ন্যায় ব্যয় করতেন তেমনি অভাব পড়লেই চাইতেন, বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাসই একমাত্র মধুসূদনকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মায়ের মৃত্যুসংবাদ গৌরদাস বসাক দিলেন কবিকে, অথচ উত্তরে লিখলেন নিজের দুঃখ কষ্টের কথা অর্থের কথা, সব সময় যেন তিনি ভিক্ষারীর মত জীবন যাপন করেছেন, শুধুই অর্থ! এত উদার এত মহৎ মানুষেরা শুধুই দুঃখ পান—যখন যা ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু গৌরদাস বসাক কে লিখেছেন, শুধু দ্বিতীয় বার প্রেম সংক্রান্ত বিষয় কিছুই জানান নি। গৌরকে লিখলেন—"You will be glad to hear that my wife has just given me a littlc daughter. So I am a father, As soon as you get this letter write to fathcr to say that I have got a daughter অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার কবি গৌরদাসকে নিষেধ করলেন এ সংবাদ যেন মাকে না দেওয়া হয়, শুধু বাবাকে এ সংবাদ দেবে, এ সংবাদ যখন অন্য মানুষের মুখে জাহ্নবী দেবী শুনবেন তখন কি নিদারুণ শেল হানবে তাঁর মায়ের বুকে একবারও কি ভেবে দেখেছিলেন কবি! প্রতিভার বোধ হয় এমনই নিয়ম। এমন কি মায়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ গোপনে মাদ্রাজ থেকে কোলকাতার এলেন আবার গোপনে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ চলে গেলেন, শুধু বাবার সঙ্গে দেখা করে অন্য কারো সাথে দেখাও করেন নি।

সালটি ছিল ১৮৫১, মাদ্রাজে তখন ভরা সংসার, একদিকে শিক্ষকতা অপর দিকে মাদ্রাজের সমস্ত কাগজে লিখে অর্থ আয়, তাতে ও নাকি তাঁর অভাবের শেষ নেই, তিনি মনস্থির করলেন এবার সংবাদ পত্র প্রকাশ করবেন।

তাঁর জানা ছিল না সংবাদ পত্র প্রকাশের অর্থ শুধু লেখনী নয় তার জন্য চাই সাংগঠনিক বুদ্ধি, কাগজের নাম দিলেন Hindu Chronicle (হিন্দু ক্রনিকল) এই সংবাদ পত্র প্রকাশ করে নাম করেছিলেন খুব কিন্তু বাণিজ্যিক সুফল হয়নি। দেনার দায়ে ডুবে রইলেন। বাধ্য হয়ে বাবার কাছে এসে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে আবার মাদ্রাজ চলে গেলেন। বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না। মধুসূদনের এই আচরণের জন্য গৌরদাস দুঃখ করে মাদ্রজে পত্র লিখলেন।

I understand from Rev Jaddunath that Some time ago you paid a flying visit to Calcutta, and after having finished your business returned to your favourite Town, I was extremely sorry to hear so, for I had every reason to expect that you would give me an opportunity to see you; and your having neglected to do so, Savoured something that I did not like much, for it exhibited total want of feeling Towards me. I spoke to Soroop

about it and he confirmed the report, tho' he did not much approve of your conduct.

একটু চোখের দেখাও তো গৌরদাসকে দেখে যেতে পারতেন, সেই সামান্য সৌজন্য বোধটুকুও তার ছিল না, কিন্তু গৌরদাস প্রতি মুহূর্তে মধুসূদনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যখন হিন্দু ক্রনিকল প্রকাশিত হচ্ছে, পত্রিকা কোলকাতায় আসছে। গৌর হিন্দু ক্রনিকল সম্পর্কে শুনছেন নানা কথা গৌরকে এক কপি পাঠাবার সময় পাচ্ছেন না কবি। কোলকাতায় যখন হিন্দু ক্রনিকল বিশেষ প্রশংসা পাচ্ছে তখন গৌরদাস বসাকের কি আনন্দ সব অভিমান দুঃখ ভুলে আবার লিখলেন—

My attention was drawn by the "Hurkaru" to an extract made from a paper Named Hindu Clronicle which, it is said, is edited by you, I was delighted to see that you have taken your self to the resources of the "Father Estate" by a very fair way to make yourself rich and respceted, I hope you are doing well, and tho' I have not the good fortune to see your paper, I eagerly take up any periodical here that makes mention or extracts of your Journal. It was only last Friday that I read in the HurKaru, with profound interest and admiration of your extract in the leader on the Dacoits of Bengal.

কি অদ্ভূত ব্যাপার কবি গৌরদাসকে পত্রিকা পাঠালেন কিন্তু তাঁর কোন পত্রের উত্তর দিলেন না। অদ্ভূত খেয়ালী মানুষ মধুসূদন। আসলে যখন যে কাজটি করতেন, সেই কাজে গভীর মনোসংযোগ দিতেন, ক্যাপ্‌টিভ লেডী প্রকাশের পর যে বাণিজ্যিক লাভ হবে আশা করেছিলেন তা হল না বরঞ্চ ক্ষতি স্বীকার করতে হল, দেনা হল অনেক টাকা, ক্ষতি পূরণের জন্য এবার তিনি সংবাদ পত্রের ব্যবসা করতে এলেন যদিও এতে দুটো দিক আছে এক—শক্তিশালী লেখার মাধ্যমে নিজেকে আরো বেশী প্রচার মাধ্যমে আনা এবং নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখা লেখার মাধ্যমে। দুই-ক্ষতিপূরণের টাকা পত্রিকার মাধ্যমে তোলা এবং প্রচুর অর্থ সমাগম করা। শিক্ষকতা ও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে যা উপার্জন করতেন তা ইউরোপীয় আদপ কায়দায় চলতে পারে না, তার জন্য চাই আরো অর্থ, এই অর্থ ভদ্র ভাবে জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয় কিন্তু হায়! সংবাদ পত্র প্রকাশ করে কোন বাণিজ্যিক সফলতা এল না উপরন্তু দেনার দায়ে জর্জরিত হলেন। সংবাদ পত্রের প্রকাশ বন্ধ হল। ১৮৫২ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধ থেকে মধুসূদন নীরব, বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাস এবং অন্যান্য বন্ধুরা পরপর বেশ কয়েক মাস ধরে বহু পত্র দিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য মধুসূদন কারো কোন পত্রের উত্তর দেন নি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী ও আত্মশক্তিতে ভরপুর মধুসূদন সে সময় ব্যর্থতার মহাসাগরে ডুবে গেছেন, অর্থনৈতিক অবস্থা, দেনা তদুপরি সাংসারিক অশান্তি সব মিলিয়ে মধুসূদন যখন কোন উত্তর দিচ্ছেন না তখন গৌরদাস ভেবে নিয়েছেন নিশ্চয়ই মধুসূদন ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। তাই বাধ্য হয়ে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন আপনি তো মাদ্রাজ যাচ্ছেন তাহলে এই পত্রখানি মধুসূদনকে দিয়ে দেবেন। রেভারেন্ড বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে মধুসূদনকে

খুঁজে বার করা কোন কঠিন ব্যাপার নয় কারণ, রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজের খ্রীষ্টান সমাজকে যথেষ্ট চেনেন।

জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুর তিন বছর পর পিতা রাজনারায়ণ পরলোক গমন করেন, মধুসূদন পিতা মাতা কারো মৃত্যুতে উপস্থিত হতে পারেন নি। এদিকে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর বসতবাটী অধিকার করে নিয়েছে, সুতরাং এই মুহূর্তে মধুসূদনের কোলকাতায় আসা জরুরী। রেভারেন্ড বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে একটি পত্র গৌরদাস বসাক মধুসূদনের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি লিখলেন,

My dear Modoo,

It is after the lapse of several years, that I write you this letter. I consider it is a very serious and culpable dereliction both on your and my part to have allowed such a long, may long long, silence to pass between us. God alone knows how often I thought of you. If my thoughts were only buried in silence, and found no vent, It was because I knew not where to address you and heard not the slightest tidings of your health and welfare.

I am at this moment writtings as you will preceive from the date of my letter from a place in which you passed your infancy and boyhood. May I should say, the best part of your youth.

I regret I have little good news to give you of your father, of your father's family. You must have heard ever long that both your parents are dead and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. To widows survive of your father, but they are very near being deprived of their let husbands effects by your greedy and selfish relations. If you come in time you will yet save it from ruinous littigation and receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappotintment of illegal climants. Will you come?

Calcutta, Kidderpore — Ever Your's
1st Decmber 1855 — Gourdas Basack

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যার পিতা এত নামী আইনজ্ঞ, যার খ্যাতি চারিদিকে এহেন মানুষ এমন ভুল কি করে করলেন, নিশ্চয়ই ক্ষোভে, দুঃখে নচেৎ এমন ভুল হবার তো কথা নয়, তাঁর বিশাল সম্পত্তি কারো নামে উইল করে যান নি, আবার ভয়ঙ্কর তেজী অহংকার পুত্রকে বঞ্চিত করতে পারছেন না তবে তিনি এক স্থানে লিখেছিলেন আমার অনুপস্থিতিতে এ সম্পত্তি যার সে এসে নিয়ে যাবে। মধুসূদনের অনুপস্থিতিতে রাজনারায়ণের বৈধ দুই স্ত্রী প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল রাজনারায়নের আত্মীয় স্বজনেরা। তারা ভেবেই নিল, মধুসূদন প্রবাসে মৃত্যু বরণ করেছে। তারা সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারী মামলা মোকদ্দমা করতে লাগল।

মধু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর রাজনারায়ণ পর পর বিয়ে করতে লাগলেন পুত্র লাভের জন্য, মধুর উপর আর যখন কোন আশা করা যায় না তখন তো পুত্র লাভের দরকার—

জাহ্নবী দেবী কি মনোঃকষ্ট পেতেন না রাজনারায়ণের পরপর বিবাহের ব্যাপারে? এদিকে পুত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে প্রবাসে-তার গভীর শোক। আবার স্বামীর পর পর বিবাহের ধুম, সব দিক থেকে জাহ্নবী দেবী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন। পুত্রলাভের আশায় জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে আলোচনা করে বিবাহ্ করলেন শিবসুন্দরী নামে এক মহিলাকে, শিবসুন্দরী ছিলেন সাগরদাঁড়ি গ্রামের কাছে সাতবেড়ে গ্রামের কন্যা। কিছু দিনের মধ্যে শিবসুন্দরী মারা গেলেন। তারপর আবার বিবাহ্ করলেন বাকসি পরতালার বারাসাত গ্রামের মেয়ে প্রসন্নময়ীকে, প্রসন্নময়ী খিদিরপুরে জাহ্নবী দেবীর সাথেই থাকতেন। প্রসন্নময়ীও সন্তান ধারনে অক্ষম হলেন, পুত্রলাভের মোহে রাজনারায়ণ আবার বিবাহ্ করলেন যশোহর জেলার শক্রজিৎপুরের হরকামিণী নামে এক কন্যাকে, এত সব কান্ড জাহ্নবী দেবীর সামনেই হচ্ছে, কোন্ স্ত্রী এই বিবাহকে মনেপ্রাণে সহ্য করতে পারবেন? মুখে কিছু বলতেন না তবে মনের ভিতর ছিল ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও বেদনা।

জাহ্নবী ছিলেন মহীয়সী নারী, কোন কথা বলতেন না, মরমে মরমে জ্বলতেন তখন মধুসূদন মাদ্রাজে। মৃত্যু ছাড়া জাহ্নবী দেবীর সামনে আর কিছু নাই।

যাই হোক যখন বন্ধু গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে সমস্ত বিষয় অবগত করালেন তখন মধুসূদনের আর এক মিনিট দেরী করা উচিৎ নয় ভেবে মাদ্রাজের সব সম্পর্ক ত্যাগ করে, আট বছরের কিছু বেশী সময়ের মায়া কাটিয়ে চিরতরের জন্য মাদ্রাজকে ত্যাগ করে দিলেন।

বিশপ্স কলেজ থেকে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন যেমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত ধরে ছদ্মবেশে (মিঃ হোল্ট এই ছদ্ম নামে) পালিয়ে এলেন কোলকাতায় ১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী। মাদ্রাজ প্রবাসে এত যশ খ্যাতি সম্মান পাওয়া সত্তেও মধুসূদনকে পালিয়ে আসতে হল মাদ্রাজ থেকে। নচেৎ ডুগাল্ড সাহেবের হাতে কবিকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। এমন কি যাবৎজীবন কারাদন্ডও ভোগ করতে হত। কারণ, ইংরাজ সরকার অত সহজে মধুসূদনকে ছাড়ত না। ইংরাজের চোখে ফাঁকি দিয়ে পুরোপুরি ছদ্মবেশে পালিয়ে এলেন কোলকাতায়।

কি ভীষণ নির্মম হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন পুত্র কন্যা স্ত্রী রেবেকাকে চিরকালের মত বিসর্জন দিয়ে এমনকি কোন দিন তাদের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি, রেবেকাকে পরিত্যাগের পর ফরাসী প্রেমিকা হেনরিয়েটাকে প্রণয়িণী করে জীবনের সাথী করলেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করার সময় হেনরিয়েটাকেও সঙ্গে আনলেন না। কবি এলেন একা জানুয়ারীর শেষ ভাগে সম্ভবতঃ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বেন্টিক নামক জাহাজে একা একা কোলকাতায় পৌছলেন। মনে মনে মাদ্রাজ শহর এবং চার পুত্র ও স্ত্রী রেবেকাকে Good by করে চিরকালের জন্য চলে এলেন। ফরাসী প্রণয়িণী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে শুধু বলেছিলেন—কোলকাতায় আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখব, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। দেশে ফিরে প্রথম কাজ আমার বিষয় সম্পত্তি উদ্ধার করা। তুমি কোন চিন্তা করবে না, আমি তোমারই।

কবি হেনরিয়েটাকে প্রেমের বাণী দিয়ে সব বুঝিয়ে একা একা কোলকাতায় চলে এলেন। হেনরিয়েটা ফরাসী কন্যা, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান ছিল তাঁর তীব্র। কারণ, কবি হেনরিয়েটার

সঙ্গে স্ত্রীর ব্যবহার করেছেন, তাই তো পৃথিবীর যেখানেই থাক মধুসূদনকে খুঁজে বার করতেই হবে। বেশ কয়েক মাস বাদে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে হেনরিয়েটা স্টীমার চড়ে চলে এলেন একাই কোলকাতায়, মধুসূদন সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণও করলেন।

কি নিষ্ঠুর নির্মম উচ্চাভিলাসী মহাকবি। যার এক দিকে পবিত্র শবনম যার প্রেম প্রবাহে সকলে মোহিত, অন্য দিকে উচ্চাভিলাষ, ও কামনার আগুন কবিকে তিলে তিলে মাদ্রাজ প্রবাসে দগ্ধ করেছিল, ভয়ে, লজ্জায় ছদ্ম বেশে তাঁকে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ ত্যাগ করতে হল। নচেৎ ইংরাজ ডুগাল্ড সাহেব হয়ত কবির জীবন ধ্বংস করে দিত। সেই সব রোমহর্ষক স্মৃতি মনে থাকার জন্য কবি কোন দিন তাঁর প্রথমা স্ত্রী রেবেকা মেকাটাভিশ ও চার পুত্র কন্যার নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি। প্রাণে বাঁচার জন্য তিনি এ বিষয়ে আমৃত্যু নীরব ছিলেন। তাঁরা রইলেন মাদ্রাজে, চার পুত্র কন্যার মধ্যে একজন প্রায় আশি বছর বেঁচেছিলেন, মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবি ছিলেন। দত্ত উপাধী পরিবর্তন করে ডটন করেছিলেন। রেবেকা কবির মৃত্যুর পর বহু বছর বেঁচেছিলেন, রেবেকা ভাবতেন মাইকেল হয়ত ফিরে আসবে,—রেবেকা সেই আশায়, দশ বছর বেঁচেছিলেন, হায় অভাগিনী রেবেকা। তোমার মত সাধ্বী নারী ভারতের গৌরব, তুমি পঞ্চসতীর পর আর এক সতী হলে ভারতের ইতিহাসে। তোমার ত্যাগ মহত্ব মানুষ কোন দিন ভুলবে না। তুমি তো নিঃষ্পাপ মহিয়সী।

এই মহিয়সী রেবেকা মেকাটাভিশ সম্পর্কে দু এক কথা জানা দরকার। কবির প্রথমা স্ত্রীর নাম—রেবেকা ম্যাকাটাভিশ ইংরাজ কন্যা—পিতা—রবার্ট টম্পসন, (ইন্ডো-ব্রিটেন) তিনি ছিলেন হস্ অ্যাপিলারির ব্রিগেডের গানার, যদিও সামান্য কিছু দিনের জন্য তিনি ডুগাল্ড ম্যাকাটাভিশের তত্ত্বাবধানে নীলকর সাহেবও হয়েছিলেন, এবং মাতা—ক্যাথারিন টম্পসন, ইংরাজ কন্যা হলেও তার জন্ম ইংলন্ডে হয়নি, তিনি জন্মেছিলেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে। মাত্র বারো বছর বয়সে পিতাকে হারান এবং পরে মাদ্রাজ ...আরফ্যান অ্যাসাইলামে ভর্তি হন। তাঁর ধর্মপিতা ডুগাল্ড ম্যাকাটাভিশ, সেই ধর্ম পিতার ম্যাকাটাভিশ পদবী রেবেকার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হলেন রেবেকা টম্পসন ম্যাকাটাভিশ। আসলে রেবেকার বাবা নামমাত্র নীলকর সাহেব ছিলে, নীলকর সাহেব ছিলেন ধর্ম পিতা ডুগান্ড ম্যাকটাভিশ। ইনিই তাঁর প্রকৃত অভিভাবক।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই মধুসূদন রেবেকাকে বিবাহ করেন, বিবাহের সাক্ষী ছিলেন মিঃ এস এইচ নেইলর। চার্চের রেজিষ্টারে কবির বাবার নাম লেখা হয়েছিল Narain Dutt Advocate, Supreme Court, Calcutta. তখন কবির বয়স চব্বিশ বছর ছ মাস ছ'দিন এবং রেবেকার বয়স তখন মাত্র সতের, রেবেকার গর্ভে ১৮ই আগষ্ট ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাম রাখা হয়েছিল বার্থা বেঞ্চ কেনেট দত্ত। কেনেট দত্তের ব্যাপটিজমের সময় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ও স্বনামধন্য ব্যক্তি মিঃ চার্লস কেনেট এবং জে আর নেইলর।

দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হল ৯ই মার্চ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নাম ফিবি রেবেকা সালফেট দত্ত। সালফেটের ব্যাপটিজমের সময় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মানুষ মিঃ এ ডব্লু সালফেট।

এবার রেবেকার গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেন নাম—জর্জ জন ম্যাকটাভিশ দত্ত। জন্মেছিলেন ২৬শে জুলাই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর ৯ই মার্চ জন্ম হল রেবেকার গর্ভে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, নাম রাখা হল মাইকেল জেমস দত্ত। দুঃখের বিষয় জেমস দত্ত মারা গেলেন মাত্র দু বছর সাত মাস বয়সে। জেমস দত্তের মৃত্যুর সময় কবি এসেছিলেন পিতার কাছে কোলকাতাতে অর্থ সংগ্রহের জন্য, মাদ্রাজ পৌঁছেই তিনি শুনলেন পুত্র মারা গেছে, দুঃখের প্রকাশ ছিল না কিন্তু অন্তরে কেঁদে ছিলেন।

রেবেকা যে কত বড় মহিয়সী মহিলা তাঁর প্রমাণ তাঁর জীবন। তাঁকে মহাকাব্যের প্রথম নায়িকা বললেও বোধ হয় ছোট করা হবে।

একদিকে ত্যাগ, মহত্ত্ব, কর্তব্য, স্বামীর প্রতি আনুগত্য কঠোর পরিশ্রম সন্তান প্রতি পালন, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সব শেষ। পর পর তিনি শুধু সন্তান প্রসব করলেন। কি পেলেন কবির কাছ থেকে, মধুসূদন যদি মহাকাব্যের নায়ক হন রেবেকা মহাকাব্যের নায়িকা। যখন একটি মেয়ের জীবন শুরু হয় তখন রেবেকার জীবনের সব শেষ। মাত্রই তেইশ বছর কয়েক মাসের মধ্যে রেবেকা যেন মাহসাগর সাঁতরে সবে তীরে উঠলেন। কবি একবার ও বুঝলেন না তার চার চারটি সন্তান ঘরে অসুস্থ স্ত্রী তাদের ভবিষ্যত কি হবে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেবেকা জানতে পারেন নি, যে তাঁর স্বামী চার সন্তানের পিতা হয়েও কেন হেনরিয়েটা নাম্নি এক মহিলার প্রেমে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। সতী সাবিত্রী নারী রেবেকাকে কবি যে ভাবে পীড়া ও যন্ত্রণা দিয়েছেন তা বোধ করি কোন শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কবি কি ভাবে তার নিজের চার চার পুত্র ও অসুস্থ স্ত্রীকে ভুলে নতুন প্রেম নতুন জীবনের কথা ভাবলেন তার উত্তর বোধ হয় কবি ও দিতে পারবেন না। তবে কবির সঙ্গে রেবেকার কোন বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নি। কবির মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে রেবেকা অনন্তলোক যাত্রা করেন। তবে তার প্রথম পুত্র ঘৃণায় লজ্জায় পিতার উপাধী বর্জন করে লিখতেন দত্তের পরিবর্তে জর্জ জন ম্যাকটাভিশ ডটন, ম্যাকাটাভিশ ডটন মাদ্রাজ কোর্টের আইনজ্ঞ ছিলেন, প্রায় তিনি ৮০ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং রেবেকাকে সারা জীবন পুত্র ম্যাকাটাভিশ সঙ্গে রেখেছিলেন। এবার হেনরিয়েটা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু জানা দরকার, হেনরিয়েটা কবির জীবনে কিভাবে এলেন?

কবি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তারই এক সহকর্মী নাম জর্জ জাইলস হোয়াইট। মিঃ হোয়াইট বিয়ে করেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালাইজা গ্রের কে, মিসেস গ্রের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁর প্রথম কন্যা সন্তান নাম অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফিয়া হোয়াইট। হেনরিয়েটার বয়স যখন চৌদ্দ অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তার মাতা অ্যালাইজা হোয়াইট এর মৃত্যু হয়। ছোট ভাইকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়লেন। হেনরিয়েটার মা মারা যাবার মাত্র দু বছর 'ন' মাস পরেই পিতা আবার বিবাহ করলেন, পিতার স্নেহ মমতা ভালবাসা থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হতে লাগল। তাঁর পিতার সংসারে যেন তাঁরা অবাঞ্ছিত, হেনরিয়েটা বুঝতেই পারছিলেন না, কি করবেন, জীবনের মধ্যে অসহ্য বেদনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না [illegible]।

মিঃ হোয়াইট বিয়ে করলেন সাতচল্লিশ বছর বয়েসে মাত্র তের বছরের এক কন্যাকে নতুন স্ত্রী নাম এমিলি শট, এসব দৃশ্য কোনো সন্তানের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, পিতার এই ঘৃণ্য আচরণে হেনরিয়েটা প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ ও লজ্জিত, তাই বোধ হয় তাঁর জীবনের ঘটনা নতুন ভাবে মোড় নিল ।

এমিলি শট আবার হেনরিয়েটার থেকেও ছোট, পিতার বিবাহকে হেনরিয়েটা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। হেনরিয়েটা তখন ভীষণ অসহায় বোধ করছিলেন ভালবাসা স্নেহ দেবার মত মানুষ আর পৃথিবীতে তার কেউ রইল না।

ঠিক সেই সময় কবি হেনরিয়েটার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর ব্যাথায় ব্যথিত হলেন কবির স্নেহে হেনরিয়েটা যেন বাঁচার পথ পেল। নতুন আলো দেখল।

কবির জীবনের ইতিহাস লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংক্ষেপে দু এক কথা লিখে শেষ কোরব এই পর্ব, মাদ্রাজে কথা হয়ে ছিল কবির সঙ্গে হেনরিয়েটার, হেনরিয়েটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি সঙ্গে করে আমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবে। মধুসূদন জবাবে বলেছিলেন যথা সময়ে তুমি আসবে কোলকাতায় অথচ আশ্চর্য সেই অপরিচিত বিদেশিনী হেনরিয়েটা একা চলে এলেন কোলকাতায়।

কবি তখন কোলকাতায় চলে এসেছেন এবং ১৫০ টাকার বেতনে পুলিশ কোর্টের অনুবাদকের কাজ করছেন। কবি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুললেন। বিয়ে না করে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম কন্যা শর্মিষ্ঠার জন্ম হল। ব্যপ্টাজিম-এর সময় লেখা হল পিতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতা অ্যামিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া তারপর ২৩শে জুলাই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুত্র ফ্রেডারিক মাইকেল মিলটন দত্তের জন্ম হয়।

ফান্সে কবির এক কন্যার জন্ম হয়—তবে জন্মানো মাত্রই মারা যায়, কন্যাটি জন্মেছিল ৩রা আগষ্ট ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বুধবার সকাল 'ছ' টায়।

কবির চতুর্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল সকাল চারটায়, নাম রাখা হল—অ্যালবার্ট জর্জ নেপোলিয়ান।

মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ে এক জীবনে শেষ করা যায় না, তিনি তো মহাকাব্যের নায়ক, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত বিস্ময়কর শুধু জিজ্ঞাসা? তিনি ছয়টি ইউরোপীয় ভাষা কয়েকটি এশিয় ভাষা এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারতেন। তাই তো ভার্সাই থেকে কবি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছেন 'আমি আর উদাসীন প্রকৃতির ভাবপ্রবন ও অসাবধানী মানুষ নই হে' হয়ত গৌরদাস কবির এই পত্র পড়ে মনে মনে হেসেছিলেন।

কবি মুখে যা বলেছেন সাংসারিক জীবনে তা সামান্যতম পালন করেন নি। যদি তিনি সংসারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে হয়ত তিনি মহাকবি মধুসূদন হতে পারতেন না। পণ্ডিতেরা যতই বলুন তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না কারণ মহাকাব্যের যে রূপ, ঘটনা, ঘটনাবস্তু জটিলতা বিস্তৃত আবেগ প্রেম যুদ্ধ লোকক্ষয় ধর্ম রক্ষা, ভ্রাতৃত্ব বেইমানী তা পরিপূর্ণ ভাবে নাই, কবি কল্পনার আকাশে উড়ে উড়ে পাখী ধরে খাচায় বদ্ধ করেছেন।

পন্ডিতেরা যাই বলুন মেঘনাদবধ কাব্যই হোক আর মহাকাব্যই হোক তাই নিয়ে হাজার পৃষ্ঠা কালি কলম খরচ হোক, পন্ডিতেরা নাকে নস্যি দিয়ে রাতের পর রাত জেগে পর্যালোচনা করুন কিম্বা মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রাদ্ধ করুন তাতে কবি শ্রী মধুসূদনের কিছু যায় আসে না। তিনি তো বার বার বলেছেন যা দিয়েছি তাই নিয়েই বাংলা সাহিত্যকে সুখি হতে হবে।

তবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি রামায়ণ, মহাভারতের পর যদি কোন মহাকাব্য থাকে তা মেঘনাদ বধ, আজ বাল্মিকী মুনি বেঁচে থাকলে হয়ত বলতেন, আমি যা কল্পনাও করতে পারিনি তুমি তাই করেছ, আমি যদি ঘুনাক্ষরে জানতাম তুমি আসবে তাহলে আমি এই রামায়ণ লিখতাম না। গ্রন্থের ত্রুটির বিচার করা নিস্ফল, যেভাবে ছন্দকে তিনি সাজিয়েছেন, ছন্দের যতি মাত্রা গতি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন যেভাবে অসাধ্যকে তিনি সাধন করেছেন যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তা ভাবলে দেহে কম্পন ওঠে, তাঁর চরিত্র পরিপূর্ণ রাবণের। এই চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায় এই চরিত্র উপভোগ করা যায়।

এই চরিত্র দুর্দ্দমনীয় উল্লাস কষ্ট বেদনা, উৎসাহ আমিত্ব মমতা স্নেহ, নিষ্ঠুরতা মহাকুতুহল আবেগ, নির্মম নিষ্ঠুরতা সব কিছুই সংগ্রহ করা যায় এই চরিত্র থেকে সে কারণ কবি তো নিজেই মহাকাব্যের নায়ক হবেন এতে আর জিজ্ঞাসা কিসের। তাঁর নিজের জীবন দিয়েই রাবণের চরিত্র এঁকেছেন, তাঁর নিজের চরিত্র দিয়েই প্রমীলার চরিত্র এঁকেছেন। তাঁর নিজের চরিত্র দিয়েই মন্দাদরী সরমার চরিত্র এঁকেছেন। মায়া, মমতা নিষ্ঠুরতা সবই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। কবির জীবনের যে ছন্দ সেই ছন্দ দিয়েই মেধনাদ বধ কাব্যের ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, রীতিমত মহাকাব্যিক ঢঙে।

মন্দাদরীর সঙ্গে রেবেকার পার্থক্য কোথায়! পুত্র হারা চিত্রাঙ্গদা-পুত্র হারা মন্দাদরী পুত্র হারা গন্ধর্ব্বনান্দিনী অভিযোগ তুলেছে রাবণের দিকে আঙ্গুল তুলে আমাদের এক সন্তান, তোমার যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে মৃত্যু বরন করতে হল, আমি সন্তান হারা হয়ে কিভাবে বেঁচে থাকব? তোমার তো অনেক মহিষী আছে। আমার আর কে রইল তিনি কি রেবেকা নন! কবি অর্থাৎ রাবণ বললেন উত্তরে—

'এ বিলাপ কভু দেবি সাজে কি তোমারে' কিন্তু সন্তান হারা জননী কি স্তোপ-বাক্য শোনে প্রায় অভিশাপের সুরেই বলেন জননী চিত্রঙ্গদা—

'হায় নাথ নিজ কর্ম ফলে সজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি, আবার কবি প্রমিলার কথা ভেবেও লিখলেন—'প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব নন্দিনী প্রমিলা পতি বিরহে কাতরা যুবতী'। এই সব অজস্র দৃশ্যগুলি কি বার বার আমাদের চোখে ভাসে না, রেবেকা এবং হেনরিয়েটার জীবনের কথা বার বার দৃশ্যত উপস্থিত হয়। —রাবণের নিষ্ঠুরতা মমতা প্রেমের সঙ্গে কবি মধুসূদনের জীবনের ছবিগুলো, দেখা যাক তার জীবনের ঘটনা প্রবাহ কোন বেলাভূমিতে উপস্থিত হয়— তাঁকে বলতে হয়েছে রেখো মা দাসেরে মনে'

শ্রী মধুসূদনের একটি পত্র পড়লেই আমরা সেই সময়ের অনেক বিষয় জানতে পারব। এই পত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মাদ্রাজ প্রবাসের কথা শেষ কোরব।

Mardras Male Orphan Asylum
Black Town
14th February, 1849

My Dearest Friend,

By my trouth you wrong me! It is impossible for me to forget you,-and you may rest assured that I have often thought of you with feelings of deeper love than many whom I known. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,-no easy matter, I assure you,-especially. for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale!-Here's a simple for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doing is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency, I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However. "all is well that ends well!" I am sorry to hear of your servere loss, but I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is-merciful God! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie" and a short poem or two I must give you a description of my "Captive". It contains about tweleve hundred lines of good, bad and indifferent octo syllabic verse and (truth,'pon honour!) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to re publish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you. I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras),

by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers? I am sure, if you try, you will succeed, Two Rs per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school fellows. Let me know before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B.B. Dutta. (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, &c.?* My kind remembrances to them Won't they get me a few subscribers? trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

I say, old Gour Dass Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,-Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow! When I have time, I shall give you a full detail or my-self. So let me conclude, now, with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am,

Every your affectionate
M. Dutta.

P.S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose,* please give my respects to him. What are you doing with yourself now. Are you employed any where or "cutting it fat"–eh?

মহাকবি ফিরে এলেন কোলকাতায়

কোলকাতায় এসে কবি নিজের বাড়িতে (খিদিরপুর) প্রায় ঢুকতেই পারলেন না, যদিও দীর্ঘকাল আট বছরের অধিক সময় মাদ্রাজে থাকাকালীন তাঁর শারীরিক পরিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন, চাল চলন আচার ব্যবহারের পরিবর্তন মূলত জীবনের সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরাজী ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষার সমতুল্য। সে কারণ তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা মধুসূদনকে চিনতে না পারায় ঠাঁই হল না তাঁর নিজের বাড়ীতে, যে বাড়ী ছিল একদিন আনন্দ ঘন চাঞ্চল্য মুখরিত, আজ দীর্ঘ আট বছর বাদে সেই বাড়ীতে তিনি দেখলেন বিষাদের ছায়া শূন্যতায় পরিপূর্ণ। বাড়ীর বিষয় যদিও বন্ধু গৌরদাসের পত্রে জেনেছিলেন তবু ভাবতে পারেন নি, আত্মীয় স্বজনেরা এই ভাবে সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করার চেষ্টা করবে। বাড়ীর মালিকানা নিয়ে তুমুল বিবাদ দুই আত্মীয়ের মধ্যে অথচ দুই দাবীদারই বলছে তাদের কাছে উইল আছে, আবার এই বাড়ীর সত্যতা যাচাই কোরবার জন্য আদালত ভার দিয়েছে বাবু গৌর দাস বসাকের উপর। ঐ দুই আত্মীয়কে বাবু গৌরদাস বসাক বার বার বলেছেন আপনারা যদি এই বাড়ীর মালিক হন তাহলে উইল দেখান। এই অসৎ আত্মীয়গণ কোন দিন উইল দেখাতে পারেন নি। বাবু গৌরদাস জানতেন এ বাড়ীর ইতিহাস, তিনি আদালতে রির্পোট ও দিয়েছেন এই বাড়ীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র শ্রী মধুসূদন দত্ত তিনি মাদ্রাজে আছেন। অথচ আশ্চর্য মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে তিনি শুধু বাড়ীটা চোখের দেখা দেখলেন। ভিতরে প্রবেশ করতে পারলেন না। উপায়হীন অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন বিশপ্স কলেজে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায়।

রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন মহৎ জীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরের দিন গৌরদাসকে পত্র লিখলেন, সে যেন সত্ত্বর রেভাঃকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং এও লিখলেন তাঁর কোলকাতায় আগমনের ব্যাপারটি যেন কাউকে না জানায়। কোলকাতায় ফিরে নিজের বাড়ীতে না উঠতে পেরেও কোন প্রতিবাদ করেন নি, উপরন্তু তাঁর বাড়ী দখলদার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কোন লড়াই এ না গিয়ে চুপ চাপ মাথা নীচু করে নিজের পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন বিশপ্স কলেজে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযের বাড়ীতে। তিনি কোলকাতায় এসেছেন এ কথা যেন কেউ না জানে, বার বার বন্ধু গৌরদাসকে বলেছেন। সরল হৃদয়ের মানুষ গৌরদাস অত কৌশল অত কায়দা জানেনা, গৌরদাস জানে মধু প্রতিভাবান, প্রতিভাবান মানুষদের বোঝা অত সহজ নয়, কখন কোন মুডে থাকে বোঝা খুবই কঠিন, মধু কোলকাতায় আসাতে গৌরদাসের খুব আনন্দ, অথচ গৌরদাস কাউকে বলতে পারবেন না মধু কোলকাতায় এসেছে। কিন্তু কেন?

তখন ইংরাজ রাজ, বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়াতো ইংরাজগণ, মধু সেই ইংরাজদের নানা সময় নানা বিপদে ফেলেছে, চার সন্তান এবং ইংরাজ স্ত্রী রেবেকা মেকাটাভিশকে পরিত্যাগ করা, এবং হেনরিয়েটার সঙ্গে লিভ টুগেদার এতো সহজ ব্যাপার নয়। প্রচন্ড

দোর্দন্ত প্রতাপ ঠাকুরদা—ডুগাল্ড ম্যাকটাভিশ তো মধুসূদনকে ছেড়ে দেবে না। এমন কি জর্জ নরটন সাহেব তিনিও ছাড়ার বান্দা নয়। রেবেকার কাছে তার ঠাকুরদা ও জর্জ নরটন সাহেব সব শুনেছে।

মধুসূদনের বাঁচার সংশয় দেখা দিয়েছে, তিনি সবই বুঝতে পারছেন, ইংরাজ সাহেবরা তাঁকে ছেড়ে দেবে না, হয় বন্দুকের নল নচেৎ সারাজীবন সংশোধনাগার, এই দুটোর একটাই মধুর ভাগ্যে জুটবে।

মধুসূদনের ছদ্মবেশ ধরা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না, বাধ্য হয়ে মিঃ হল্ট ছদ্ম নামে স্টীমারের টিকিট কিনে কোলকাতার দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন।

তাই কোলকাতায় ফিরে যাতে জানা জানি না হয়, ইংরাজের কানে বিষয়টি না যায় তার জন্য গৌরকে বার বার বলেছেন আমি কোলকাতায় এসেছি, তুমি কাউকে বলবে না, গৌরদাসকে গোপনে পত্র লিখলেন—গৌরদাস পত্র পেয়ে ভীষণ খুশি, এমন কি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহানুভূতি সম্পন্ন। প্রবাসে দীর্ঘ দিন থাকায় তিনি স্থূলকায় হয়েছিলেন, কণ্ঠের স্বর পরিবর্তন হয়েছিল, বিজাতীয়দের সঙ্গে বসবাস, ইউরোপীয় মহিলার পানি গ্রহণ, হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, আচার ব্যবহার সাহেবদের মত, বাংলা বলতে ভীষণ অসুবিধা যদিও বা দু একটি বাংলা বলেন তা ইউরোপীয় ঢংয়েই বলেন, উচ্চারণের কিছুটা বিকৃত হয়ে যায়, এই সুযোগে মধুসূদনের বাড়ীর দখলদার আত্মীয় স্বজনগণ মধুসূদনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগলেন, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় রাজনারায়ণ দত্তের সম্পত্তিতে তাঁর কোন অধিকার নেই, এইসব যত রকম কৌশল অবলম্বন করার দরকার আত্মীয় স্বজনরা তা তারা করেছিল। এই বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে কবি গৌরদাসের সঙ্গে সব সময় আলোচনা করতেন। কিন্তু মধুসূদন কোলকাতায় থাকবেন তাঁর বিশাল খরচ যোগাবে কে ? রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে দু এক দিনের বেশী তো মধুসূদনের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, কারণ মধুসূদন অহংকারী পুরুষ, তাছাড়া যে কোন সাধারণ বাড়ীর ছেলে নয়, একেবারে মুন্সি রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র, তাছাড়া ইনি আবার বিরল প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ তদুপরি কোলকাতায় থেকে তাঁকে মামলা মোকদ্দমা করতে হবে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য। বন্ধু গৌরদাসের মধ্যে এ সব চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে। মধুসূদনের যত না চিন্তা তার থেকে বেশী চিন্তা বাবু গৌরদাস বসাকের। সম্পত্তি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোলকাতাতেই থাকতে হবে এবং জীবিকার জন্য যে কোন চাকরি করতে হবে। কোলকাতায় ফিরে আসার আনন্দে গৌরদাস মধুসূদনের সম্মানার্থে একটি সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করলেন ।

ঐ সান্ধ্য ভোজে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা), রাজা দিগম্বর মিত্র, কিশোরী চাঁদ মিত্র আরো অনেকে, বৈষয়ীক মানুষদের কাছে তিনি তাঁর বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিষয় জানতে পারলেন, তাঁর পিতার সুন্দরবনের সম্পত্তি, খিদিরপুরের সম্পত্তি এবং যশোহরের সম্পত্তির প্রচুর মূল্য এসবের একমাত্র দাবীদার এবং উত্তরাধিকারী মধুসূদন।

এই সব সম্পত্তি ও অর্থের কথা শুনে কবি আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন গৌর তাহলে এবার ইংলন্ডে যাবার ইচ্ছা পূরণ হবে? গৌর হাসলেন শুধু বললেন, আগে তোমার একটা চাকরি দরকার, এই সব সম্পত্তি উদ্ধার করতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার, কারণ যে সব আত্মীয় স্বজনেরা তোমার সম্পত্তি অধিকার করে বসেছে তারা সহজেই ছেড়ে দেবে না। সমস্ত শুভান্ধ্যায়ীগণ মিলে কবির জন্য একটি চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর একটি চিঠিতে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদের চাকরির বিষয়টি জানা যায়—

ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখলেন—

'কিছু দিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময় নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ঐ পদে উপযুক্ত শিক্ষক বাছিয়া লইবার জন্য, প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই, এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি-পরীক্ষায় ভালো হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, নর্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময় মধুর বাঙ্গাল ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে পৃথিবী লিখিতে প্রথিবী লিখিত কিন্তু সেই মধু কিছু কাল পরেই, আমার নর্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করেন এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাবধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।''

মধুসূদন যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তা শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ভূদেব আসিন হোক কবি এটাই চেয়েছিলেন, কিন্তু উপায় নেই বন্ধুদের পরামর্শে কবিকে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। কবি নিজের মর্যাদা বজায় রেখে অতি সুকৌশলে চাকরিটি ভুদেব মুখোপাধ্যায়কে ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ কবি জানতেন ভূদেব অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, এই চাকরিটি তাঁর ভীষণ প্রয়োজন ঠিক সেই কারণে তিনি উচ্চারণ বিকৃত করে পৃথিবীকে প্রথিবী বললেন ইউরোপীয় ঢংঙে। তিনি পৃথিবী বানান বা উচ্চারণ জানতেন না এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। নচেৎ তাঁর কয়েক মাস বাদে মেঘনাদ বধের মত মহাকাব্য যেখানে জটিল শব্দে ভরা, কঠিন শব্দে ভরা, উচ্চারণ করতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির দাঁত ভেঙে যেত এহেন ভীষণ কঠিন একটি মহাকাব্য তিনি লিখলেন কি করে? তিনি কোন দিন সময় নষ্ট করেন নি।

তিনি বিশপ্স কলেজে এবং মাদ্রাজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চা করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ। সেই মহান কবি পৃথিবী বানান লিখতে ভুল করবেন? এ অসম্ভব শুধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটালেন, কবি জানতেন ভূদেব যদি চাকরিটা না পায় তাহলে ওর ভীষণ অসুবিধা হবে। অথচ সাধারণ এবং পণ্ডিতদের কাছে এই (প্রথিবী) বিষয়টি রসভরা গল্পে পরিণত হয়েছে। কবি জানতেন শুধু বন্ধুর চাকরিটা যাতে হয় তার জন্য কৌশলে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও কৌশলে বার বার স্বীকার করেছেন ''পরীক্ষায় ভালো হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে'' কবির তো চাকরির অভাব নাই আর মাইকেল এম্

এস্ ডাট যে কোন চাকরি করবে কেন? হয়'ত তিনি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যেতেন যদি না ভূদেব থাকত, কারণ শিক্ষকতার ব্যাপারে কবির যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, মাদ্রাজে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষকতা করেছিলেন শুধু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কবি কৌশলে সরে দাঁড়ালেন।

বন্ধুদের সহায়তায় এবং বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীগণের প্রচেষ্টায় পুলিশ কোর্টে একটি কেরাণীর পদ পেলেন, কবি তো কেরাণী হবার জন্য জন্মাননি—এই কাজে মোটেও সন্তুষ্ট নন যদিও পরে দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত হলেন, কিশোরীলাল হালদার দুঃখ করে কবির সম্পর্কে বললেন—

On his return from madras Presidency in 1856. We find him employed first as head clerk, and afterwards as interpreter to Baboo kissory chand mitra, then junior police magistrate of Calcutta-such was the appointment that was thought fit for a man who could write a poem like Byron and Scott, edit a paper in English with acknowledged ability and success. He was the case of a man undoubted merit, with no influential patran to appreciate it. At the same time some of his contemporaries. With not even an one tenth part of his talents and abilities, were basking in the Sunshine of official favour and patronage. But there is no remedy. It is the curse of service; preferment goes by letter and affection.

এক দিকে সম্পত্তির ঝামেলা অন্য দিকে সাহিত্য সাধনা এবং অর্থোপার্জন সব মিলিয়ে কবি কোলকাতাতেও ভীষণ ব্যস্ত। চাকরি তাঁকে করতেই হবে। কিশোরী চাঁদ মিত্র ঐ সময় কোলকাতার অধস্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁরই অফিসের হেডক্লার্ক, কিছুকাল পরে দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এই কিশোরী চাঁদ মিত্রও তাঁর দাদা রাজা দিগম্বর মিত্র দুই ভাই মধুসূদনকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন। দুই ভাই আবার হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। কিশোরী চাঁদ এর জ্যাঠতুতো শ্বশুর রামধন ঘোষ মধুসূদনের প্রতিবেশী ছিলেন, খিদিরপুরেই ওনার বাড়ী ছিল।

তদানীন্তন সময়ে রামধন ঘোষ কলকাতার কালেক্টর ছিলেন, এ ছাড়া কিশোরী চাঁদের স্ত্রী অতি শৈশব কাল থেকেই মধুসূদনকে দাদা বলে ডাকতেন। এদের মধ্যে একটা পারিবারিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল দত্ত বংশের সঙ্গে। সেই হেতু কিশোরী চাঁদ ভীষণ স্নেহের চোখে মধুসূদনকে দেখতেন।

ঠিক এই সুযোগে মধুসূদন চিন্তা করলেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে আর থাকা উচিত নয়। ব্যবস্থা হল কিশোরী চাঁদ মিত্রের এক নম্বর দম দম রোডের বাগান বাড়ীতে। কবি চলে এলেন, কিন্তু বেশি দিন কিশোরী চাঁদের বাগান বাড়ীতে ছিলেন না, মাত্র কয়েক মাস। প্রথমার্ধে কবির মনের অবস্থা খুবই ভালো ছিল, কিশোরী চাঁদ তাঁর দিন লিপিতে লিখেছেন মধুসূদন সেই সময় একটি ইংরাজী গান উপহার দিয়েছিলেন।

20th July, 1856- Mr.M.S.Dutt gave me the following song.
"When I was a young and gay recruit,
just landed at madras;
I thought to lead a sober life
with superfine black shining lass.
I roved about from place to place.
Unitl I found my mathonia.
Oh! What a Charming girl she was
with her thana-na-Nia."

মধুসূদন দীর্ঘ আট বছর পর যখন কোলকাতায় এলেন তখন দেখলেন বাংলা ভাষা সাহিত্যের আমুল পরিবর্তন হয়েছে, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মনীষীগণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যে সব মনীষী ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বাংলা ভাষা যে শক্তিশালী ভাষা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সে সময় ইংরাজী শিক্ষিত মানুষদের সভা সমিতিতে ইংরাজীতে বক্তৃতা না দেওয়া নাকি সম্মানহানীকরের নামান্তর হয়ে দাঁড়াত, ইংরাজী শিক্ষিত মানুষেরা ভাবতেন। আশার কথা গর্বের কথা ইংরাজী শিক্ষিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদন মোহন তর্কালঙ্কার রাজনারায়ণ বসু সকলেই বক্তৃতা দিলেন বাংলাতে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি সভায়। এমন কি রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার বিষয়ও ছিল 'কি উপায়ে বাংলা ভাষার উন্নতি হতে পারে" কালীপ্রসন্ন সিংহ ও অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন।'

যে কোন বক্তৃতায় বাংলা ভাষার অনুশীলনে উপর তিনি জোর দিতেন। বাংলা ভাষায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা তার উন্নতির সোপান কি ভাবে তৈরী করতে হবে তার জন্য সে যুগের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সচেতন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় রচনা করে ভাষাকে আরো সুন্দর ও রুচিসম্মত করে তুললেন, পর পর প্রকাশ করলেন বেতালপঞ্চবিংশতি-জীবনচরিত ও শকুন্তলা এ ছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার দত্তের ওজস্বী ও ভাব গম্ভীর রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিগণের মাঝে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল, বাংলা ভাষা যে কত শক্তিশালী ভাষা, এই ভাষাতেই একমাত্র মহাকাব্য রচনা করাই সম্ভব তা অক্ষয় কুমার দত্তে র শক্তিশালী লেখনীতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ, কিশোরী চাঁদ মহাশয়ের বাংলা ভাষায় তেমন কোন অধিকার ছিল না কারণ তিনি ইংরাজীয়ানায় মানুষ এবং সেই কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান ফিল্ডের' সম্পাদক আবার অধঃস্থন ম্যাজিষ্ট্রেট বটে, এহেন মানুষ বাংলা ভাষার অমৃত স্বাদ পাবেন কোথা থেকে ?

মনীষী প্রবন্ধকার সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্তের বাংলা ভাষার বক্তৃতা শুনে কিশোরী চাঁদ বিস্মিত, বাংলা ভাষা এত মধুর, বাংলা ভাষায় এত সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া যেতে পারে বাংলা ভাসায় এত অমৃত ভান্ড আছে আগে তা জানতেন না। অক্ষয় কুমার দত্তের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ অত্যন্ত আনন্দে তিনি বলেছিলেন—

The Discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so, because of its being a Bengali one. I knew....... that there is a larg number of our educated friends who can realise nothing that is Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is written in their own Tongue. the most elevated thought and the most subling sentiments, when embodied in it become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is. I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of Cultivating the Bengali language-The language of our country, in which our earliest ideas and associations are entwined -will era long be recogninshed by all".

সে সময় সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল, মধুসূদন কোলকাতার ফিরে দেখলেন, 'বাংলা ভাষা তো ভুলে যাবার ভাষা নয়'। বাঙালী কবি সাহিত্যিকগণ চারিদিক থেকে যশঃপ্রাপ্ত হচ্ছেন, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক, কবি ভাবলেন বাংলা গদ্য সাহিত্যকে রুচি সম্মত ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, তাঁর সৃষ্টিতে তা প্রমাণও করলেন।

এদিকে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ আলোড়ন উঠেছে প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, পণ্ডিত তারাশঙ্কর শর্মা, মদন মোহন তর্কলঙ্কার, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র, এছাড়া আরো অনেকে আছেন সে সময় যাঁরা সাহিত্যের অঙ্গনে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় মধুসূদন দত্ত বাদ সাধলেন অনেকের কাছে, কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাগান বাড়ীতে মধুসূদন থাকতেন সেকারণ সেই বাগান বাড়ী হয়ে উঠেছিল চাঁদের হাট, সমসাময়িক সমস্ত কবি সাহিত্যকগণ কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হতেন সান্ধ্য ভোজের সময়, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর, তাঁর নিজস্ব একটি পত্রিকাও ছিল।

তাঁর পত্রিকার নাম ছিল 'মাসিক পত্র' তাঁর লেখা 'আলালের ঘরে দুলাল' ধারাবাহিক হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়, মধুসূদন আলালের ঘরে দুলাল পড়ে ঐ মজলিসে বলেছিলেন, বাংলা ভাষায় এত নিম্নমানের বই সৃষ্টি হলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হবে কি করে? ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিতমধুসূদনের এই তীব্র শ্লেষ শুনে প্যারিচাঁদ মিত্র বললেন, আপনি বাংলা ভাষার কি বোঝেন? তবে জেনে রাখুন আমার রচিত এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের শীর্ষ স্থান থাকবে এবং চিরস্থায়ী হবে। মধুসূদন বললেন, এটা বাংলা সাহিত্যের লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়, আপনার উহা কি কোন ভাষা! ব্যঙ্গত্বক হাসিতে বললেন It is the language of Fisherman, unless you import largely from the Sanskrit. সঙ্গে সঙ্গে কবি বললেন, আরো—

দেখবেন আমি যা সৃষ্টি করব তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। এই কথা শুনে সে দিন উপস্থিত সাহিত্যিকগণ উপহাসের হাসি হেসেছিল, আলালের ঘরে দুলাল গ্রন্থটি সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় এবং নিম্নমানের শব্দে লেখা হয়েছিল। মধুসূদন ঐ দুর্বল ভাবনা চিন্তা ও দুর্বল

ভাষাকে কোনরূপেই সমর্থন করতে পারলেন না। বললেন, আমি এমন সৃষ্টি করব যা বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে স্মরণ করতে হবে আমাকে।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমবেত অন্যান্যরা বললেন আপনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আপনি বাংলা লিখবেন? আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হবে, এ জন্মেও হবে না।

মধুসূদনের অহমিকা দম্ভ সে দিন বৃথা যায়নি, শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করে প্রমাণ করে দিলেন বললেন, বাংলা সাহিত্য দুর্বল চিত্তের মানুষদের জন্য নয়। বাংলা ভাষায় অনেক উন্নত সাহিত্য রচনা করা যায়। ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর শর্মিষ্ঠা মহাসমারোহে বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হল। ইংরাজদের যাতে বুঝতে কোন কষ্ট না হয় তাঁর জন্য মধুসূদন নাটকটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন এবং নাটক দেখার পরে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, শর্মিষ্ঠা নাটক কবির জীবনে এনে দিল প্রতিষ্ঠার সম্মান, শর্মিষ্ঠা নাটকের অসামান্য রচনা শৈলী দেখে রাজা প্রতাপ চন্দ্র এবং রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ তাঁকে প্রহসন রচনার জন্য অনুরোধ করলেন, ১৮৬০ সালে রাজাদের কথা মত দুটি প্রহসন রচনা করলেন প্রথমটি 'ভগ্ন' শিবমন্দির কিন্তু এই নামকরণ মহারাজদের এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী গণের পছন্দ হল না। কবি নামকরণ করলেন শিব মন্দিরের পরিবর্তে 'বুড় সালিকের ঘাড়ের রোঁ' তার পরই লিখলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'। এই দুটি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য হলেন, প্রহসন রচনার পরেই সৃষ্টি করলেন গ্রীক পুরানের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটক, নাটকটি পরিপূর্ণ মর্যাদা পেল। নাটকে গান নাচ সবই রাখলেন, এই প্রথম নাটকে নাচগানের প্রচলন হল। মধুসূদন এক জ্বলন্ত প্রতিভা।

মধুসূদনের জীবনে শান্তি নেই তিনি যেন জীবনের শেষ কথা বলতে পারছেন না, কোথায় যে শেষ তা তিনি নিজেও জানেন না, প্রতিভার এমনই যন্ত্রণা-১৮৬০ সালেই রচনা করলেন কৃষ্ণকুমারী নাটক। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাঁর মরকতকুঞ্জের প্রাসাদ ভবনে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি গণের আগমন ঘটত, মধুসূদনও যেতেন সেই মরকত কুঞ্জে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বললেন এ সব আপনার আকাশ কুসুম কল্পনা—বাংলা ভাষায় (Blank Verse) অমিত্রছন্দ কোন দিনই সম্ভব নয়, কিন্তু মধুসূদন যে জ্বলন্ত প্রতিভা, বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দ অসম্ভব এই কথাটি মধুসূদনের অপছন্দ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কবির যথেষ্ট তর্কও হয়েছিল, মধুসূদনের কাছে অসম্ভব বলে যে কিছু নেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জানা ছিল না বোধ করি, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনা করেই প্রথম সর্গ মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, মহারাজা পড়ে তো বিস্মিত এমন কি আরো যে সব মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ছিলেন তাঁরাও পড়ে চমকিত, তারা বলতে বাধ্য হলেন, অদ্ভুত রচনা শৈলী, কবিতার ছন্দ ভাব মাধুর্য্য ও শক্তিশালী প্রবাহ, কবিতা পাঠে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে কবি তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন, তারপর ১৮৬১ সালে কবি জীবনের শেষ সার্থক মহাকাব্য রচনা করলেন মেঘনাদবধ কাব্য। সেই সময় সমস্ত বাঙালীর মনে সাড়া পড়ে গেল। ১৮৬১ সালে কবি আর একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করলেন ব্রজাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬১ সালে আর এক কঠিন কাজে হাত দিলেন দীনবন্ধু মিত্রের

নীলদর্পন নাটকের অনুবাদে, রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর সামনে কবির বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীতারকনাথ ঘোষের বাড়ীর দোতলায় বসে অনুবাদ করতে লাগলেন। দুজন তিনজন লিখে যাচ্ছে আর কবি অনর্গল ইংরাজীতে বলে যাচ্ছেন, শেষ করলেন নীলদর্পন এখানেই বসে।

১৮৬২ সালে লিখলেন বীরাঙ্গনা কাব্য এটাই মধুসূদনের কবি জীবনের শেষ কাব্য। মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। তবে কাব্য সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যে বাড়ীতে বসে বেশি সময় কাটিয়েছিলেন সেটি হল লাল বাজার পুলিশ কোর্টের কাছে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড। মধুসূদনের সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই বাড়ীতে বসেই লেখা। হেনরিয়েটা মাদ্রাজ থেকে সোজা এই বাড়ীতে ওঠেন। শেষ কাব্য বীরাঙ্গনাও এই বাড়ীতে লেখা, বন্ধু গৌরদাস ঐ বাটী সম্পর্কে লিখেছেন।

Madhu was then living in a two storied house close to the police court on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works. Sarmistha, Tilottama, Meghnada. Had Bengal been England the house would have been purchased and maintained by the public for being visited by the admirers of his genius.

মাইকেল মধুসূদনের নাট্য জগতে আবির্ভাবের আগে থেকে বাংলায় ভালো নাটক ছিল না, যা ছিল তা ভীষণ নিম্নমানের তবু নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য লেখকগণ ও উদ্যোগীগণ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সে সময় বাংলা নাটকের জন্য কোন রঙ্গ মঞ্চ ছিল না। তবে ইংরাজদের জন্য প্রচুর নাট্যালয় ছিল। তখনকার দিনের বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতারা যে নাট্যালয়ে অভিনয় করতেন তার নাম ছিল (Sans-Soci) সাঁ-সোচি, ঐ নাট্যালয়ে সাধারণ কোন বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু সম্ভ্রান্ত বাঙালী অভিনয় দেখার জন্য প্রবেশ করতে পারতেন। ইংরাজদের ঐ অভিনয় দেখে সে যুগের ধনী বাঙালীগণ বহু অর্থ ব্যয় করে অনুকরণ করে নাটক করতেন। মধুসূদনের আগে নাটকের অবস্থা আরো খারাপ ছিল।

১৮৩৩ সালে বাংলা সাহিত্যে কোন নাটক ছিল না। শিশু কবি মধুসূদন এসব ঘটনা শুনেছিলেন, শ্যামবাজারের বিখ্যাত ধনী শ্রী নবীন চন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃত অর্থ ব্যয় করে নিজের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর বইটিকে নাট্যরূপ করে অভিনয় করিয়েছিল। কিন্তু কোন নাট্য মঞ্চে নয়, প্রত্যেক দৃশ্যের আগে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে একজন অভিনেতা আবৃত্তি করে শোনাতেন তারপর অভিনয়, এক একটি দৃশ্য এক একটি স্থানে হতো। দর্শকগণকে বার বার স্থান পরিবর্তন করে নাটক দেখতে হতো। ভালো বাংলা নাটক না থাকায় আবার ইংরাজী নাটকের দিকে এগিয়ে গেল বাঙালীর ছেলেরা। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্রগণ ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে ইংরাজী নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। পরবর্তী কালে যখন কবি মধ্য গগনের সূর্য।

১৮৫৭ সালে কিছু উদ্যোগী অভিনেতার আগ্রহে মার্চ মাস নাগাদ চড়ক ডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে কুলীন কুলসর্বস্বনাটক মঞ্চস্থ হয়। বাংলা নাটকে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কারত্নের বিদ্যাসুন্দরের পর সম্ভবতঃ এই কুলিনকূল সর্বস্বই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক এরপর বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের উৎসাহ এবং আগ্রহে 'শকুন্তলা' বেণীসংহার প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

তবে কোনটিই বাংলা দেশের সার্থক নাটক নয়। মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন নাটকের ভীষণ দৈন্য দশা। আশুতোষদেবের (ছাতু বাবু) বাড়ীতে শকুন্তলা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। ঐ নাটক দেখতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে বললেন, দু-এক দিনের জন্য এত বহুল অর্থব্যয় করে নাটক না করে একটা নাট্যশালা করা ভালো,-যা কথা তাই কাজ কিছু দিনের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়াতে বাগান বাড়ী কিনলেন, সেখানে বহু অর্থব্যয়ে রঙ্গশালা তৈরী করা হল। মঞ্চস্থ করতে হবে ভালো বাংলা নাটক, স্থির হলো শ্রী হর্ষদেব রচিত রত্নাবলী নাটক বাংলাতে করতে হবে। বাংলায় অনুবাদের ভার পড়ল পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর, ইতিমধ্যে তিনি কুলীনকূল সর্বস্ব লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে নাটকের প্রস্তুতি চলল। ঐ নাটক দেখার জন্য বাঙালী-অবাঙালী, এছাড়া পার্শী, ইহুদী, আর্মানী, ইংরাজ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক হল নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়ে অবাঙালীদের এক এক কপি দেওয়া হবে। কিন্তু এত অল্প সময়ে কে এই অনুবাদ করবে। বাবু গৌরদাস বসাক ঐ নাট্যলয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহারাজা প্রতাপচন্দ্র এবং মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে গৌরদাসেব সখ্যতা ছিল, ইংরাজী অনুবাদের ব্যাপারে তিনি মধুসূদনের নাম করলেন।

ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিতহিসাবে মধুসূদনের নাম কারো অজানা ছিল না।

১৮৫৮ সালের ৩১ শে জুলাই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হল রত্নাবলী। এছাড়াও বেশ কয়েক বার অভিনীত হয়েছিল রত্নাবলী। মধুসূদনের ইংরাজী অনুবাদ পড়ে ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে থেকে গণ্য মান্য এমন কি সংবাদ পত্রগুলোও প্রভূত প্রশংসা করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য ঐ সব প্রশংসার কোন মূল্য নেই মধুসূদনের কাছে। তিনি গৌরদাস বসাককে বললেন এত নিম্নমানের একটা নাটকের জন্য রাজারা এত প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছেন? গৌরদাস বললেন, ভালো বাংলা নাটক কোথায়?

মধুসূদন বললেন, আমি ভালো নাটক লিখে দেব। সত্যিই তাই, ইউরোপীয় আঙ্গিকে তিনি রচনা করলেন শর্মিষ্ঠা, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও যথার্থ নাটক কিন্তু আশ্চর্য্য হতে হয় তৎকালীন পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যে। রাজাদের কাছে নাটকটি এলে রাজার সভাপণ্ডিতও আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে রাজা বললেন, নাটকটির যদি কোথাও দোষ থাকে সেখানে দাগ দিয়ে দেবেন, নাটকটি সংস্কৃত বিধান অনুসারে লেখা হয়নি, ইউরোপীয় আঙ্গিকে রচনা করা হয়েছিল, পণ্ডিতপ্রবর নাটকটি পড়লেন এবং তিনি রাজাদের বললেন, নাটকটি আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ, সংস্কৃত বিধি অনুসারে হয় নি। তাছাড়া কাটকুট করলে গোটা রচনাটির কিছু থাকবে না, সুতরাং

এর সংশোধন করার ইচ্ছা আমার নেই, হেঁয়ালি করে আরো বললেন, নাটকটি সম্ভবত কোনও ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাবুর রচনা? রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রাজা প্রতাপ চন্দ্র এবং রাজা যতীন্দ্রমোহন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এই বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নকে বললেন, দেখুন বাংলা ভাষায় মধুসূদনের যথেষ্ট অধিকার নাই, সেকারণ আপনি নাটকটির বাক্য গঠন ব্যাকরণগত ছন্দ এবং বাক্য বিন্যাসের যদি কোন দোষ থাকে দেখে দিন। ব্যস্ পান্ডিত্যের সুযোগ পেয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর ভাষার উপর শুধু মাতব্বরীই করলেন না, তিনি পরিষ্কার বললেন নাটকটি সংস্কৃত রীতি মাফিক রচনা করতে। মধুসূদন এই সব পণ্ডিতদের কথা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, পণ্ডিতরা কি বলল তাতে মধুসূদনের কিছু যায় আসে না।

বিবিধার্থ সংগ্রহের বিখ্যাত সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র বললেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণ শর্মিষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।

বন্ধু রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুর শহরে শিক্ষকতায় ব্যস্ত মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক পড়ে কবিকে লিখে পাঠালেন—

None of your works has been unread by me. "Sermistha" is exactly after the rare classical model, is in many places full of starling poetry, and display's.

Considerable Knowledge of human nature! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle sermistha, the Tender interview between her and the king. The pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tire some jokes of the clown.

যখন শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূয়সী প্রশংসা জ্ঞানী গুণী মানুষের কাছ থেকে পাচ্ছেন তখনও কবি পণ্ডিতদের অজ্ঞতা সম্পর্কে মনে মনে বিষম ব্যথা অনুভব করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা সব সময় প্রাচীন রীতিই ঠিক আর যা নতুন তা বেঠিক তাই ক্ষোভে বাবু গৌরদাস বসাককে লিখলেন—

My dear Gour, Sunday

You must excuse me for not complying with your request. The fact is I do not like the idea of showing my play to our friends. In so incomplete a state. However as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Raj Narayon's Version as you justly call it disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by my self. I did not wish Raj Narayan to recast my sentences-most assuredly not I only requested him to correct gramatical, blunders. If any you know that a man's style is the reflection of his mind. And I am afraid there is but little Congeniality between our friend and my poor self However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them today, pray, dont say a word about Raj narayan, I shan't have him. He has made my poor girls Talk-D-D-cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama. But if the language be not ungramatical. If the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained. what care you If there be foreign air about the thing?

Do you dislike moores poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air. Carlyle's prose for its Germanism? Besides remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I thingk whose minds have been more or less imbued with western ideas and.modes of thinking; and that is my intention to throw off the letters forget for us by a survile admiaration of every things sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act. Already Complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you upon my word that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincereity; and yet I have no reason to belived that those men would flatter me. In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes, I may borrow a neck-tie, or even waist-coat, but not the whole suit. Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old--- in the shape of pandits. When you see joyteendra and the Rajas, pull away-there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences the Devill!! I would sooner burn the thing.

Your as usual
M.S. Dutta

এই দুখানি প্রহসন লিখে কবি তদানীন্তন পণ্ডিতদের ভয়ঙ্কর সমালোচনার মুখে পড়লেন। বিশেষ করে রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয় এ প্রহসনকে অসভ্য বললেন, ইয়ংবেঙ্গল তো নাটক মঞ্চস্থই করতে দিল না। সত্য ঘটনা লেখা যদি অপরাধ হয় তো কবি সে অপরাধ করতে রাজী। লম্পট নবকুমারের চরিত্র ছদ্মবেশী ভক্তপ্রসাদের চরিত্র তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করে ছিলেন কবি, রাজাদের অনুরোধে কবি প্রহসন লিখেছিলেন বেলগাছিয়ায় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ করার জন্য। কিন্তু সে নাটক মঞ্চস্থ করা গেল না ইয়ংবেঙ্গল-এর বিদ্রোহে, এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, তার স্মৃতি কথা লিখেছেন—

A few of the 'Young Bengal' Class, getting a secent of the farce 'একেই কি বলে সভ্যতা ? and feeling that the Caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajas, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a 'young Bengal') faught tooth and Nail for the success of his mission, but under great pressure, were obliged to give up the farce.

Raja Iswar chandra was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Theatre.

যদিও পরে রাজারা এই বই দুখানি পুস্তক আকারে প্রকাশ করলেন—১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে। রাজাদের আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে মধুসূদনের এই সব সৃষ্টি আজ কোথায় তলিয়ে যেত। বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করেছিলেন রাজারও। তাঁরাও আমাদের কাছে নমস্য। প্রহসন দুখানি মঞ্চস্থ না হওয়ায় কবি বিশেষ দুঃখও পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যখন কবি ইংলন্ডে তখন অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি 'একে কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি মঞ্চস্থ করলেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতি তে লিখেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ের রোঁ' প্রহসন দ্বয় রচনা করিবার অব্যাবহিত পরেই মধুসূদন গ্রীক পুরাণের ছায়া অবলম্বনে তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করিলেন তা ঠিক নয়। ১৮৫১ সালের ৮ই মে তারিখের যে পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে তাঁর প্রহসন অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রহসন রচনা করতে অনুরোধ করেছেন। পদ্মাবতী নাটকের তিন চার অঙ্কের প্রাপ্তির কথা এবং তাঁর নিজের গোটা নাটকটির সংক্ষিপ্তসার কয়েক মাস আগেই দেখার কথা জানাচ্ছেন সুতরাং আমরা পরিষ্কার প্রহসন দুটি পদ্মাবতী নাটকের আগেই কবি রচনা করেছিলেন।

তবে আমি দেখতে পাচ্ছি মধুসূদনের জীবনী লেখকদের সাল তারিখ নিয়ে নানা মত ভেদ তবে ঋষিদাস মহাশয়ের 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থটির সাল তারিখ আমি মেনে নিয়ে আমি এই গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ করেছি, যুক্তি তর্কের মধ্যে না গিয়ে ঋষিদাস মহাশয়ের বিশ্লেষণ ভঙ্গি আমার ভালো লেগেছে, তাঁর হিসাবটিই আমি যুক্তি গ্রাহ্য বলে মনে করি।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন কোলকাতায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী, আবাল্য স্বপ্ন বিলাত, বিষয় সম্পত্তি বিক্রি পত্তনী ও বন্ধক নানা বিষয়ে বিভিন্ন পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ৯ই জুন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যান্ডিয়া' জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করেন, কোলকাতায় ফিরে বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক এবং চাকরি বাসস্থান সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য প্রায় এক দেড় বছর ও সাহিত্য সাধনা করতে পারেন নি। ১৮৫৮ সালের ৩১ শে জুলাই এর কিছু আগে থেকে তিনি কলম ধরলেন, রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে। মাত্র পাঁচ বছর কবি বাংলা সাহিত্যকে স্বর্ণ সিংহাসনে মর্যাদার আসনে বসালেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনায় কবি এক এক করে সৃষ্টি করে ছিলেন এক এক অসাধারণ গ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ যা যুগ যুগ বাঙালীকে স্মরণ করতে হবে। আমি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছি তাঁর বিশেষ সৃষ্টি।

একেই কি বলে সভ্যতা এবং "বুড় সালিকের ঘারে রোঁ" দুখানি প্রহসন তো আধুনিক সাহিত্যের জনক। **একেই কি বলে সভ্যতা সম্পর্কে কিছু কথা।**

মহাকবি মধুসূদন তাঁর এই নাটকের মধ্যে শুধু একটি যুগের নয়, যুগ যুগের অতি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, যে সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন তা আমাদের কাছে একেবারে নিজস্ব যদিও এই শব্দও ভাষা মহাকবির ভাষা নয়। কিন্তু মহাকবির কলমে তা প্রকাশ পেয়েছে নিতান্তই ইতিহাসের প্রয়োজনে। উঠতি শিক্ষিত অথবা উঠতি ধনী যে কত নীচে নামতে পারে তা কবি দেখিয়েছেন কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে। বিশেষ প্রতিভা না থাকলে এই জাতীয় সৃষ্টি সম্ভব হয় না। বাস্তব জ্ঞান হীনতার অভাবে যে এদের জীবন কলুষিত হয় তা তিনি নব ও কালীর চরিত্রে প্রমাণ করেছেন। সুস্থ সামাজিক জীবনকে এই সব নব্য শিক্ষিত যুবকেরা কিভাবে ধ্বংস করে, নিজেদের জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায় এরা কত ভয়ংকর নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন মদ্যপ অবস্থায় নিজের ভগিনীকে চুম্বন করা, বৃদ্ধ পিতার সামনে মদ আনার হুকুম করা, গৃহে মদ্যপ অবস্থায় আগমন, বেশ্যাদের নিয়ে আনন্দ উৎসব। এরা মুখে সমাজগঠনের কথা বলে আবার এরাই সমাজের বুকে ব্যভিচার প্রতিষ্ঠা করে। সে ক্ষেত্রে মধুসূদন যে সব ভাষা ব্যবহার করেছেন তা যথেষ্ট ও যথার্থ। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যথার্থ এবং সার্থক প্রহসন। সমাজ গঠনে যে সব শিক্ষিত মানুষেরা বিশেষ ভূমিকা নিতে আসে তাদের আভ্যন্তরীণ চরিত্র কবি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। আজও আমরা নব এবং কালীরমত চরিত্র সর্বত্রই দেখতে পাই। কবির প্রয়াস সার্থক। মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হয়েছি কবি এই গ্রামীন নিকৃষ্ট শব্দ যা সুস্থ সমাজ জীবনে অথবা সংসার জীবনে উচ্চারণ করতে সাধারণ মানুষের শরীর শীতল হয়ে যায়, কবি এত বাস্তবতার মধ্যে এই সব ঘৃণা শব্দ কখন শিখলেন? কোন নিম্নমানের বন্ধু তো কবির সঙ্গে দেখিনি। তবু বলতে দ্বিধা নেই এ সার্থক রচনা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ এর আলোচনা—

তখনকার দিনে জমিদার ছিল, জমিদারের পেয়াদা ছিল, বরকন্দদাজ ছিল, নায়েব ছিল, ছিল মন্ত্রণা দাতা, এছাড়াও তার একান্ত নিজস্ব লোক ছিল, ছিল গুপ্তচর। যাকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় জমিদার ঠিক সেই সেই ভাবে কাজে লাগাত, আজ সমাজের পরিবর্তন হয়েছে জমিদার নেই তবে সেই স্থান দখল করে নিয়েছে জনগণের নেতা। নেতার হাতে পেয়াদা বরকন্দদাজ, নায়েব, মন্ত্রনাদাতা সবই আছে তবে নামের পরিবর্তন হয়েছে। ক্যাডার আছে, দল আছে, অসৎমানুষ আছে। জমিদারের যা যা ছিল নেতাদের তাই তাই আছে শুধু পোষাক পরিবর্তন 'বুড় সালিকের ঘাড়ের রোঁ' লেখাটি সার্থক হয়েছে যা যুগে যুগে মানুষ কে স্মরণ করতে হবে। আজও আমরা ভক্তপ্রসাদের মত ক্ষমতাসীন মানুষ দেখতে পাচ্ছি, যারা মুখে মানুষেক কথা বলে, ত্যাগের কথা বলে সমাজের কথা বলে তারাও যুবতী নারীর বক্ষদেশ

দেখতে ভোলে না—তারাও আবার পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হতে দ্বিধা রোধ করে না। যে মুসোলমানকে যবন বলা হচ্ছে তার ঘরের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে রাত কাটাবার বাসনা কম হয় না, এই সব বিশিষ্ট ক্ষমতাসীন মানুষেরা বলেন, নারীর আবার জাত আছে নাকি? ভোগের প্রয়োজনে নারীর জাত থাকে না, পূর্ণ সাম্যবাদ, ভোগের সুযোগ না পেলে বজ্জ্যাত জাত হয়ে ওঠে। ভক্ত প্রসাদের মত মানুষ যুগে যুগে আছে। কবি মধুসূদনের বিরুদ্ধে কিছু পণ্ডিত কলম ধরেছিলেন কিন্তু বাস্তবের বিচারে কবির লেখাই হয়ে উঠল সার্থক। পণ্ডিতদের যুক্তি ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। যদিও কবি কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের, কিন্তু কবির কোন উপায় ছিল না, চরিত্রের উপরে কবিকে নির্ভর করতে হয়েছে। ঐ সব শব্দ ব্যবহার করে তিনি যথার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের সার্থক প্রহসন যুগ যুগান্তরের জন্য। তাই তো নির্লজ্য, কামুক ভোগী ভক্তপ্রসাদের দল আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন। নাট্যকার সংলাপ ও ঘটনা উপস্থাপনায় এক নজির বিহীন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ তো বক ধার্মিক ভদ্র বেশী জমিদার ও ধনীদের লম্পট ও নির্লজ্য কামভোগের সম্মান বিনষ্টির কথা পরিষ্কার ভাবে তুলেছেন। অপর দিকে একেই কি বলে সভ্যতায় তিনি ইংয় বেঙ্গল এর নব্য যুবকদের চরিত্র সংশোধনের জন্য আষ্টে পৃষ্টে চাবুক মেরেছেন। নব্য যুবকেরা শুধু উচ্ছৃঙ্খল নয় অনাচারী ও দুবৃত্ত ও বটে। সেকালের নব্যপন্থি ও প্রাচীন পন্থি বক ধার্মিকদের চরিত্র পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার প্রতিছত্রে। এ এক অভাবনীয় সার্থক প্রহসন।

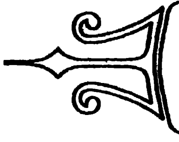
যারা এই নাটক দ্বয় প্রকাশ করেছিলেন—

একেই কি বলে সভ্যতা? প্রহসন—

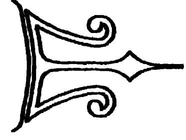
শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত প্রিয়ং/প্রযুক্তু সিদ্ধান্তি মৃষণা হিতৈষিনঃ। কিরাতরজ্জনীয়ং। কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহু বাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত-সন-১৮৬০ সাল।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-প্রহসন

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। কলিকাতা শ্রী যুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহু বাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে-ইষ্টান হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত-১৮৬০ সাল।



মেঘনাদবধ কাব্যের সৃষ্টির রহস্য ও পটভূমিকা



'মেঘনাথবধ কাব্য' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য। ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। এই অমর মহাকাব্য প্রকাশের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। ১৮৬১ সালে মধুসূদন ইহা দুইখন্ডে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড (১—৫ সর্গ) ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬—৯) ঐ বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-র মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহিত। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু বর্ণনায় বহু-গ্রন্থপাঠী মধুসূদন পাশ্চাত্যের বহু কাব্য হইতে নানা উপকরণ আহরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। 'ইলিয়াড', 'ডিভাইনা কমেডিয়া', 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', 'প্যারাডাইস্ লষ্ট', বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', 'কাশীরামদাসের 'মহাভারত', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাব কল্পনা ও বিষয়বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সৌন্দর্য সাধিত হইয়াছে। প্রাচ্য কাব্য নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন। ইহাতে কবির উপর গ্রীক-কবি হোমার, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ-কবি মিল্টনের প্রভাব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়। এইভাবে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পরিবেষণ করিয়াছেন নববেশে সুসজ্জিত করিয়া। এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয় নাই, অথবা কবির মৌলিকতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরন্তু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তিরূপ যাদুদণ্ডস্পর্শে বৈদেশিক উপকরণসমূহ এবং আদর্শ নবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া কবির কাব্যে এমনভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমরা বঙ্গ সাহিত্যে কবির বিশিষ্ট দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, এই সূত্রে বঙ্গ সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যকলা বরণ করিয়াছিলেন প্রাণের দোসররূপে। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসী গান শুনিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। তবু তাঁহার রাবণ মেঘনাদ বিভীষণ অথবা রাম লক্ষ্মণ সীতা হোমারের প্রায়াম হেক্টর অথবা আগামেম্নন্ নেস্টর হেলেন ইউলিসিসের অনুকৃতি হইয়া উঠে নাই, এমন কি ইহারা ইউরোপীয় নহে—সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও ইহারা খাঁটি ভারতীয় জিনিস।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ অনেক নূতনত্ব বিদ্যমান। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক

করাই রামায়ণের কবির উদ্দেশ্য কিন্তু "মেঘনাদবধ'-এর কবি এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির বর্ণনাগুণে আমরাও রাক্ষস-পরিবারের জন্য অশ্রুমোচন না করিয়া পারি না। রাক্ষস-পরিবারের স্বজাতিপ্রেমে আমরা মুগ্ধ হই—তাহাদের বিপর্যয়ে আমাদের দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মধুসূদন রাক্ষসকে রাক্ষস করিয়া আঁকেন নাই, মানুষের মত দেখিয়াছেন এবং সেইমত আঁকিয়াছেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মানুষ, তাঁহারা যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন, রাক্ষসের কূলবধু স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন।

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতাদেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন, তাঁহারাও মানব-মানবী এবং পৃথিবীর অপর নর-নারীগণের সুখদুঃখভাগী। মধুসূদন রামায়ণের প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাবণ ও রাক্ষস-পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই করিতে গিয়া তিনি রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমন কি রামায়ণ-বিরোধী অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্রকে ভীরু, কাপুরুষ ও শান্তরূপে চিত্রিত করিয়া রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা প্রভৃতির চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। কবির নিজের স্বদেশপ্রীতি খুব প্রবল ছিল, তাই তাঁহার কাব্যে রাক্ষসগণ উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, একজন বিদেশী সসৈন্যে আসিয়া অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই আক্রান্ত দেশ—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। সেই আক্রান্ত রাজা স্বদেশ ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়াও অদম্যভাবে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। মধুসূদন রাবণ চরিত্রে একটি বেগ এ উদ্যম লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইজন্য রাবণ কবির সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন। দেশ রক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই জন্যই বীর মেঘনাদের চরিত্র কবি অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাক্ষস-নারীচরিত্রগুলি ও কবি এভাবে আঁকিয়াছেন। প্রমীলা বীরাঙ্গনা। তাই উঁহাকে তিনি তেজস্বিনী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রমীলার বীরাঙ্গ নার তেজ ও কুলবধূর কোমলতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে। সরমা রাক্ষসবধূ বিভীষণের পত্নী। রাজপুরীতে সহায় হীনা সীতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি, রাবণের পাপাচরণের প্রতি ঘৃণা তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। অপরপক্ষে, রামের চরিত্রকে নিতান্ত হীন না করিলেও, কবি তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্বলচিত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, আর লক্ষ্মণকে করিয়াছেন কাপুরুষ। রামের দুর্বলতা এবং লক্ষ্মণের ভীরু কাপুরুষের মত মেঘনাদকে বধ করা কবির ভাল লাগে নাই ('I despise Ram and his rabble'– কবির এই উক্তি স্মরণীয়)। কিন্তু রাবণ ও মেঘনাদ স্বদেশ-রক্ষার জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন ও অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া পরাধীন দেশের অধিবাসী মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই।

এই রাক্ষস-পক্ষপাতিত্বহেতু তিনি রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসগণকে লোমশ ও নরখাদক বীভৎস জীব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। উহারাও তাঁহার কাব্যে মানুষ। উহাদের অন্তর হইতে মানুষের মতই স্নেহ-ভালবাসা, স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি উৎসারিত হইয়া উহাদিগকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রাবণ মহিমান্বিত সম্রাট্, স্নেহশীল পিতা, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। মেঘনাদও ধর্মভীরু পবিত্রাত্মা স্বদেশপ্রেমিক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় ঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন... যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।' তাই কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি আজও আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়, হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস-প্রধান। যদিও কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমেই বলিয়াছেন, 'গাহিব মা, বীররসে ভাসি' মহাগীত', তথাপি কাব্যের আদ্যোপান্ত করুণরসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে বীররস উৎসাহিত হইয়াছ মাত্র। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এক অতি সকরুণ সুর ধ্বনিত হইয়া কাব্যখানিকে অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। আদিম যুগের প্রভাতে যেমন করিয়া ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দন বাল্মীকির হৃদয়বীণায় করুণ ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে ভারতের মহাকবির পদাঙ্ক-অনুসরণকারী কবি মধুসূদনের হৃদয়তন্ত্রীও ভগ্নহৃদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুরা মন্দাদরীর বিলাপে করুণসুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—রক্ষোনরের সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সে করুণ রাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে রাবণের করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্মভেদী আর্তনাদের সহিত। এক কথায় বলিতে গেলে, পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিষয়বস্তু এবং কাব্যে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার কেন্দ্রস্বরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্য-এ মধুসূদনেব. উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণতি—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—নির্ঝারিণীর কুলুকুলু নিঃস্বনে অভ্যস্ত বঙ্গভাষায় জলপ্রপাতের ভীষণ

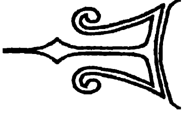
গর্জন আসে কোথা হইতে! বীণাধ্বনি শ্রবণে অভ্যস্ত তন্দ্রালস বাঙালীর কানে গম্ভীর ভেরীনিনাদ প্রবেশ করে কেমন করিয়া! সত্যই 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ সুর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি বর হেমচন্দ্র তাই বলিয়াছেন ঃ 'সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস-সংকলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই। ...নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদ বধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাসপন্ন কবি! ... সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরোচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

সত্যই দেশী ও বিদেশী নানা কবির নানা কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ মধুসূদনের যে কল্পলোক, তাহার সাহায্যে তিনি যে অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে 'আনন্দ করিবে পান সুধা নিরবধি'।

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত 'মেঘনাদবধ'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ "The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare" মেঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গভারতীর মন্দির শুধু আলোকিত হইয়া উঠে নাই, সাহিত্যের পৃথিবীতে আবিষ্কৃত এক নূতন ভূখণ্ড পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। যে মহিমা ট্র্যাজেডির পুণ্যফল, ট্র্যাজেডির তাপস মধুসূদন সেই মহিমায় রাবণকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি কাব্যলক্ষ্মীকে বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে চিরকালের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

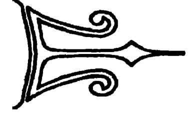


ভারসাইল্‌স-ফ্রান্স
এই গীর্জায় শ্রীমধুসূদন দত্ত হেনরিয়েটাকে নিয়ে প্রার্থনা সভায় যেতেন।



মেঘনাদবধ কাব্য

(প্রথম সর্গ)



কবির প্রার্থনা

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকূলে
চৌর্য্যে বত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্র-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

বীর বাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণ

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধর্নুদ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে। তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—

রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

সমুদ্রের প্রতি রাবণ

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কিহে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন- বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীর বলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

রাবণ-চিত্রাঙ্গদা-সংবাদ

কতক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়ী; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমন রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু

প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ে যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;—
"এ বিলাপ, কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণ,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম-সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায় নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।"

লঙ্কাপুরীর বন্দনা

অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহার, সতি!
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম-করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুনি প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"

(তৃতীয় সর্গ)

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি-বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায়রে, যেমনি

ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী; 'এইত তুলিনু
ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী;—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী;—
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক লঙ্কা, গর্জ্জিলা জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
করপুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মুরতি।
সহসা নাদিল ঠাট; 'জয় রাম'-ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি-পানে চাহি, কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির-বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া!
মায়াময় লঙ্কা-ধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;
কামরূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি। তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেনকালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলিপুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে।)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি

সুধিলা; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি!"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।"
এতেক কহিয়া বামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির-মণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ-সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্কা হৃদয়ে"।
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে;—
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি?" কহিলা রাঘব;—
"চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া-দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘ রাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী-দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাশে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিট্‌কারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;—
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-সম তেজে! দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!"

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে, গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ডামালিনী;—
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ্ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

(চতুর্থ সর্গ)

সীতা-সরমা-সংবাদ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মারিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী,
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধু-বেশে!
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে

এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?”
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমান্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
“ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!”
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু-স্বরে কহিলা মৈথিলী;—
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?”
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—“হিতৈষিণী সীতারে পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া—
“ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্র; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
“ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়ন মণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?”
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।

কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!);—"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে.
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে!
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে?
পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরিষ বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানাকথা! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেখি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে

সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

(পঞ্চম সর্গ)

ইন্দ্রজিতের বিদায়

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন!
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন!
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি বামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে।
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"

সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিলা যান যানবাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; 'শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র, পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরী!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিলা শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)—
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?"—এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী।
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে

পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূল, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর-অতল-জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্তে নগেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা, চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;—
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞ-শালা মুখে।

(ষষ্ঠ সর্গ)

মেঘনাদ বধ

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে, কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পুত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবী, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠ-গৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? একি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন, হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগরদ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ;— প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি? ভুলালে এ সবে
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুকএ তব, কৌতুকি?

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বাধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস সতত
দেবকুলে! এতদিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিলা বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্টি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, এ বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা, সৌমিত্রি,—
"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমনি তোরে? জন্ম রক্ষঃকুলে

তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!)—ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই! তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল, দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমেষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ; —নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ-সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা. টানিল তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমার, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামনুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে এ
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথী-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!

দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীট-বাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;—
“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ-কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?”
রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; কোন্ ধর্ম্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।”
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে!
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে ববিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিব, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহার-পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা, কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ-পানে গর্জ্জি ভীমনাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূল-হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা
চর্তুভুজে চর্তুভুজ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী—
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায়-মাঝারে!
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে

নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু। ভৈরব-আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্ক! যথায় বসি হৈম-সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পুরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীর-কুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রে, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

(সপ্তম সর্গ)

রাবণের যুদ্ধ যাত্রা

রণ মদে মত্ত সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ,—'বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি;
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!

বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিবে তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি?
বনুসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে;
গগনরতন শশী চির রাহুগ্রাসে!"

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;—
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে। প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার। বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতি-সম? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা। নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল-নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বূরকুলে,
কর্ব্বূরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!"

(অষ্টম সর্গ)

রামের বিলাপ

ভূপতির যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিশাদে!

চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনু করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি— ত্যাজিলা আমারে,

প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতরী, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে!
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

রামের প্রেতপুরী-দর্শন

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!

কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত, দারা,

আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্র-নখা মাসাংহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়া-দেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চির বাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষে হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকারে রবে
চিরবন্দী!" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে! তবে যদি কেহ
সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
পাপ-সহ রণে যে সুমতি,
দেবকূল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেণ তারে!
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"

কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বন-সুশোভিনী
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্য যথা।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,—
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"

(নবম সর্গ)

প্রমীলার চিতারোহণ

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে
বাহিরিলা লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকর-তেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষস-বধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সু-চামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুলে-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা,
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কুস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি,
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল-রাজা
রাবণ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতূরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বূরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতিঅশ্রুনীরে,
চলে সবে, পুরি দেশ বিশাদ-নিনাদে।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ

মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার-রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;-
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে-
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদ-তলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? —ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায়রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষস লক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥



ঋষি রাজনারায়ণ বসু

বীরাঙ্গনা কাব্য

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন-করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার-অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; তিনি সতীত্ব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা!
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি,
জুড়াও তারার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্পনামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?
যেদিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে!

ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায় রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!
বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা!
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আঁনি আমি, পড়ে কি হে মনে?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে? কুশাসন-তলে,
সে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে?
হায়রে, কাঁদিতে প্রাণ হেরি তৃণাসনে;
কোমল, কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী!
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়নে, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম!"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণানিধি;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী; ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্যে! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে!
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী!—
প্রতিফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে,
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে!' "
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে!—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে!
শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি!
ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে!
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে!

প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'হে দারুণ বিধি
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী?
তবে কেন'—কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা!
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যদি!
  তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে!
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী!—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে?
  ক্ষম, সখে!—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে!
এস তুমি; এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে!
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব; করিব যা কর;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!
  কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময়; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেণ আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি!
  আর কি লিখিবে দাসী? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম, ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।
  লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি!
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যা নন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

  এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে

মুকুল-কুসুম-ফুল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার-মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিজে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে? রঘু-কুল-বধু
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে!
কহ, শুনি, হে রাজন; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল!—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি?
  হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য বাদী রঘু-কুল-পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে, —গতি অধর্ম্মের পথে!'
  অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে
খেদাও গহন-বনে! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
  না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে!
  কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি!—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ-যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে!
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে!
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি!
  ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয়!
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত— ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি?

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে,
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিবে নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চির বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী,
বিচার করুন, ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্যা আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধপিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা কহিলা দূত—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ছিল অবরোধে

প্রবোধিতে জননীরে;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশদিশ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যোঝে যোধ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।

'দেখ, কুরুকুলনাথ',—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পলাইছে সপ্তরথী! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে,
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড টঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ; কেহ রথচূড়া, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'—
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী;—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অন্যায়-সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিল শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনী
অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে! পড়িছে ভূতলে
খেচর; ভূচরকূল পলাইছে দূরে!
ঝক্‌ঝকে দিব্যবর্ম্ম; খেলিছে কিরীটে
চপলা; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে!
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে!
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাসে! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;
তুমি, হে বসুধা, শুন; তুমি জলনিধি;
তুমি, স্বর্গ, শুন; তুমি, পাতাল, পাতালে;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু, যতনে মোরে আনিয়াছ হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ; কহ সত্য করি;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ? কোথায় রোধিলে

কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে!
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি!
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে,
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে!

কাল-অজগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?
হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে; শূন্যমার্গে গৰ্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত!—'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল!
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ রবি চিররাহুগ্রাসে!
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে!
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বৰ্ম্ম, চৰ্ম্ম,, অসি, তূণ, ধনুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে,
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে,
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার! কি দোষে
দোষী তবকাছে, কহ, পঞ্চ পাড়ুরথী?

চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ! দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?

তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ? দেখাইলে তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী!

এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি!
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ
রিপু; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডবদাহনে?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধৰ্ব্বাধিপতি?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরকালে?
স্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্যনেতা যত পার্থের প্রতাপে?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে?
কি সাথে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে?

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি;—মণিভদ্রে ভুল না নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!

জানি আমি, কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে; অশ্বত্থামা শূরে;
কৃপাচার্য্যে; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে;
কপোত মিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু-পাণ্ডু-কুলে!

পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি রাজা, তব হেতু আমি!—
গতরাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ঐ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরূরবা প্রতি!'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত;
চারিদিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভতরঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির-আঁখি সূর্য্যমুখী; ও চরণে রত
এ মনঃ!—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর; ঘোরবনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়ে জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর! যদি কৃপা কর,
তাও কহ;—যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে। এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা!—ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুলঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে।
সহসা কাঁপিল গিরি! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম!
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—

প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে!
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড় মলিন সলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয়-কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন, রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বর বধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমনি নন্দনে
স্বরম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা
নারীকূল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে,—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব্ব-অগ্রে-বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!
উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব?
বিষের ঔষধ বিষ—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া।
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে,
আমায় কহেন—'তুই হবি ফলবত।
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন রাজা নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্তে কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীর অশ্বমেধ পর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজ
হ্রেষে অশ্ব; গর্জ্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিছে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপ, প্রভু? পাল,' মহীপাল
ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ' ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছে যতনে তুমি অতিথি-রতনে—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ' সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,
যবে দেহ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথী,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি যে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে? —এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন-গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি? কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে

নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া। ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
জানি আমি কহে লোক রথীকূল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ, বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে কোন ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা, গুরুজন তুমি,
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে। এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা ফলিল তা কালে।—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশমাস দশদিন নানা কষ্ট সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলে?
হা পুত্র? শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে
কাঁদি খেদে, মর্ অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থসহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে! যাচি চিরবিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি!



Babu Gour Das Basak
The Great Friend's of Michael
Madhusudan Dutt

ইউরোপ যাবার প্রস্তুতি এবং ইউরোপে

কবি ইউরোপ যাবার প্রস্তুতি নিলেন, এবং সব পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ইউরোপ চললেন, আবাল্য স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ড শুধু দেখার জন্য নয়, ভাষা শিক্ষা ও ব্যারিষ্টার হবার জন্য। ইংলণ্ডে ছিলেন পার্লামেন্ট স্ট্রীটে ১৮৬৬ সালে সপরিবারে। সেখানে তিনি একটি বাড়ি ও ভাড়া নিলেন, বর্তমানে সেই স্থানের নাম হোয়াইট সিটি। এখন সেই বাড়ীটি বর্তমান বি-বি-সির দূরদর্শন ভবনের লাগোয়া, এক বছর এখানে বাস করেছিলেন, বিদ্যাসাগর টাকা পাঠাতেন এই বাড়ীর ঠিকানাতেই, কিন্তু ইংলন্ড জীবন অর্থাভাবে অসহনীয় হয়ে উঠল, হেনরিয়েটা তখন গর্ভবতী, ভীষন বিপদে পড়লেন, ধার আর কত করবেন, ঋণ গ্রস্ত হয়ে ইংলন্ডে কিছুটা সম্মান মর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিল অথচ দেশে বার বার পত্র লিখেও টাকা পাচ্ছেন না, দিগম্বর মিত্র হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, মোক্ষদা দেবী কেউ টাকা পাঠালো না; শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই বিপদের দিনে সময় সময় করে টাকা পাঠাতে লাগলেন, কবি দেখলেন ইংলন্ডে থাকা আর তাঁর পক্ষে সমীচিন নয়। এক ফরাসী বন্ধুর উপদেশে কবি গেলেন ফ্রান্সে, ইংলন্ডের থেকেও ফ্রান্স তাঁর ভালো লেগেছিল, এই সুযোগে ফ্রান্সের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রান্সের যেখানে কবি থাকতেন তা একদা সমগ্র ফ্রান্সের রাজধানী এবং বিশ্ব বিখ্যাত শহর। নাম ভার্সাই বা ভর্সেল্স। এই সুযোগে সেখানকার কিছুটা ইতিহাসও জেনে নেওয়া যেতে পারে। আসলে কবির মন তো রাজার মন সেই জন্য রাজকীয় স্থানেই কবি বাসস্থ করলেন। মধুসূদন জীবনে রাজার মত চলতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য রাজাদের দেশ ও খুঁজে নিলেন।

রোমক যুগে ফ্রান্সের নাম ছিল গলদেশ, এই গলেরা কোন দেশের প্রভুত্ব মানতে রাজী ছিল না, সুতরাং অবিরাম যুদ্ধ রোমের সঙ্গে গলদের। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দিতে জার্মানও ফ্রাঙ্ক জাতির নায়ক মেরোভিঞ্জি বংশের বিখ্যাত ক্লোভিস, তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন যুদ্ধ করে। এই ফ্রাঙ্ক জাতি পরবর্তীকালে ফ্রান্স নামে পরিচিত হল।

ক্লোভিস প্যারিস নিজের নামে প্যারিস নগর তৈরী করে উন্নতি করতে লাগলেন। তরপর যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ। প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী হল। ইংলণ্ডের সাথে ফ্রান্সের প্রায় একশত বছর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথমে ইংলণ্ড জয়ী হয়েছিল পরবর্তীকালে ফরাসী কৃষক বালিকা জোয়ান অব আর্ক এর অলৌকিক ক্ষমতায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করল ফ্রান্স। যাই হোক ফ্রান্সের সে অনেক বড় ইতিহাস। পরবর্তীকালে চতুর্দশ লই (১৬৩৮-১৭১৫) রাজত্ব কালে তিনিই ফ্রান্সের পূর্ণ বিকাশ ঘটান।

চতুর্দশ লুই-এর পরে রাজা হলেন পঞ্চদশ লুই তারপরে রাজা হলেন—ষোড়শ লুই এই ষোড়শ লুই-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকার পাশেই ছিল মধুসূদনের বাসস্থান—বাড়ীর সামনে যে রাস্তাটি ছিল তার নাম রু দেষ চ্যানটিয়রস (Ruedes Chantiers), ঐ রাস্তার পাশে

একটি বৃহৎকার কারখানা ছিল পাশেই ছিল-চার্চ্চ, কবি পত্নি হেনরিয়েটা ঐ চার্চ্চে যেতেন প্রতিদিন প্রার্থনার সময়, চার্চটির নাম ছিল এলিজাবেথ শ্যাপেল, কবি এবং কবি পত্নী শুধু এলিজাবেথ শ্যাপেল এ যেত্তে না, অ্যাভিনিউ দি পারি হয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেতেন নতরদাম চার্চ্চেও।

ঐ সময় কবির এত বেশি অর্থাভাব হয়েছিল যা ভাষায় বলা যায় না। পরিবার যদি সঙ্গে না থাকতেন হয়ত তিনি আত্মহত্যা করতেন, জনৈক চার্চ্চের এক পাদ্রী ঐ বিপদের সময় কবিকে ২৫ ফঁ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, ঐ চার্চের নিকটেই একটি রেল ষ্টেশনে ও ছিল, ভার্সাই তখনকার দিনে বিশ্বের অন্যতম এবং বিখ্যাত শহর।

ঐ বিখ্যাত প্রাসাদ গড়েছিলেন চতুর্দ লুই, বহু বছর সময় লেগেছিল প্রাসাদ বানাতে, Architect দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন Le-van, ঐ প্রাসাদের বাগানটি তৈরী করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৯ বছর। ১৬৫৩ খ্রীঃ, মাত্র ২৩ বছর বয়সে চতুর্দশ লুই রাজার আসনে বসেন। কবি মধুসূদন যে বাড়ীতে বাস করতেন যে রাস্তায় চলতেন অথবা যে চার্চ্চে স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে যেতেন তার সব ছবিও গ্রন্থে সংযোগ করা হল। কবি সব সময় যে পরিবেশের মধ্যে থাকতে চেয়েছেন বা থেকেছেন তা বোধ করি অনেক ধনী রাজপুত্রদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁর রাজকীয় মেজাজ নবাবী মনোভাব হাতে টাকা পেলেই এসে যেত। যাঁর ডাক টিকিট কেনার পয়সা নেই, ঘরের জিনিস পত্র বন্ধক দিয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র মিলটনের হাতে দুটো ফাঁ দেবার ক্ষমতা যার নেই, নিদারুণ অভাবে যিনি অর্ধ উন্মাদ হয়ে আছেন, বিদাসাগরের পাঠানো টাকার অপেক্ষায় যার সময় কাটে, তার মেজাজের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ কি ভাববেন জানিনা। গৌরকে লিখলেন গৌর আমি যেভাবে আনন্দ উপভোগ এবং পান ভোজন করি বোধ হয় বর্ধমান মহারাজার পক্ষেও সম্ভব নয়, এই বেহিসাবী মেজাজ এর একমাত্র কারণ তিনি জানতেন তার পিতার রেখে যাওয়া পঁচাত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি তাঁকে অসাবধানতার পথে নিয়ে গেছে। কি দেশে কি বিদেশে। এই রাজকীয় অবস্থায় থাকতে গিয়ে কবিকে বার বার সমূহ বিপদে পড়তেও হয়েছে—

কোন দিন শান্তি পাননি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্যা, যা চেয়েছিলেন মনে প্রাণে তা ঠিক ঠিক সময়ে না পাওয়ার দরুন জীবন কে স্বেচ্ছায় যন্ত্রণার দোলায় দুলিয়েছেন। কবির কোন চাওয়া তো অন্যায় নয়, ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র, তার প্রমাণ বার বার দিয়েছেন। আবাল্য স্বপ্ন ইংলন্ড। ইংরাজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ হবার বাসনা, নীল চক্ষু কন্যার পানিগ্রহন, স্নেহ ভালবাসা ও মর্যাদা আর কি চেয়েছেন? চেয়েছেন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ভাষারূপে পরিচিত করানো, তাঁর তো মহান হৃদয় ছিল উদার, ছিল বন্ধুত্ব প্রীতি, ব্যথিতের পাশে দাঁড়াতেন, পর দুঃখে কাতর হতেন, দুহাত ভরে দান করতেন একটা মানুষের জীবনের যা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি গুণ ছিল। অথচ কোনটাই তিনি ঠিক ঠিক পান নি, না পাওয়ার জন্যই তো কবি জীবন কে দুলিয়ে দিলেন। তাঁর সমালোচনা করেছে অনেকে কিন্তু তার ব্যথা তার যন্ত্রনা কোথায় তা অনেকে উপলব্ধি করেন নি। স্ত্রী রেবেকা ম্যাকাটাভিসের কাছে তিনি যা আশা করেছিলেন তা তিনি পেলেন না, অথচ

অভিমানী কবির মধ্যে অনেক যন্ত্রনা, তার চার চার পুত্র কন্যার জন্য এমনকি তিনি স্ত্রীর জন্য কি যন্ত্রনায় ছট ফট করেন নি? অভিমানে যন্ত্রনায় বুকে পাথর বেঁধেছেন, তাঁর চরম যন্ত্রনার কথা কাউকে বলতেও পারছেন না। স্ত্রী যদি সহযোগী না হয় স্ত্রী যদি বার বার অহমিকার দাপট দেখায়, সংসারের ব্যাথা বেদনার কথা যদি না বোঝে, স্বামীর গতি প্রকৃতি যদি উপলব্ধি করতে না পারে, সে নারীর ঘর সংসার করা উচিত নয়। পুরুষের দোষ আমরা সর্বত্রই দেখি কিন্তু নারীর যে কি ভয়ংকর অত্যাচার, এবং মানসিক উৎপীড়ন তা একবার ও ভেবে দেখি না। নারীর ঘৃণ্য অত্যাচারে সংসার ভাঙে। উপায়হীন অবস্থায় কবি চার চার পুত্র কন্যার গভীর স্নেহ মমতা মায়া বুকে বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে নিজের মান সম্মানকে বজায় রেখে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, কবি ঠিক সেই কারনে ডির্ভোস করেন নি, যদি কোন দিন রেবেকার অহমিকা দাম্ভিকতা কমে আবার যদি কবিকে মর্য্যাদার আসনে বসাতে পারে তাহলে সুখের সংসার আবার গড়বেন এ ইচ্ছা তার মনের মধ্যে প্রগাড় ছিল। কবি সারা জীবন একটা নিদারুণ ব্যথা নিয়ে ছুটেছেন, সে ব্যাথার অর্থ বোধ করি ঈশ্বর ছাড়া কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। পিতা বিলাত পাঠানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন কবির কাছে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহু প্রলোভন দেখিয়েছিলেন কেউ কিন্তু কথা রাখে নি। পৃথিবীতে একটা দাগ কেটে রেখে যাবার জন্য, বিদ্যা অর্জনের জন্য, যশোলাভের জন্য অর্থ আয়ের জন্য শুধুই ছুটেছেন। কোলকাতায় ফিরলেন সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য, পিতা মাতার মৃত্যুর পর এলেন পাকাপাকি ভাবে কোলকাতায়, কিন্তু কোলকাতায় এসে দেখলেন তার আত্মীয় স্বজন তার বিমাতা প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী দত্তকে পর্য্যন্ত তার আত্মীয় স্বজনরা অস্বীকার করল, কারণ কবি খ্রীষ্টান তাই সম্পত্তি থেকেও কবি কে তারা বঞ্চিত করল। দীর্ঘ দিন ধরে মামলা মোকদ্দমা চলল কবি উচ্ছেদ করলেন তাঁর নিজের বাড়ী থেকে আত্মীয় স্বজনদের, তাঁর মায়ের যে প্রচুর গহনা ছিল সেগুলো আর উদ্ধার করতে পারলেন না। মহাদেব চাটুজ্যে কবির পিতার কর্মচারী ছিল, সেই মহাদেব চাটুজ্যে কবিকে মামলা চালাবার অর্থ জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এদিকে ইউরোপ যাবার প্রস্তুতি, মহাদেব চাটুজ্যের এই উদার ব্যবহারে কবি খুব খুশি হয়েছিলেন সে কারণ তিনি একটি দলিল ও কোরলেন রাজা দিগম্বর মিত্রের উপস্থিতিতে, কিন্তু কপট মহাদেব চ্যাটার্জীর গোপন অভিসন্ধি তো কবি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি তবুও কবি সহজ ভাবেই দলিল করে দিলেন। কবির লেখা দলিলে লেখা আছে।

"আমার (মধুসূদনের) বিষয় ও দেনা পরিশোধের জন্য আপনার (মোক্ষদা দেবীর) স্বামী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং অদ্য পর্যন্ত আমার, মোকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধের জন্য ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত দুই টাকা তাঁহাকে আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলাম। তদনুযায়ী তাঁহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০ টাকা পনে উক্ত চকমুনকিয়া ও গদার ডাঙ্গা ১৮৬৮ সালের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাতিদার করিয়া দেওয়া গেল"—।

কথা ছিল মোক্ষদা দেবী ২৯৯৭ টাকা চার কিস্তিতে ইউরোপে পাঠাবেন মধুসূদনের জন্য। মোক্ষদা দেবী যাতে নিয়মিত কাজ করেন তার জন্য প্রতিভূ হিসাবে রাখলেন কবির পিসতুতো

ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র কে এবং কবির স্ত্রী হেনরিয়েটার হাতে মাসিক দেড়শ টাকা মোক্ষদা দেবী দেবেন। এছাড়া পিতার নির্দেশ মত কবি তাঁর দুই পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্রও দ্বারিকনাথ মিত্র কে আনুমানিক দুই হাজার টাকা মূল্যে চকমুনকিয়ার অর্ধেকের বেশী লিখে দিয়েছেন এছাড়া ঐ টাকায় সাগর দাঁড়ীর নিজস্ব পৈতৃক ভবন এবং জমীর অংশ লিখেছেন, এছাড়া কবির কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাও হেনরিয়েটাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এরপর ১৮৬২ সালের মে মাসে কবির বাল্য বন্ধু রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাত হাজার টাকায় খিদিরপুরের বাড়ীটি বিক্রি করে দেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স হয়েছিল সাইত্রিশ বছর। এই বয়সে কবি যথেষ্ট সম্মান যশ, খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং যা আয় করতেন তাতে একটি পরিবার সুন্দরভাবে চলতে পারে, একদিকে সরকারী চাকরি অন্য দিকে পুস্তক বিক্রয়ের যে সাম্মানিক তা যথেষ্ট, অভাব থাকার কোন কথা নয়। এছাড়া মামলা করে নিজের বাড়ী ও উদ্ধার করেছিলেন তাঁর ভূ-সম্পত্তির মূল্য ছিল ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকার ও বেশি। তাঁর মনের মধ্যে সেই চিন্তা ইংলন্ড, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কবির ভীষণ কাছের মানুষ, কারণ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা মারা গেলে জাহ্নবী দেবীকে মা বলে ডাকতেন । জাহ্নবী দেবী হরিমোহন কে খুবই পুত্র স্নেহ করতেন, মধুসূদনের সঙ্গে হরিমোহনের সম্পর্ক ও খুবই ভালো ছিল। হরিমোহন একস্থানে কবির সম্পর্কে লিখেছেন। ' মাইকেল অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, মায়ের আমি এক মাত্র পুত্র। যে পর্যন্ত তিনি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন। প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রি যোগে আসিয়া জননীকে দর্শন দিতেন।' ধর্ম ত্যাগ করায় জননী যেমন কষ্ঠ পেয়েছিলেন তেমনি বন্ধু বান্ধবেরাও যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা কালে বন্ধু রাজনারায়ণ কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন, ধর্ম সম্পর্কে দুই একটি কথাও হয়েছিল। রাজানারায়ণ কবিকে বলেছিলেন এ ধারণা আমার জন্মিয়াছে যে, তোমার পোষাক পরিচ্ছদ-ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণ রুপে হিন্দু'' কবি ও উত্তরে বলেছিলেন, তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না তাই খ্রীষ্টান ধর্ম ঘেঁসিয়া জীবন কাটিয়ে দিতে চাই'' ধর্ম সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলতে চাইতেন না তবে তিনি বলেছিলেন— 'Do to others as you wish they should do to you'

ইংলন্ড যাবার প্রস্তুতি চলছে বহুদিন ধরে, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্থানে লিখেছেন মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাটি আমি ক্রয় করিয়া বাস করিতেছি। ঐ বাটিতে এক বার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মাইকেল সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসত বাটিতে পূজার সমারোহ দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতৃ উদ্দেশ্যে বলেন, ''মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র হরিমোহন তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ। তোমার কুপুত্র আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। সাত হাজার টাকার বিনিময়ে হরিমোহনের কাছে বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছি।''

হে- মা—নরাধম আছিল যে নর নরকুলে।

শিশু পুত্র মিলটন কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং স্ত্রী হেনরিয়েটার জন্য সব পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ইউরোপ যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ইউরোপ যাবার আগে কবি ১৮৬২ সালের ৪ঠা জুন বন্ধু রাজনারায়ন বসুকে লিখলেন।

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and God willing. purpose to do starting, on the morning of 9th instant, for the steamer "Candia" you must not fancy, old boy, that I am a Traitor to the cause of our Native muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly deleyed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early Triumph is ours, and I may well leave the rest to yunger hands, not Ceasing to direct the movements from my distant retreat Well I am off my dear Rajnarayan!

Heven alone knows If we are to see each other again, but you must not forget your friend It's long seperation: years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame Being a poetaster, I would not think of bloting away without rhyming, and I enclose the result and I hope the thing is, If not good at least respectable my Native land, Good Night,"–Byron.

দেশ কে সম্ভাষণ পূর্বক বিদায় জানাবার পূর্বে দেশের প্রতি সম্মান জনক কবিতা লিখতেও ভোলেন নি—বন্ধু রাজনারায়নকে লিখলেন নিজের জীবনের আত্ম সমালোচনা করে। নিজের ভুল ভ্রান্তি আশা আকাঙ্খা অমরতা দৈবাদেশ, মাতৃভূমির প্রতি বিশেষ করুণ ভাবে নিবেদন করেছেন মধুকে মধুহীন কোরো না। তোমার শান্ত শীতল বক্ষে রেখো, আমি যেন মানুষের কাছে বেঁচে থাকতে পারি, আমাকে বর দাও অমরতার জন্য, শেষ কবিতা ইউরোপ যাবার আগে অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ৪ঠা জুন লিখলেন—

বঙ্গভূমির প্রতি

My Native land, Good night
–Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো, তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে

এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন,—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর ভুল দোষে, গুণ ধর,
অমর করিয়া বরদেহ দাসে সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শারদে!
Here you are, old Raj!-All that I can say is
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

স্ত্রী পুত্র কন্যাকে চুম্বন করে দেশকে বিদায় সম্ভাষন জানিয়ে—৯জুন ১৮৬২ সালে স্কান্ডিয়া জাহাজে উঠলেন ইউরোপের উদ্দেশ্যে। তবে কবি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়।

১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের জীবন।।

মহাসমুদ্রের বক্ষ ভেদ করে অর্নবপোত ধীরে ধীরে আবাল্য স্বপ্নের দেশ ইংলন্ডের দিকে যাত্রা শুরু করল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বপ্নের দেশ ইংলন্ডে পৌঁছালেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিকে ইংলন্ডে পৌঁছালেন ব্যারিষ্টারী পোড়বার জন্য গ্রেস ইন নামক ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশও করলেন, শুধু মান, সম্মান যশ খ্যাতির জন্য ব্যারিষ্টারী পড়লেন।

প্রকৃত ব্যারিষ্টারীতে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল না। ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। ব্যারিষ্টার হলেন ঠিকই কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য পেলেন না। তাই তার এক জীবনীকার লিখেছেন, চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় ব্যবহার শাস্ত্রের একদিকে আলোক এবং অপর দিকে অন্ধকার সঞ্চিত থাকে। দূর হইতে ব্যবহার শাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে মোহিত হইয়া দুরাশা মত্ত কবিগন উহার দিকে ধাবমান হন এবং অবশেষে নিকটবর্তী হইয়া সকলেই উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন করিয়া, থাকেন"। কবির জীবনে সেই অন্ধকারময় দিকটাই বেশি ফুটে উঠেছে। ব্যারিষ্টারী পড়বার সময় কবি বিশেষ ভাবে নজর দিলেন ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি স্নেহ প্রেম কোন দিন কবির জীবনে স্থায়ী হয় নি।

ইংলন্ডে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়ে আরো বিপদে পড়লেন। প্রতি মাসে যাদের টাকা পাঠানোর কথা ছিল তারা কয়েকমাস দিয়েই বন্ধ করে দিল, তাঁর প্রবাস কাল যে কি ভয়ংকর অবস্থায় কেটেছিল তাহা ভাবতেও শিহরণ জাগে। এ দিকে দেশে চুক্তি অনুযায়ী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, সেই সময় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর যদি টাকা না পাঠাতেন তাহলে হয়'ত কোন দরিদ্র নিবাসে অথবা কোন কারাগারে কবির জীবন বিনষ্ট হত। স্বদেশ ত্যাগের পূর্ব্বে যাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল টাকা দেবার তারা সকলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বৈষয়ীক জ্ঞানের অভাবহেতু কবিকে প্রতিমুহূর্তে বৈষয়ীক আঘাত খেতে হয়েছে। একদিকে ইংলন্ডে নিজের অভাবের শেষ নেই আবার দেশে স্ত্রী পুত্র কন্যা অভাবের জ্বালায় ছট ফট করছেন। স্ত্রী হেনরিয়েটা অভিযোগ নিয়ে বিদ্যাসাগর, গৌরদাস, রাজা দিগম্বর মিত্র সকলের কাছে গেছেন, শুধু আশ্বাসের বাণী শুনেছেন, তাতে তার কোন অর্থাভাব দূর হয়নি, বিদ্যাসাগর মহাশয় আপ্রাণ লড়াই করেছেন ঐ সব ব্যক্তিদের সাথে কিন্তু টাকা আদায় করতে পারেন নি, তবু বিদেশে মধুসূদনের বিপদের কথা চিন্তা করে ঋণ করে ১৫০০ টাকা পাঠালেন বিদ্যাসাগর, এছাড়াও বেশ কয়েক বার টাকা পাঠিয়েছিলেন। মানুষ এত বেইমান হয় কবি তা জানতেন না।

বিদ্যাসাগরকে লিখলেন কবি,—

আমি দিগম্বর মিত্রকে আটখানা পত্র লিখেছি তার একটিরও উত্তর দেয় নি। দেশে আমার এত টাকা থাকতে আমাকে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে আমি যদি ৪৫০ টাকা গ্রেস্ ইন কে না দিতে পারি আমাকে সাস্পেন্ড করে দেবে, (মনু) মনোমোহন ঘোষের কাছ থেকেও ২৫০ টাকা

ধার নিয়েছি ও কোথায় পাবে? তবুও আমাকে বিপদের সময়ে সে দিয়েছে। তুমি আমার এক মাত্র বন্ধু যে আমাকে এই বিপদের দিনে বাঁচাতে পারো। বাবু দিগম্বর মিত্র এবং আমার পিসতুতো ভাই বদ্যিনাথ মিত্র মোক্ষদা দেবীর ব্যাপারে ওরা প্রতিভূ ছিলেন। ওরাও এখন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, আমি দেশে ৪০০০ টাকা পাবো কিছু মানুষের কাছে আপনি আমাকে ক্ষেপে ক্ষেপে ঐ ৪০০০ টাকা পাঠান নচেৎ অনাহারে মৃত্যুবরণ ছাড়া রাস্তা নেই যাদের কাছে টাকা পাবো। নাম লিখে দিলাম।

মথুর মোহন কুন্ডু—		1700
সাগর দত্ত—	প্রায়	800
ওদের কাছে—(বিদ্যাসাগরের পরিচিত)		1000
মধুসূদন মজুমদার		500
		4000

আপনি এদের চেনেন, এরা সকলেই কম বেশী আমাদের বন্ধু। আমি দেশে ফিরে আপনার সমস্থ অর্থ পরিশোধ করে দেব। এই মুহূর্তে আপনি অন্ততঃ ১১০০ শত টাকা পাঠান নচেৎ গ্রেস্ ইন এ পড়া সম্ভব হবে না, টাকা না পেলে আমাকে প্যারিসে চলে যেতে হবে অভাবের তাড়নায়।

ইংলন্ডে সেই সময়ে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্যাতনামা সিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা) মনোমোহন ঘোষ এঁদের মধ্যে মধুসূদন বয়সে কিছুটা বড় ছিল, তাই সকলকে ছোট ভাই এর মত পড়াশুনার উপদেশ দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সিভিলিয়ান পরীক্ষার উর্ত্তীণ হলেন তখন মধুসূদনের সে কি আনন্দ এবং গর্ব। দেশে যে সব পত্র লিখতেন তার মধ্যে সব থেকে বেশি মনের সব কথা খুলে লিখতেন বন্ধু গৌরদাস কে, প্রতিভাবান মানুষদের সম্মান মর্যাদা দেবার জন্য যেমন এক শ্রেণীর মানুষ থাকে তেমনি নিন্দা করবার জন্যও কিছু মানুষ প্রস্তুত থাকে। নিন্দুকেরা স্বদেশে প্রচার করতে লাগল—

"মধুসূদন কোন দুষ্কর্ম করিয়া ইউরোপে কারাদন্ড ভোগ করিতেছে"

এই সংবাদে মধুসূদনের বন্ধুরা ভীষণ ব্যথিত হলেন এবং সেই সব নিন্দুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন তদানীন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। একবার এই বিষয়ে মনোমোহন ঘোষ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন—'ইহা বিন্দু মাত্র সত্য নহে" মধুসূদন উদার মনের মানুষ ইংলন্ডে অর্থাভাব হয়েছিল তার জন্য তাঁর প্রিয় বন্ধুদের অকপটে সব জানিয়েছেন। নিন্দুকেরা সেই সুযোগের অপব্যাখ্যা দিয়ে ঘৃণ্য প্রচার করেছিল।

এদিকে স্বদেশে হেনরিয়েটার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, অর্থাভাব ভীষণ। শকুনের দল বেইমানী করেছে, বাধ্য হয়ে হেনরিয়েটা পুত্র কন্যা নিয়ে ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলন্ডে মধুসূদনের কাছে পৌঁছালেন। দেশ থেকে কোন পয়সা না আসায় কবির দুরবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করল। ইংলন্ডে থাকা ভীষণ ব্যয় বহুল ব্যাপার তদুপরি স্ত্রী হেনরিয়েটার জল হাওয়া সহ্য

হচ্ছে না। না না দিক চিন্তা ভাবনা করে ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে গেলেন। তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে এলেন ঠিকানা—

12, Rue des chantiers
Versaillies
Franee.

কিন্তু এখানেও সেই একই বিপদ, কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও বিদ্যাচর্চ্চা এবং ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ভীষণ সজাগ ছিলেন—তাই তো বন্ধু গৌরদাস কে লিখেছিলেন" এক একটি ইউরোপীয় ভাষায় অধিকার লাভ করা, আর এক একটি বিস্তৃত ভূখন্ডের অধিকার লাভ করা সমান।" ইউরোপে থাকাকালীন অনেক কিছু আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু অর্ধসমাপ্ত করে ফেলে রেখেছিলেন। যেমন সীতার বনবাস, সুভদ্রা হরন, দৌপদী—স্বয়ম্বর ইত্যাদি।

মানসিক অশান্তি ও অর্থাভাবের জন্য কিছুই সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। কবি ফ্রান্সে থাকাকালীন সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত বাৎসরিক উৎসব চলছিল। বহু কবি দান্তের সম্মানার্থে ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিউয়েল এর কাছে কবিতা পাঠিয়েছিল। কবি মধুসূদনও দান্তের সম্মানার্থে ফরাসী এবং ইতালী ভাষায় ইতালী রাজার কাছে কবিতা পাঠিয়েছিলেন। ইতালী রাজ ভিক্টর ইমানুয়েল তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ এবং লিখেছিলেন "আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যকে সংযুক্ত করিবে" It will be a ring which will connect the orient with the occident.

এত মান যশ, সাহিত্য কীর্ত্তি সব কিছুর উর্দ্ধে অর্থাভাব—ফ্রান্সে আরো বিপদে পড়লেন, একে অর্থাভাব তার উপরে সপরিবার। কবি ছিলেন অপরিমিতব্যয়ি মানুষ, দুরবস্থা এমন পর্য্যায়ে উপনীত হল যে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর গহনা. বাড়ীর আসবাব, বই, এমনকি অমিত্রছন্দ প্রবর্তন করে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ যে সুন্দর রৌপ পান পত্র উপহার দিয়েছিলেন তাও তিনি বন্ধক দিলেন-গর্বনমেন্ট বন্ধকী অপিসে, এ ছাড়া হোটেলে দোকানে প্রচুর দেনা, শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াল যা কোন অতি দরিদ্র মানুষের ভাগ্যেও হয় না, অনাহার অর্ধাহার এমন কি জেল হবার উপক্রম হয়েছিল। একজন ফরাসী মহিলা মধুসূদনের এই দুরবস্থা বুঝতে পেরে গোপনে সাহায্য করতে লাগলেন, এবং একটি দাতব্য সমিতি কবির দ্বার দেশে আহার্য্য এবং পুত্র কন্যার জন্য দুগ্ধ রেখে চলে যেতেন, যাতে মধুসূদনের অমর্যাদা না হয় তার জন্য সেই দাতব্য সমিতি কাউকে বুঝতেও দিতেন না।

মধুসূদন যাদের কথার উপর বিশ্বাস করে ইউরোপে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য এসেছিলেন তারা সকলেই বেইমানী করল। সেই চরম বিপদের দিনে তার পাশে কেই নেই, হেনরিয়েটা বার বার বলেছেন দেশে তোমার এমন কোন বন্ধু নেই যে তোমাকে সাহায্য করতে পারে, কবি উত্তরে বলেছিলেন—আছে শিগগির টাকা পাঠাবে বিদ্যাসাগর, প্রতিদিন কবি পিওন কখন আসবে সেই অপেক্ষায় থাকতেন, পর পর বহু চিঠি লিখেছেন টাকার জন্য, দিগম্বর মিত্র, হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্ষদাদেবী কেউ কোন উত্তর দিল না, এমন কি পোষ্ট আফিসের ডাক টিকিট কেনার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর ছাড়া কোন

গতিনেই, তখন কবির মনের অবস্থা কি রকম ছিল কয়েকটি লাইনে তা বোঝা যায় বিদ্যাসাগর কে লিখলেন—

My great hope is in you, and, I am sure, you will not disappoint me If you do I must work my way back to India to commit one or Two murders willful premediated murders and then be hanged.

তিনি বললেন দিগম্বর মিত্র এবং হরি বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বহস্তে হত্যা করে স্বেচ্ছায় ফাঁসি কাঠে ঝুলব।" কবির তখন এমনই অর্থাভাব যে চিঠি পাঠাবার প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট কিনতে হচ্ছে জিনিস পত্র বন্ধক দিয়ে, সেই মুহূর্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৫০০ টাকা পাঠালেন তারপর নিজ দায়িত্বে অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর কাছ থেকে ৩০০০ টাকা এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে আরো ৫০০০ টাকা ধার নিয়ে মোট ৮০০০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু কি হল তাতে ! মহাসাগরে দু-এক শ বালতি জল ঢাললে কি মহাসাগরের জল বেড়ে যায় ? আবার স্রোতের টানে অথবা ভাটার টানে কোথায় হারিয়ে যায় সব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের টাকা পেয়ে অনেক ঋণ পরিশোধ করলেন, দেনার হাত থেকে বাঁচলেন, কিন্তু অমিতব্যয়ী মধুসূদনের ঐ টাকায় হবে কেন! যার হৃদয় মহাসমুদ্রের মত দু এক শ বালতি জলে কি আশা মেটে, ঐ টাকা তাঁর প্রয়োজনে অতি অল্পই ছিল।

টাকা হাতে এলেই মধুসূদন রাজার মত চলতেন সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাস কে লিখলেন Europeanised হতে হলে অল্প বয়সে ইউরোপে আসতে হয়। (মনমোহন ঘোষ) মনু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশি বয়সে বিলাতে এসেছিল বলে খুব বেশি সুবিধা করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রথম সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল কিন্তু মনু উত্তীর্ণ হতে পারছে না, গৌর তুমি তো জানো হেনরিয়েটা ভালো বাংলা জানে তুমি তোমার পুত্র কে বাল্যকালেই ইউরোপে পাঠিয়ে দাও, হেনরিয়েটা ওকে তৈরী করে নেবে। বছরে মাত্র দু হাজার টাকা খরচ। এমন কি কবি ঠিক ও করলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ফ্রান্সেই রাখবেন, শর্মিষ্ঠা ও মিলটন পুরোপুরি ইউরোপীয় হয়ে উঠুক এটাই কবি চেয়েছিলেন। এত দুঃশ্চিন্তা অভাব যন্ত্রণার মধ্যেও কবি ফ্রান্সে থাকাকালীন বাংলা ভাষার জন্য বাংলা ভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী রচনা আরম্ভ করলেন, ইতালীর বিখ্যাত কবি ফ্রান্সিস্‌কো পেত্রাক-এর কবিতা ভীষণ মনোযোগ সহকারে পড়তেন, পেত্রার্কের অনুকরনে তিনি সনেট লেখা আরম্ভ করলেন।

ফ্রান্সে বসে যত চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট যা লিখেছেন বন্ধু রাজনারায়ণ কে তা পাঠিয়েছেন। সনেট লিখে তিনি খুব আনন্দ ও পেয়েছিলেন সেই আনন্দে ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি গৌরদাসকে লিখলেন—

You again date your letter from Bagirhat. is this Bagirhat on the Bank of my own native river? I have been lately reading petraca the italian poet, scribbling some sonnets after his manner there is one addressed to this Very river কবতক্ষ, এই পত্রের সঙ্গে চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন এবং গৌরদাসকে লিখেছিলেন এই সনেটগুলো যেন রাজা যতীন্দ্র মোহন. রাজেন্দ্র লাল মিত্র রাজনারায়ণ বস·কে

দিয়ে মতামত নেয়। বাংলা ভাষা যে কত শক্তিশালী ভাষা তা বার বার স্বীকার করে লিখলেন—Believe me my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education. Know little of it and have learnt to despise it, are miserable wrong, It is or rather it has the elements of a great language in it.

তিনি প্রায়ই বলতেন অর্থাভাব না থাকলে আমি বাংলা সাহিত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতাম—অর্থোপার্জনের জন্য তিনি বেশি সময় দিতে পারলেন না বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য, কবি আরো বললেন যে টুকু সময় দিয়েছি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য দেশবাসীকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সে দিন বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কবি বিদেশে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি, সে দিন বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন, মধুসূদন দত্তকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে। কবি লিখলেন—তাঁর, বিখ্যাত কবিতা—বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু ! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রীর হেম কান্তি অম্লান কিরণে
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় পায় সুবর্ণ চরণে,
সে জানে কতগুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ সদনে—!
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
। তরুদল, দাস রূপ ধরি
পরিমলে ফুল কুল দশ দিক ভরে;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

এত কাজের মধ্যেও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফ্রান্স থেকে এবার এলেন ইংলন্ডে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেবার জন্য, বিদ্যাসাগরের দয়ায় অর্থ কষ্ট কিছুটা দূর হয়েছে। সসম্মানে সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উর্ত্তীণও হলেন, সংস্কৃতবিদ পন্ডিত গোল্ডস্টুকার মধুসূদন কে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন .ংলা ভাষার জন্য, অধ্যাপকের পদটি অবৈতনিক হওয়ায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর গ্রেস ইন থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করলেন। ফ্রান্সে বসেই তিনি ব্যারিষ্টারী পাশের খবর

জানতে পেরেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে কবি বিদ্যাসাগর কে লিখলেন তিনি দেশে ফিরতে চান একা, দেশে ব্যারিষ্টারীতে যা আয় করবেন তার থেকে মাসে দু'শ তিনশ টাকা পুত্র কন্যা স্ত্রী কে পাঠাতে পারলেই চলে যাবে, পুত্র কন্যা ইউরোপীয় আদপকায়দায় মানুষ হবে। বিদ্যাসাগর কে সব কিছুই জানালেন,

কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন সপরিবারে দেশে ফিরে আসতে। তিনি বিদ্যাসাগরের কথা শুনলেন না। বিদ্যাসাগরের পাঠানো টাকা যথা সময়েই পৌছাল, বিদেশে স্ত্রী পুত্র কন্যা রেখে ১৮৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। জীবনের মূল্যবান পাঁচটি বছর অতিক্রম করলেন ইউরোপে। ইউরোপে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষার উন্নতির প্রচেষ্টাও করেছিলেন। চতুর্দশপদী কবিতাই তাঁর জীবনের শেষ সাহিত্য কীর্তি, বঙ্গভাষায় এর পর আর কোন সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই কবি বঙ্গ ভাষার নিকট শেষ বিদায় নিলেন—

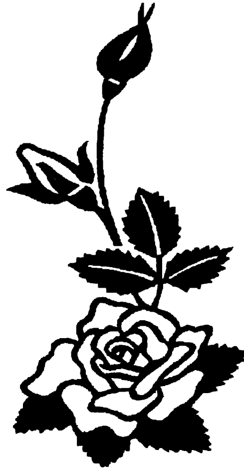
বঙ্গভাষাকে তিনি সম্বোধন করে লিখেছিলেন—

বিসর্জিব আজি মাগো, বিস্মৃতির জলে
হৃদয় মন্ডপ হায়! নিবাইল দেখ, হোমানলে
মনঃকুন্ডে, অশ্রুধারা মনো দুঃখে ঝরি!
শুকাইল দুরদৃষ্ট। সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধা মোদে অন্ধ এমন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম কর্ম! ডুবিল সে তরি
কাব্যনদে খেলাইনু যাহে পদতলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে
যদিও অধমপুত্র মা কি ভূলে তারে?
এতে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দুর বনে?
এই বর হে বরদে। জাগি শেষ বারে,—
জ্যোর্তিময় কর বঙ্গ ভারত রতনে"

কবি বলতেন—এই সব কবিতা লিখতে আমাকে ভাব আনতে হত না সহজ ভাবে শব্দ সংগ্রহ হতো লেখার মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর কে লিখলেন My dear Vid আমাকে তুমি প্রতি মাসে অন্ততঃ ৫০০ করে টাকা পাঠাও। আমার ইংলন্ডের খরচ ২৫০ টাকা এবং ফ্রান্সে আমার পরিবারের খরচ ২৫০ টাকা। বিদ্যাসাগর কে আরো অনুরোধ করলেন তুমি এত কম কম করে না পাঠিয়ে বরঞ্চ এক সাথে অন্ততঃ ৪/৫ হাজার পাঠাও, তাতে আমার অনেক সুবিধা হবে। দেশে ফিরে সব টাকা পরিশোধ করে দেব, বিদ্যাসাগরকে কবি ঘুনাক্ষরেও বুঝতে দেন নি ফ্রান্সে তার ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। চার চারটি সন্তানের পিতা হলেন কবি, হেনরিয়েটার আরো একটি কন্যা জন্মেছিল কিন্তু বাঁচে নি। দারুণ অভাবের মধ্যে

ছিলেন বলে কাব্যচর্চ্চায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। সনেট তিনি এই ফ্রান্সে বসেই শুধু লেখেন নি। মাদ্রাজে লিখতেন ইংরাজীতে কোলকাতায় লিখতেন বাংলায়। কবি হেনরিয়েটা সোফিয়াকে জীবন সঙ্গীনি করেছিলেন কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন নি। হেনরিয়েটার জীবনে এর জন্য প্রচুর হতাশা ছিল। মধুসূদনের মধ্যে তার দ্বিগুণ যন্ত্রণা ছিল কারণ আইনানুগ ভাবে রেবেকাকে ডির্ভোস করতে পারছেন না অথচ হেনরিয়েটাকেও বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই অশান্তির মধ্যে উভয়েই ভয়ংকর ভাবে মদ্যপান করতে লাগলেন। কথিত আছে ভার্সাই এ থাকাকালীন হেনরিয়েটার প্রতিদিন দু বোতল মদ লাগত, কবির কোন হিসাব ছিল না, আর বিদেশে থাকা সম্ভব নয়, পুত্র কন্যাকে রেখে তিনি একাই চলে এলেন দেশে। হেনরিয়েটা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ কোরল, সমুদ্র বক্ষ ভেদ করে জাহাজ ছুটল মাতৃভূমির দিকে।

—বিদায় ইউরোপ





স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইউরোপ থেকে পাঠানো

কবি শ্রী মধুসূদন দত্তের বিবিধ চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি, আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে,—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে[১],
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে,—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে,
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য নরাতঙ্ক— রক্ষেন্দ্র-নন্দনে[২],—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গৌপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে;)[৩]—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে[৪],
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি!—

২

কবি পের্ত্তাক

ইতালি, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে,—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরাকা কবি[৫] বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥[৬]

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ও রে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে!
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে![১] যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?-
বঙ্গ-হৃদ হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।।

[১] ভারত-সাগরে—মহাভারতরূপ সমুদ্রে। তিলোত্তমাসম্ভবের কাহিনী মহাভারত থেকে সঙ্কলিত।
[২] মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।
[৩] ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কথা বলা হয়েছে। [৪] বীরাঙ্গনা কাবে
[৫] ফ্রাঞ্চিস্কো কাব্যের কথা বলা হয়েছে। [৬] কবিকৃত মন্তব্য আছে এর পরে—"ফরাসী দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা![৮] বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি-অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মন্ডলে।।

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়[৯]-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী,[১০] ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভাগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।।

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নাম সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী;[১১]—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

৮

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা-সৌদামিনী ঘনে।[১২]
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

[৭] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ সীমার কবি। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলে কামিনীর যে চিত্র অঙ্কিত, বর্তমান সনেটে তাই-ই উপকরণরূপে গৃহীত।

[৮] অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদাদেবীর হরিহোড়ের গৃহ থেকে ভবানন্দ যাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন, এই সনেটের উপাদান সেখান থেকে সঙ্কলিত।

[৯] চন্দ্রচূড়— চন্দ্র চূড়ায় যাঁর, অর্থাৎ মহাদেব।

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়[১৩] অমৃত রসে রসনা সিকতি
আপনার স্বর্ণবীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, যার রূপ স্মরি!
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, ক'য়ো তারে, এ বিরহে মরি!

১১

গরুড়

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড়ে শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ চূড়া শিরে ও শ্যাম মুরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপে বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে হে প্রভু,
খগেন্দ্র[১৪] উপেন্দ্র[১৫]-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের[১৬] রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

১২

"বউ কথা কও"

কি দুঃখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী[১৭] কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে সে উপায়ে॥

[১০] ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক বৃত্তান্তে মহাদেবের জটাজালে গঙ্গার আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভগীরথের সাধনায় মুক্তির কথা আছে।

[১১] লঙ্কার অশোক কাননে সীতা আবদ্ধ এ খবর রামকে এনে দিল হনুমান। [১২] সৌদামিনী ঘনে—মেঘের কোলে বিদ্যুতের নৃত্য।

[১৩] কালিদাসের কবিত্বলাভ বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ।

[১৪] খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ গরুড়। [১৫] উপেন্দ্র—বিষ্ণু

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ[১৮] মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান সরোবরে[১৯]
(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে;
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে;—
সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!

১৪

সরোজিনী

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে![২০]
কামের নিকুঞ্জ এই! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে!
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে!
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে![২১]

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ[২২] উর্দ্ধাগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যাথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই; ওঠা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে।"

১৬

কবি

হে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তাপ শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

[১৬] কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষে স্থাপিত মণি।
[১৭] কোপবতী রমণী।
[১৮] বারিদ—মেঘ।
[১৯] মান-সরোবরে—মানস সরোবরে।
[২০] রাসপূর্ণিমায় ব্রজধামে কৃষ্ণের রাধা ও গোপীদের সঙ্গে প্রণয়লীলার প্রসঙ্গ।
[২১] নারীরূপের বর্ণনা
[২২] রোধে রুদ্ধ—প্রতিবন্ধকের দ্বারা বন্ধ।
[২৩] উন্মীলিত করে।

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেখ, মীলি,[23] ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালবাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীনা-তান অপ্সরার রবে!
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র[24] পবন আপনি!

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে,—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে,
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলমলে!
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী[25], স্বর্ণবীণা করে;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ,—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমন্ডলী যেন একত্রে গগনে!
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন ক'য়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

[24] বায়ু ইন্দ্র—বায়ুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গ্রীক কল্পনার ছায়পাত লক্ষণীয়।
[25] সরস্বতী।
[23] মৃদুভাবে, ধীরে ধীরে।

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে[২৬] অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মন্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মন্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ও লো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মন্ডলে[২৭]?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ও লো রসবতি?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বট-বৃক্ষ তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে[২৮]।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতুহলে
মলয়; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নুপুর, চঞ্চলে
নাচিছে; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে!
তুমিও লো কল্লোলিনী, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে!

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে

[২৭] প্রমদামন্ডলে-

[২৮] বৃষভ-বাহনে—মহাদেবকে।

মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি!
রাণী তুমি; নীচ আমি; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে; কহিবে সে কানে মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে!

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি! মৃদে, কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে?
বিষাদে মলয় কি লো কহ সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে!

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টলাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,
ভ্রম অসম্ভ্রমে[২৯] শূন্যে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে?
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মন্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবা মুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি;
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে,—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে।

[২৯] এখানে নির্ভয়ে।
[৩০] কৌরবেশ্বর—দুর্যোধন।
[৩১] পবন-পুত্র—ভীমসেন। পবনের ঔরসের কুন্তীর গর্ভে জন্ম।

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন!
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে,[৩০] মত্ত বাহুবলে;
দেখিনু পবন-পুত্রে,[৩১] ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে! [৩২] আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন[৩৩]—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব[৩৪]—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।[৩৫]
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।[৩৬]

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে
যথা ফোটে পারিজাত; যথায় উর্ব্বশী
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে।
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে[৩৬(১)]
সদা সদ্যঃ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে;
লও দাসে; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি ভাবি গো তোমারে!

[৩২] দুর্যোধন-ভীমের গদাযুদ্ধের প্রসঙ্গ।

[৩৩] কর্ণ—সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম।

[৩৪] গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনু। খাণ্ডবদাহনকালে অগ্নিদেব-প্রদত্ত।

[৩৫] কর্ণার্জুনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ।

[৩৬] মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনীর উল্লেখ। গোগৃহ-রণে বৃহন্নলার ছদ্মবেশী অর্জুন একাকী কৌরব পক্ষকে পরাজিত করেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে বিরাটরাজপুত্র উত্তরের ভীতির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে।

[৩৬(১)] আদর্শ গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদের জন্য একটি মাত্রা বেশি হয়েছে মনে হয়।

[৩৭] কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম কবির জন্মস্থান।

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে![৩৭]
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরের দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী?[৩৮]
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি?
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি!

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখী, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে!—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে!
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে[৩৯]
নির্দ্দয়; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি!
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি!—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি!

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি!
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব-ভবে বৃহস্পতি;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, ধনী করে হে তোমারে!

[৩৮] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী আছে। দেবী অন্নদা ছদ্মবেশে তার নৌকায় নদী-পার হয়েছিলেন।

[৩৯] (কবি-কৃত পাদটীকা "ফরাসীস্‌দেশে")

[৪০] কৃষ্ণপ্রেম-লীলার প্রসঙ্গ।

[৪১] রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের প্রসঙ্গ।

[৪২] মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ।

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে
পুরি বেণুরবে দেশ![৪০] কিম্বা শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি,[৪১]
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।[৪২]
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি!
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কূল প্রতি!
আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা; তুমি তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু সুভদ্রা সুন্দরি;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুন্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর[৪৩]! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্‌তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,[৪৪]
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি[৪৫] এ সঙ্গীত-ব্রতে!

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী[৪৬] বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই? ক[৪৭] মোরে,
কি সাদে[৪৮]
মোমের ভান্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত[৪৯] এ আয়াসে কি সুফল ফলে?
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

[৪৩] অগ্নি। [৪৪] দ্বৈপায়ন—মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। [৪৫] সমাপ্ত করে। [৪৬] তুমকী—তুম্বকী বা একতারা
[৪৭] ক—বল্। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাব। [৪৮] সাধে হওয়া উচিত।
[৪৯] পৌরাণিক উল্লেখ। অমৃতের অধিকার নিয়ে সমুদ্রমন্থনের পরে দেব-দানবের সংঘর্ষ বেধেছিল। বিষ্ণুর নির্দেশে ইন্দ্র চন্দ্রালোকের অমৃতভান্ড রেখেছিলেন দৈত্যদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?
কহ মোরে কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনী, না থাক লো তারে।
এ দেউ-ল বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো কবি বিস্মৃতি-আঁধারে?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণী, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমন্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?—
কোথা সে? কোথা বা নাম? ধন? লো ললনে?
হায়, যথা বিম্ব তব চল জলে!

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম[৫০] ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল? হরিল কে সে নরাঙ্গরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইতে রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচন্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি[৫১]? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

৪৪

কিরাত-আৰ্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন!
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী[৫২] মৃগরাজ গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে[৫৩] তোষ, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর!
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর![৫৪]

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে,—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে,—
এই রূপে ইহ লোক— শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময়[৫৫] জলে?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে[৫৬]

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?[৫৭]
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে[৫৭(১)]
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।

[৫০] বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের পুরী।
[৫১] প্রজ্ঞাবান—এই অর্থে।
[২] ছদ্মবেশধারী

তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজ[৫৮] দাস তোমার প্রসাদে;[৫৯]
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা কি প্রজা হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধ বহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ; হৈল দেব-বাণী;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা-বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ন মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজলিল বন রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধবী; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে![৬০]

৫০

সতী

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী,—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কান্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পাতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!

[৫৩] আশুতোষ—অল্পে সন্তুষ্ট মহাদেব। [৫৪] মহাভারতের আখ্যান এ-কবিতার উপাদান। [৫৫] ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ।
[৫৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত। [৫৭] মহাভারতের গোগৃহ-যুদ্ধের উল্লেখ। [৫৭(১)] অকিঞ্চন—নিঃস্ব, দুঃখী, সামান্য।
[৫৮] আজও। [৫৯] ফ্রান্সের নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যের প্রতি ইঙ্গিত।
[৬০] রামায়ণের উত্তর কান্ড থেকে এইটি এবং পরবর্তী সনেটের উপাদান সঙ্কলিত।

ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মুর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে জড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ- কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।[৬১]

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে!—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে!
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহ, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি[৬২] কোকনদ; বাসে[৬৩] কোকনদে
সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা ঃ মুক্তি গঙ্গা হ্রদে!

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম[৬৪] শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারি ভীষণে।
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ঃ উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি?"
আইল শবদ বহি স্তব্ধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুন্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,

[৬১] বাংলা শ্যামাসঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত "আগমনী-বিজয়া" প্রসঙ্গ থেকে এ-কবিতার উপাদান গৃহীত।
[৬২] চিরকালীন সৌন্দর্য। [৬৩] বাস করে। [৬৪] ভীষণ।
[৬৫] মহাভারতের 'গদাপর্বের'র অন্তর্গত ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ থেকে এ-কবিতার উপাদান গৃহীত।
[৬৬] মহাভারতের 'বিরাট পর্বে'র অন্তর্গত গোগৃহ-রণ থেকে কবিতাটির উপকরণ গৃহীত।
[৬৭] স্যন্দন—রথ। [৬৮] মৈনাক পর্বত ও ইন্দ্রের বিরোধের পৌরাণিক উল্লেখ।

উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল, পড়িল ভূতলে॥[৬৫]

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি![৬৬]
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী;—"চালাও স্যন্দনে[৬৭]
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির পাল তেজে ভয় পেয়ে মনে![৬৮]—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

৫৬

কুরুক্ষেত্র

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।[৬৯]

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি,—দেখিনু সে স্থলে
রূপস[৭০] পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর[৭১] শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি
কি দেব, কি নর উভে জর জর করি!
"কামাদেব অবতার রস-কূলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

৫৮

সুবদনি

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি[৭২] কেশরী;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দন্ড লো অধরে;
মুহুর্মুহুঃ ভুকম্পনে অধীর লো করি!—
এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ম অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে!—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

[৬৯] মহাভারতের 'দ্রোণ পর্বে' অভিমন্যুর মৃত্যু প্রসঙ্গ থেকে বিষয় গৃহীত। [৭০] রূপবান। [৭১] টুপি।
[৭২] সুমিত্রার পুত্র—লক্ষ্মণ। [৭৩] সুভদ্রা-অর্জুনের প্রণয়মিলন প্রসঙ্গ মহাভারত থেকে গৃহীত।
[৭৪] মহাভারতের বনপর্ব থেকে গৃহীত। [৭৫] ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান প্রসঙ্গটি মহাভারত থেকে গৃহীত।

৫৯

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী-রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরি
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী!
শিহরি জাগিল পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে,—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।[৭৩]

৬০
উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। " কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা মিনতি চরণে?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"[৭৪]

৬১
রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারিদিকে বন যেন ভূকম্পনে;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে!
কহিলা মা,—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

৬২
দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে;
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মানাগ্নি নিবানু আমি আজি ও আহবে
বর্ব্বর!—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"[৭৫]

৬৩
হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—

[৭৫] মহাভারত থেকে এইটি এবং পরবর্তী কবিতার বিষয় সঙ্কলিত।

[১] বৈতালিক—স্তুতিপাঠক, বন্দী।

গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গন্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে!
দীর্ঘ তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।[৭৩]

৬৪

অবলা

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে; রকত -নয়নে
ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃস্বরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর-ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে;—
"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে!"
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম চিল ওই; সফরীর গতি
দাসীর! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে।"

৬৫

উদ্যান পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি!
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসর রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে, চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে[৭৪] তোর পিক-কুল-পতি;
ভ্রমর গায়ক; নাচে খঞ্জন, ললনে।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্দু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মন্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংশ-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্মতর বিষধর অরি নর-কূলে।
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

[৭৮] মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে—অগ্নি-জ্বালা সহ্য করে ধূপ যেমন গন্ধ বিতরণ করে এবং মুগ্ধ করে।

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক' মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি।
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে![৭৮]

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে!
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে,
বাসন্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরকভবে!) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে!

৭০

ইন্দিরা সুন্দরি

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি: তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
সে কানন, যদ্যপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরী,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে,—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে!

[৭৯] বয়েসের হাসে—অধিকবয়স্কার হাসিতে। [৮০] বেয়ে। [৮১] দিনে।
[৮২] খেয়ে। [৮৩] অজাগর—অজগর হওয়া উচিত। [৮৪] এই বিশ্বাস কাল্পনিক।
[৮৫] রাজা পুরুরবা কর্তৃক কেশী দৈত্যের বিনাশ-সাধন এবং উর্বশীর উদ্ধার পৌরাণিক কাহিনী।
[৮৬] জীবৎকালে।
[৮৭] ছয় চন্দ্র—শনিগ্রহের ছয়টি উপগ্রহ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে আটটি।
[৮৮] কটি-বন্ধ। [৮৯] গুমর—গর্ব

৭২

ভাষা

"O matre pulchra-Filia pulchrior!"

Hor.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা!—
মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?—
বীণার রসনা মূলে জন্মে কি কুধ্বনি?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে[৭৯]?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি!
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

৭৩

সাংসারিক জ্ঞান

'কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে[৮০]
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন? দেবে[৮১] অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,[৮২]
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে!'—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদে ভজে, মা ভারতি।

৭৪

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে[৮৩],
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে;[৮৪]
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে![৮৫]
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন হে, মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান? জিজ্ঞাসা সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী;
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্ব্বশী!
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

৭৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষার জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে[৮৬] তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,

[৮০] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। প্রথম ভারতীয় আই.সি. এস্.।

[৮১] মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনের স্বর্গবাস, দেবশত্রু অসুর-নিধন, বহু দিব্যাস্ত্র লাভের প্রসঙ্গ।

[৮২] কৃষ্ণ-বিদ্বেষী শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকাল কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। মহাভারতীয় উপাখ্যান থেকে এ-কবিতার উপাদান সঙ্কলিত।

[৮৩] যন্ত্রণা দিয়ে।

মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি!
ছয় চন্দ্র[৮৭] রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন[৮৮], যেন আলোক-সাগরে!
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে!-
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরি, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে আস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে[৮৯] বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৯০]

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কূল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পূণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে;[৯১] তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে!
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!—

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কূলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল![৯২] কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি!
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান করে
সে ক্ষেত্রে; তোমায় ক্ষণ যাতনি[৯৩] তেমতি
আজি, তীক্ষ্ম শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

---

[৮৬] দান্তে-ইতালীয় বিখ্যাত কবি দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে এই কবিতায়।
[৮৭] মহাকবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' নামক কাব্যে বিস্তৃত নরক-বর্ণনা আছে। এখানে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে।
[৮৮] থিওডোর গোল্ডস্টুকর—ইংলন্ডের অধিবাসী সুখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।
[৮৯] দেবদৈত্যের সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে?—
কিম্বা, দেহ কারাগারে তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভালবাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে॥

৮১

অর্থ

ভোবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে,—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চরি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রে তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

৮২

কবি গুরু দান্তে[৯৪]

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভবনে
অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।[৯৫]
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

৮৩

পন্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডষ্টুকর[৯]

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস[৯৭], তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমার আদরে;
বদরিকাশ্রম[৯৮] হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

[৯৬] মহাভারত থেকে এইটি এবং পরবর্তী কবিতার বিষয়

[৯৮] কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস এই আশ্রমে বাস করতেন।

[৯] টেনিসন—বিশিষ্ট ইংরেজ কবি।

[১০০] শ্বেতদ্বীপ—ইংলন্ড।

[১০১] ভিক্তর হ্যুগো—বিশিষ্ট ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক।

[৯২] মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে কবিতাটি রচিত।

৮৪

কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্[৯৯]

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ?[১০০] ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্দেবী? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো[১০১]

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে!
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে!
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে,
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যের তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যর রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে!
এত দিনে প্রভাতিল সুখ-বিভাবরী;
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বাসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,

[১০৩] Filicaia —ইতালীয় কবি। স্বাজাত্যবোধক সনেট রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন।
[১০৪] অমতৃত আসারে—অমৃতধারায়। [১০৫] চেতাইবি—চেতনাদান করবে। [১০৬] শুক্লকে-শুক্লপক্ষে।

নাদি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদ রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

৮৯

হস্তিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু[১০২]

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে!
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে!—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিলে বিষাদে।

৯০

ভারত-ভূমি

"Italia! Italia O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza!"

FILICAIA[১]

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"
কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূর বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনি
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি!
কার শাপে তোর তরে, ও লো অভাগীনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধাতিত অতি?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধু-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেঘলা-রূপে পরিলা সাগরে।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?

[১০৭] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি সদাগরের প্রসঙ্গ আছে। এই কবিতার বিষয়বস্তু সেখানে থেকে গৃহীত।
[১০৮] মাছরাঙা।
[১০৯] পদ্মা—পদ্মাবতী, চণ্ডীদেবীর সহচরী।

বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে[১০৪]
চেতাইবি[১০৫] মৃত কল্পে? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে[১০৬] ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

৯৩

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভাবতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে,
অধরে অমৃত-সুধা; সৌদামিনী হাসে,
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধবে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে?

৯৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ —
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপন ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি!
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর[১০৭]

——"শ্রীপতি——————————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর॥"
চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক[১০৮] ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে,[১০৯] কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর,[১১০] সখি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লানাব ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া[১১১]

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে!—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা। কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সব গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,

[১১০] লক্ষেব টোপব—লক্ষ টাকা মূল্যেব টুপি বা পাগড়ি।
[১১১] কোন্ পুস্তক গবেষকগণ আজ পর্যন্ত স্থিব কবতে পাবেন নি।
[১১২] কুৎসিত। [১১৩] কমনীয়।

সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ[১১২] ভূষণে?-
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম-পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম[১১৩] রূপ ধরি?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,[১১৪]
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কাবে লয়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তাপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধবে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

১০০

শকতি

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি,
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।[১১৫]

---

[১১৫] পত্নী হেনবিয়েটাকে লক্ষ্য করে লেখা।

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মোর-ভবনে
লো আশা!—নিদ্রার কেলি[১১৬] আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বলে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি।)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইলে দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ[১১৭] ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

[১১৬] খেলা।
[১১৭] ইন্দ্রপ্রস্থ—কর্মস্থল, খ্যাতির ভূমি অর্থে ব্যবহৃত।

না পাওয়ার যন্ত্রণা, খেদ, অপমান, অভিমান, মাত্রাতিরিক্ত প্রেমের আবেগ, করুণ রসের ধারাকে নিয়েই কবির প্রায় সকল সৃষ্টি, বীর রসকে আকড়ে ধরেছিলেন কবি, বলেও ছিলেন গাহিব মা বীর রসে ভাষি মহাগীত, না তা পারলেন না, তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যে করুণ রসের লীলা পরিপূর্ণ।



রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর

নানা কবিতা ও বাল্যরচনা এবং গীতি কবিতা

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥



প্রস্তাবনা

রাগিণী খাম্বাজ; তাল মধ্যমান

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়!
শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর,
হইল, হইল, ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগো মা গো,
বিভু স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥

উপসংহার

রাগিণী বসন্ত, তাল ধীমা তেতালা

শুনে হে সভাজন!
আমি অভাজন,
দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে,
ভয় হয় দেখে শুনে,
পাছে কপাল বিগুণে,
হারাই পূর্ব্ব মূলধন!

যদি অনুরাগ পাই,
আনন্দের সীমা নাই,
এ কায়েতে একাযাই
দিব দরশন!*

* 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম সংস্করণে ছিল। তৃতীয় সংস্করণ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে।

গীতিকবিতা

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভাব প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কন্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে।

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীরব,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর্!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকে-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good night!"
—Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো, তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, —নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,

তিষ্ঠ ক্ষণকাল

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে,—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি!
করি যদি কেকাধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর ভূচর জন্তু,—মরি, মা, শরমে!
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে!
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে;
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে;
নীরবে থাকি, মা, আমি; রাগে হিয়া জ্বলে।
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।"
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে;—
"পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে!
চন্দ্রক কলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে!
আখন্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে!
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি;
করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে!
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে?"
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন্ জন?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে,—
"অপরূপ রূপ তব, মরি!
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা?—কহ গুণমণি!
হে নব নীরদ-কান্তি,

ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি
জুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি!
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি!
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি; কি ছার যুবতী?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি!
কুড়াইয়া কুসুম-রতনে
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,'

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!
যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান? ধিক্ চন্দ্রাননে!"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলে আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নব দূর্ব্বাময় দেশে,
বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে
শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।

বড়ই সুন্দর স্থল,
অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু লতা, ফল, ফুল,
বন-বীণা অলিকুল;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া,
পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে,
পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি॥

২

কিছুদিনে উজ্জ্বল নয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়,
যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বের কহে মনে মনে;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই,
শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই॥'

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার,
আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার;
খাইল অনেক ঘাস,
কে গণিতে পারে গ্রাস?
আহার করণান্তরে
করিল পান নির্ঝরে;
পরে মৃগ তরুতলে
নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে;
দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল॥

৫

নিদ্রা ভঙ্গে মৃগবর
কহিলা, 'ওরে বর্ব্বর!
কে তুই, কত বা বল?
সৎ পড়সীর মত
না থাকিবি, হবি হত।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন
ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়,
ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত॥

৮

কহিল তুরঙ্গ,—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী;
না চাহিল অনুমতি,
কর্কশভাষী সে অতি;
হও হে সহায় মোর,
মারি দুই জনে চোর॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা,
কহিলা, "হা! এ কি বিড়ম্বনা!
জানি সে পশুরে আমি,
বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে,
দগ্ধে বন বিষশ্বাসে;
একমাত্র কেবল উপায়;—
মুখস ও মুখে পর,

পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি,
করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায়।।”

১০

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কন্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়।।

১১

কোথা অরি, কোথা বন,
সে সুখের নিকেতন?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী;
ছায়া সম জয় যার ধর্ম্মের সংহতি।।

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে বিমন্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি, নানা দেশ সুখে,
হেরি, বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুক্তা, মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দুখানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি!
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,—
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে, শুনি ত্রিদিব-ঈশ্বরি!
‘বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
‘পত্নী আসে দেখ তার পিছে।’
সুধাংশুর অংশরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দূল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে;
পথিকের অর্থ অপহরে,

কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা-জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্ট চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায়;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা?

রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।"
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
এই ধন নিও পরে বাঁটি
তস্কর দলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড় করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।

সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন,—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল;—
"ঠোটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?'
বণিক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুই নাই!"
হাসিল কুক্কুটগুনি,—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি,—কি আছে তুলনা?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোসাঁই!"
এই কয়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নর-কূলে পশু বলি লোকে তারে মানে,—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচল,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভিরে শৈল দেব দিবাকরে;—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।।"
কহিলা হাসিয়া ভানু,—"তুমি শিষ্টমতি;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"
মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ;
তাপিল উত্তাপে মহী; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল;
প্রাণিকুল ভয়াকুল;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল;
কমলিনী কেবল হাসিল!
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি! সহসা
আসি উতরিল;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল!
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"
হাসি উত্তরিল শৈল;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ!
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে; হাস যদি, হাসে;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে;—
ভানু পলাইল ত্রাসে;
তা দেখি তড়িৎ হাসে;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহল জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি!
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে;—
কেহ আসে, কেহ যায়;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায়;
ত্রস্ত লোভে সবে;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল,—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি!
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"
রোষে উত্তরিলা ঘনবর;—
"অপরে নির্ভর যার অতি সে পামর!
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি;
ধরার এ ধার ধারি।
এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।
নিজে তিনি হীন-গতি;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা—
তোমরা কাহারা?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল?
পাখা দিয়াছেন বিধি;
যাও, যথা জলনিধি;—
যাও, যথা জলাশয়;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"
চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ সদা নিজ পরিশ্রমে,
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা,—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজনিকেতনে
অতি হৃষ্ট মনে।
শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল;
কি ভেট, কি উপহার,

কি পানীয়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল,—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে?—
ফিরে যে আসিছে তার চিহ্ন কে মুছিল?"
চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল!
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই?—
সম্মুখ সমর কর্; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয় ডালি
দিয়াছে এ দেশে কবি।"

কহে মশা;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে;
ধিক, দুষ্টমতি!
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদে দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল!
মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা-রণে;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহুঃ নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

সনেট ও সনেটকল্প কবিতা

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,

এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন
অশন, শয়ন ত্যাজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে, নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী
নিজ গৃহে ধন তব তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?"

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া আনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজালিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রনীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)
হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের তীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে

* পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে লিখিত।

খ্রীষ্টদাস, লভো নাম আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিতে শতরত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;— পঞ্চকোট— ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট-গিরি বিদায় সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুল লক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—
ভেবেছিনু হায়! দেখি ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

কোন বন্ধুর প্রতি

এ ধারার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার করপদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
জননী ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
এ কথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা

অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা; কে জানে,
কোন কুলে কোন স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন; এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হাণে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

অসমাপ্ত কবিতা

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ

বিহার

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে
মেখলা লো কটিদেশে
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী।।
লেপ সুচন্দন দেহে,
কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী।।

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির[১]
ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে মেলা, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী—
সম রূপে, লো কামিনি,
গলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে।।

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি,
শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কোন্ মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে।।
দেব-দৈত্য মিলি বলে,
মথিলা সাগর-জলে[২]

[১] শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির—ময়ূরপুচ্ছ শোভিত শির।
[২] দেব-দৈত্য সমুদ্রমন্থন করে অমৃত তুলেছিল। এটি পৌরাণিক উপাখ্যান।
[৩] বিম্বাধর—যার ঠোঁট তেলাকুচার মত লাল।
[৪] ভাঁজ করে।
[৫] অন্ধ করব।
[৬] কিরণরাশি।
[৭] পৌরাণিক বিশ্বাসমতে চাঁদ রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলীর স্বামী।
[৮] পর্য্যঙ্ক—খাট।
[৯] পবনের রিপু—বায়ু ও জলপতির নিত্যসংঘাতের কল্পনা গ্রীক পুরাণের প্রভাবজাত।

যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি।
সুধামাখা বিম্বাধরে[৮],
আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

বীরাঙ্গনা কাব্য

(বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য কবি কয়েকটি পত্র-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হল।)

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর। আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া[৪] তাহে, সাত বার বেড়ি
অম্বিব[৫] এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা;
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে।

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি[৬] দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি[৭],
চারু চন্দ্র; তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি? যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে[৮] সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু[৯]
(যবে ঝড়াকারে, তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে;
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর![১০] পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে। এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা

তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি,[১১] জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে, এ দেশে নাথ, রবি কররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর[১২]; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মখি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।[১৩]

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাথে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদভী[১৪] আজি তোমার চরণে।

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহুঃ দংশে আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মরিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লক্ষ-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,

[১০] যদুবর—অনিরুদ্ধ যদুবংশের সন্তান।
[১১] সৌরি—বিষ্ণু।
[১২] দামোদর—বিষ্ণু।
[১৩] পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
[১৪] বৈদভী—বিদর্ভদেশীয় রাজকন্যা।

অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চন্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীরপরাক্রমে!
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি!
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

ভারত-বৃত্তান্ত
দ্রৌপদীস্বয়ম্বর*

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি করে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য! আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ পণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি

* কবি শিরোনামে স্থান ও তারিখ উল্লেখ করেছেন—VERSAILLES, 9th September, 1863

কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এতদিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

মৎসগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু -চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি; না জানি কি করে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে!—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগ্ধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রণীরে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার।—কি ভাগ্য?
কে জানে?"

কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি

এত যত্ন? কারে কব এ দুখে কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা! দুকূল সাড়ী তিনি গলগলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে!
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
যায় যদি মান, যাক্! আর কি তা আছে?"
ইত্যাদি।

পাণ্ডব বিজয়

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ;— সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চপুলশরে।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেহ, দেব, দেখ চেয়ে", কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি!
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
যে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরুরণে!
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি,—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি;—
সেই বাল্যসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেতা দুর্য্যোধন আজি?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক— রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে?
নির্ব্বা পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি!
ভস্মমাত্র! এ যতন বৃথা কেন তব!"
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে, যে কালে
অক্রমেন যমরাজ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,

সম ভয়ংকর প্রভু, সে ভীম মুরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি!—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে!
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে।
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত!
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ—
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ। দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পান্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা;—দেখ মহামতি!"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে।
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পক হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে।

দেবদানবীয়ম্
মহাকাব্য
প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে।।



মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, K.C.S.I.

জীবনের কিছু কিছু স্মরণীয় ঘটনা

বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কাছে একদা ধমক খেয়েছিলেন, শিষ্টাচার ভদ্রতা সম্পর্কে উপদেশও পেয়েছিলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্র আজ হাকিম, কলকাতার নিকটবর্তী বারুইপুরে।

হাকিমের এজলাস আজ ভীড়ে উপচে পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ হাকিমের এজলাসে ঢুকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কৌশুলী সদ্য পাশ করা ব্যারিস্টার, সবে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছেন। সে কালে তো এত পণ্ডিত মানুষ খুব একটা দেখা যেত না। তারপরে আবার বিলাত থেকে পাশ করা ব্যারিস্টার। কিছু কিছু সংবাদপত্র আবার মহাকবি আখ্যা দিয়েছে। তাছাড়া ছাত্রগণ তাদের পাঠ্য পুস্তকে এই ব্যারিস্টার কবির কবিতাও পড়েছে। এমন পণ্ডিত কবি ব্যারিস্টারকে কে না দেখতে চায়।

তাই আজ হাকিমের এজলাসে এত ভীড়। হাকিমের বয়স এমন কিছু নয়। তিরিশ একত্রিশ এর মত হবে। পরনে চোস্তা চাপকান, হালকা চেহারা, সামান্য রোগা বলে লম্বা মনে হয়, নাক চোখ মুখের মধ্য দিয়ে একটি পবিত্র চিহ্ন ফুটে উঠেছে হাকিমের। হাকিমের ওপরের ওষ্ট একটু মোটা, মাঝখান দিয়ে সিঁথি। হাকিম কম কথা বলেন একটু গম্ভীর। যে কোন উকিল তাকে দেখলে প্রথমটা একটু ভয় পাবেন। হাকিম-এর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অনেকেই জানেন। তাছাড়া হাকিম এরই মধ্যে প্রায় দুইখানি উপন্যাস লিখেছেন, একটি উপন্যাস হাকিম এখানে থাকতে থাকতেই লিখেছেন। কিন্তু এজলাসে এত ভীড় হয়েছে, কি হাকিমকে দেখার জন্য? না ব্যারিস্টারকে দেখার জন্য? হাকিম তো এখানে রোজ বিচার করেন, তবে রোজ তো এমন ভীড় হয় না। আজ তিলধারণের জায়গা নেই কেন? হাকিম জানেন না তাঁর এজলাসে এত ভীড় কেন।

সাধারণ মানুষের কানে সংবাদ পৌঁছে গেছে আজ এজলাসে বাঙালী ব্যারিস্টার মামলার ব্যাপারে আসছেন। ব্যারিস্টার এজলাসে ঢুকলেন, ব্যারিস্টারের পোশাক বিলাতী ঢঙের। আপাদমস্তক বিলাতী কায়দা হাঁটাচলা এমনকি বসাটুকুও দর্শকদের বুঝতে আর কষ্ট হল না। ইনিই সেই ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার হাকিমের থেকে একটু মোটা, বয়সেও হাকিমের থেকে অনেক বড়। মাথার চুল পূর্বের ন্যায় অনেক কমে গেছে। তবে চুলের পারিপাট্য দেখলে মনে হয় চুলের প্রতি আছে বিশেষ যত্ন। মাঝখান থেকে সিঁথি, নাকটা একটু মোটা কিন্তু দর্শনীয়। রং সামান্য কালো, উজ্জ্বল এবং উদার চক্ষু। হাকিম সোজা চেয়ারে বসে পড়ে, টেবিলের উপরেব কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন। কৌশুলী ব্যারিস্টার সাহেব ভাঙা গলায় ইংরাজীতে অনর্গল কবিতার কোটেশন দিয়ে বক্তৃতা করেই চলেছেন। উৎসুক জনতা অধীর আগ্রহে তা শুনছেন। ব্যারিস্টার অভিনেতাদের মত সুন্দরভাবে অনর্গল ইংরাজী বলেই চলেছেন। হাকিম অধোবদনে তা শুনেই চলেছেন। হাকিম এর আগে এমন সুন্দরভাবে কোন ব্যবহারজীবীর কাছ থেকে এমন সুন্দর বক্তব্য শোনেন নি। মাথা নিচু করে কাগজপত্র দেখছেন আর গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্যারিস্টারের বক্তব্য শুনছেন। হাকিম কিছুটা বিস্মিত অবাক। হাকিমের মনের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হল। তিনি কাগজ থেকে চোখ তুলতেই তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

হাকিমের মুখে কথা নেই, মুখমন্ডলী রক্তিম হয়ে উঠল, নয়ন স্থির। মুহূর্তের মধ্যে হাকিম এজলাস, আদালত, বিশাল জনতা সব ভুলে গিয়ে নয়ন স্থির করে রাখলেন। ব্যারিস্টারও উজ্জ্বল নয়ন হাকিমের দিকে লক্ষ্য করে স্থির করেছিলেন। একি অদ্ভুদ মিলন।

চারখানি চোখ যেন এক লক্ষ্যে নিস্তব্ধ হয়ে রইল মুহূর্তের জন্য। অজস্র জনতা তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি

করল। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হাকিম আর কোন কথা বলতে পারলেন না। নিজের চেয়ার থেকে নেমে সোজা চলে গেলেন ঘরে। ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মর্যাদার সঙ্গে যোগ্যস্থানে বসিয়ে বললেন আপনাকে দেখবার জন্য এজলাসে ভীড় উপচে পড়েছে। অজস্র জনতা একই সঙ্গে দেখতে পেল ব্যারিস্টার কবি ও সাহিত্যিক হাকিমকে। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র বললেন আজ আমি ধন্য আপনার পদধূলিতে। একদিন আপনি আমাকে ধমক দিয়েছিলেন শিষ্টাচারের অভাবের জন্য। ছোট্ট বেলায় আপনাকে দেখবার জন্য, আপনার গ্রন্থ পাঠ করবার জন্য কতই না ব্যাকুল হতাম। আপনার উপস্থিতিতে সমগ্র বরুইপুর উল্লসিত।

● কবি মধুসূদন দত্ত বোধকরি আমাদের দেশে প্রথম সিগারেটের ব্যাপক প্রচলন করেন। কবি নিজে উত্তম কাগজে উত্তম তামাক সহযোগে সিগারেট বানিয়ে খেতেন।

● মহারাজা সতীশচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে কবি একটি আরামকেদারায় বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পদ রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে একখানি প্রাচীন পুঁথি পাঠ করছিলেন। কবির চোখে থাকত অত্যন্ত মূল্যবান স্প্রিং-এর চশমা, যা কবির সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করত। দূরে মহারাজার ভাগিনেয় শ্যামমাধব কবিকে এক দৃষ্টিতে দেখছিল, প্রতিভাবান মানুষ দেখার জন্য সকলেই ব্যাকুল হয়। হঠাৎ করে পুঁথি থেকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই দেখলেন এক যুবক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কবি যুবকটির আপাদমস্তক দেখে কিছুটা বিস্মিত, চুল ছাঁটা ও চুলের বাহার অতিব উত্তম। কবি জিজ্ঞাসা করলেন ওহে ছোকরা, তোমার চুল কে কেটেছে? কবি পরিষ্কার বাংলায় বললেন। যুবকটি উত্তর দিল কার্টার। কবি হাসলেন এবং বললেন তুমি বাংলা জানো না? তোমার তো ইংরাজীতে বেশ জ্ঞান আছে। যুবকটি গর্বিত হলে কবি বললেন দুই তিন রকমের ভাষা দিয়ে কথা বলতে নেই। তার অর্থ হল তুমি কোন ভাষাই ভালভাবে শেখোনি। যখন ইংরাজীতে কথা বলবে তখন সেখানে বাংলা ঢোকাবে না। যখন বাংলাতে বলবে তখন ইংরাজী ঢোকাবে না। বাংলাতে কথা বলতে বলতে একটা দুটো ইংরাজী বললে কি ভাব তুমি অনেক পণ্ডিত। অভ্যাস ত্যাগ কর। এমন সময় মহারাজা উপস্থিত হলে কবি জিজ্ঞাসা করলেন যুবকটি কে? মহারাজা বললেন আমার ভাগিনেও শ্যামমাধব। কবি শ্যামমাধবের গায়ে হাত চাপড়ে বললেন মহারাজাকে, ওকে ভাল ভাবে তৈরি করুন ইংরাজীতে।

● কার্যোপলক্ষে কবিকে নানা স্থানে যেতে হত। গেলেন হুগলী আদালতে, গৌপীকৃষ্ণ গোস্বামীর আমন্ত্রণে থাকলেন তাঁর উদ্যানভবনে। নানা শোভায় শোভিত উদ্যানভবন; বেশ কিছু দিন কাটালেন সেখানে। গোপীকৃষ্ণ মহাশয়ের দুই পুত্র কবিকে বিলক্ষণ চিনত। পুত্রদ্বয় পড়াশুনা করত হুগলী কলেজে। ঘটনাক্রমে কবির সঙ্গে ওদের দেখা হল। কবি সহজে কারো সাথে উপযাজক হয়ে কথা বলতেন না। হুগলী আদালতের কাজ শেষ করে ট্রেনে করে ফিরছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রদ্বয় বাংলা ও ইংরাজী মিশিয়ে নানারূপ আলাপ আলোচনা করছিল। কবি পাশেই উপবিষ্ট। আলোচনা বেশ জোরদার ভাবে চলছে। ধনীর ছেলে নিজেদেরকে একটু সাধারণের থেকে ভিন্ন মনে করত। কবিকে দেখেই তারা ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে আলোচনা করছিল। তারা বোঝাতে চাইছিল কবিকে যে তারা ভাল ইংরাজী জানে।

তাঁদের আলোচনায় কবি বড়ই বিব্রত বোধ করছিলেন। বাধ্য হয়ে কবি তাদেরকে বললেন তোমরা এখনো ইংরাজী শেখো নি। ভালোভাবে ভাষা না শিখে আলোচনা করতে নেই, তাতে সম্মান নষ্ট হয়। পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের পরিচয়ও পেয়ে গেলেন। পুত্রদ্বয় বলল আপনি তো আমাদের উদ্যানভবনে আছেন, আপনাকে আমরা বিলক্ষণ চিনি। আমার বাবার নাম গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী। কবি তাদের নাম জিজ্ঞাসা করায় বলল আমরা দুই ভাই কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল। কৃষ্ণলালের ভাষার দুর্বলতা দেখে বললেন তোমার বাবাকে বল আমি এক ঘন্টা করে ইংরাজী শিখিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই বলল আমরা বহুদিন ধরে একজন ইংরাজী শিক্ষক খুঁজছিলাম। আপনাকে কত টাকা দিতে হবে? কবি বললেন

পাঁচশত টাকা। কৃষ্ণলাল কবির কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন পাঁচশত টাকা! মাসে পাঁচশত টাকা তো সাধারণ ব্যাপার নয়। কবিও কৃষ্ণলালের দিকে তাকিয়ে বললেন ওহে ছোকরা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও সাধারণ ব্যক্তি নয়।

● হুগলী আদালতের কাজ শেষ করে ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসেও শান্তি নেই। আবার চলে যেতে হল কার্যোপলক্ষে পুরুলিয়া। পুরুলিয়াতেও বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। সেই সময় পঞ্চকোটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পঞ্চকোটের মহারাজা বাহাদুর তাঁর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখে বিশেষ চিন্তিত। তাঁর পারিষদ বর্গগণ রাজাকে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়ে অতিষ্ট করে তুলত। এমনকি সামান্য একজন ক্ষৌরকারও (নাপিত) প্রভাব বিস্তার করেছিল রাজার উপর। রাজাও ঐ ক্ষৌরকার এর বুদ্ধির কাছে বন্দী। রাজা স্পষ্টই বুঝতেন তবে কিছু করার নেই। কারণ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ভয়ংকর অবনতি, তদুপরি যদি পারিষদবর্গকে চটান তাহলে সর্বনাশ। রাজা মনে মনে খুঁজছিলেন একজন দেওয়ান ম্যানেজার। রাজা শুনলেন মধুসূদন পুরুলিয়াতে এসেছেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই রাজা কর্মচারীদিগকে অশ্ব, হস্তি, পালকি নিয়ে মধুসূদনকে পুরুলিয়ায় আনার ব্যবস্থা করতে বললেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই রাজ কর্মচারীবৃন্দ যখন পুরুলিয়ায় পৌছান তার আগেই কবি কলকাতায় পাড়ি দিয়েছেন।

এদিকে পঞ্চকোটের রাজা কবিকে দেখবার জন্য এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন যে কলকাতা থেকে কবিকে রাজা পঞ্চকোটের আনবার ব্যবস্থা করলেন এবং দেওয়ান ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন। যদিও সে সময় কবির চাকরির প্রয়োজন ছিল।

পরিবার পুত্র কন্যাকে কলকাতায় রেখে তিনি প্রায় ৭/৮ মাস পঞ্চকোটের রাজার অধীনে চাকরি করেছিলেন। রাজ্যের অবস্থা দেখে কবি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এবং কড়া হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু পারিষদবর্গের এতে দারুণ অসুবিধা হচ্ছিল। কবির বিরুদ্ধে পারিষদবর্গ নানারূপ ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছিল। পারিষদবর্গ নিজেরা না কিছু করে ঐ নাপিতের মাধ্যমে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলেন। ঐ ক্ষৌরকার আবার রাজার স্নেহভাজন ও মন্ত্রণাদাতা।

কবি বরাবর সুগন্ধযুক্ত রুমাল ব্যবহার করতেন। কেউ ঘরে ঢুকলে কবি পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে দিতেন, রুমালটি দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বলতেন। ঐ রুমালের সুগন্ধ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপৃত হত। একদিন রাজা কর্মচারীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন নতুন দেওয়ান ম্যানেজাব সাহেবকে তোমাদের কেমন লাগছে? কাজকর্ম কেমন পরিচালনা করছেন? কর্মচারীগণ বিশেষ কিছু বলল না। উক্ত ক্ষৌরকার রাজার সামনে এগিয়ে এসে বলল, এমন ম্যানেজার এর আগে আমরা কখনো দেখি নি মহারাজ। রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, অত্যন্ত উপযুক্ত মানুষ। বিশেষ ভদ্রলোকও বিশেষ জ্ঞানী। তবে সাহেব একটি অন্যায় কার্য করছেন বরাবরই। রাজা অত্যন্ত কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অন্যায়? ক্ষৌরকার বলল—মহারাজ! আপনার গাত্র নাকি দুর্গন্ধময়। রাজা ক্ষৌরকারের কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বললেন প্রমাণ করতে পারবে?

ক্ষৌরকার বলল, নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেব। ক্ষৌরকার রাজাকে বলল আপনি আমার সঙ্গে সাহেবের ঘরে চলুন, দেখবেন আপনি ঢোকা মাত্রই সাহেব নাকে রুমাল দেবে। রাজা প্রমাণ করবার জন্য ক্ষৌরকারের সঙ্গে রাজা সাহেবের ঘরে ঢুকতেই সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আসুন মহারাজ। মহারাজ বললেন কিছু আলোচনার জন্য এসেছি। সাহেব পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে মুখে লাগিয়ে কথা বলতে লাগলেন, রুমাল দিয়ে নাকটা প্রায় ঢাকা আছে। পিছন থেকে ক্ষৌরকার রাজাকে ইঙ্গিত করে জানাল ঐ দেখুন মহারাজ আপনার পারিজাত সুবাসিত গাত্র দুর্গন্ধময় ভেবে সাহেব খুসবু রুমালে মুখ ঢেকে কথা বলছেন।

প্রকাশ্যে রাজা মধুসূদনকে কোন কথাই বললেন না। কবির এই আচরণে রাজা কিছুটা বিস্মিত। কথিত

আছে রাজা কবির উপর এমন নিকৃষ্ট আচরণ করেছিল যা মানবিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কবির কলকাতা ফিরবার অবস্থা পর্যন্ত সঙ্গীন হয়েছিল। কবি যাতে কুলি বেহারা পালকি না পায় তার জন্য রাজার আদেশ ছিল কর্মচারীদের উপর। রাজকর্মচারীগণ উল্লসিত হয়ে রাজাজ্ঞা পালন করেছিল। অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন সে দিন কবি মধুসদুন। কবি যে সেদিন কী ভীষণ বিপদাপন্ন হয়েছিলেন তা বোধ হয় অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কবি বন্ধু গৌরদাস বসাককে সব বলেছিলেন। গৌরদাস বসাক এই নির্মম অপমানের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। কবি সেদিন বুঝতে পারেন নি মানুষ এত নোংরা ষড়যন্ত্র করতে পারে। গৌরদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই দ্যাখ রুমাল। এই রুমাল মুখে দেবার অর্থ কাউকে অপমান করা নয়। সুগন্ধে মনকে ভরিয়ে দেওয়াই এই রুমালের কাজ। কবি বুঝতে পারেন নি মানুষ এত নোংরা হতে পারে।

কিন্তু কবির হৃদয় ছিল মহান। পরের দুঃখে কবি দুঃখ পেতেন, কেউ কোন অভাবের কথা বললে কবি সঙ্গে সঙ্গে উজাড় করে তাকে সব দিয়ে দিতেন, পয়সা কোন দিন গুনে গুনে দেন নি। ধুলি মুষ্টির ন্যায় তিনি দান করতেন।

● একদিন সন্ধ্যার সময় কবি হাইকোর্ট থেকে ঘরে ফিরছিলেন পালকি করে। পালকিতে বসে বসেই তিনি দেখতেন প্রকৃতি, নানা মানুষের নানা ব্যস্ততা। পালকির মধ্য থেকে কবি দেখলেন, একদল বালক আদালতের ফেলে দেওয়া কাগজ পত্রের স্তূপাকারে বসে বসে কি সব খুঁজে খুঁজে বার করছে। গভীর আগ্রহে বালকের দল কাগজ পত্র ঘাঁটছে। কবি পালকির মধ্যে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ বেহারাদের পালকি থামাতে বললেন, পালকি থেকে নেমে কবি বালকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কি করছ? আদালতের পরিত্যক্ত কাগজপত্র ঘেঁটে তোমরা এখানে কি করছ? বালকেরা উত্তর দিল আদালতের পরিত্যক্ত কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে আমরা সাদা কাজ, ব্লটিং পেপার, খড়ি, কালি, নিব, ভাঙা পেনসিল বার করছি। কবি বিস্মিত হয়ে বললেন তোমরা কি লেখাপড়া কর?

বালকের দল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলল, লেখাপড়া করি, তা বলি কি করে। এইভাবে কাগজ পেনসিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে কি লেখাপড়া করা যায়। এত অভাবে লেখাপড়া করা খুবই কষ্টকর, তবুও আমরা এখনো পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। কবি একটি বালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কি? বালকটি নির্ভয়ে উত্তর দিল—আমার নাম হরিমোহন সেনগুপ্ত। কবি এই বালকদের শিক্ষা অর্জনের জন্য একটি করে সিকি বার করে বললেন, এই পয়সায় কাগজ কালি কিনবে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেহারারা কবিকে পালকিতে ওঠার জন্য বার বার অনুরোধ করছে। কবি পালকিতে চড়ে বেরিয়ে গেলেন, বালকেরা কবির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সাহেব চোখের অন্তরাল হলে বালকেরা দেখল সাহেব তাদের হাতে একটা করে সিকি দিয়েছে। বালকের দল আনন্দে আত্মহারা। পরে বালকেরা জানতে পেরেছিল ইনিই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

তবে সুখের ও গর্বের কথা, ঐ বালকদের মধ্যে হরিমোহন সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে অনেক বড় হয়েছিলেন এবং কবির আর্শীবাদে ধন্য হয়েছিলেন। কবি তাঁর অধ্যাবসায় ও প্রচেষ্টার জন্য যথেষ্ট ভালোবাসতেন।

● কবি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। মহান হৃদয়ের মানুষ, বন্ধুত্ব প্রীতি ছিল ভয়ঙ্কর। বিদ্যাচর্চ্চা ছিল কবির নেশা। কবি একবার যা পড়তেন দ্বিতীয়বার তা আর পড়ার দরকার হত না। পড়াশুনায় ছিল কবির অতীব মনোযোগ। বিদেশী শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের লেখা তিনি প্রতিদিন পড়তেন, বই না থাকলে বই সংগ্রহ করে পড়তেন। কবির নাম সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরাও জানতেন। তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর বার্ড সাহেব মধুসূদনের বিদ্যা ও প্রতিভার কথা শুনেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কবিকে বার্ড সাহেবের সঙ্গে।

বার্ড সাহেব কবির সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলেন ইনি একজন সত্যই প্রতিভাবান। একবার ছোট একটি ইংরাজি বই দিয়ে বার্ড সাহেব বলেছিলেন, বইখানি পড়ে আমাকে বলবে, কেমন লাগল। কবি তিন ঘন্টার মধ্যে বইখানা পড়ে বার্ড সাহেবকে ফেরৎ দিয়ে এলেন। কিন্তু বার্ড সাহেবের সঙ্গে কবির দেখা হয় নি। বইখানা বার্ড সাহেবের বাড়ির অন্য কোন সদস্যকে দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বার্ড সাহেব একখানি পত্র মধুসূদনকে লিখে জানালেন প্রিয় মধুসূদন বইখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি, এখন কি করা যায়। কিন্তু বইখানি অত্যন্ত আবশ্যক। পত্র পাওয়া মাত্রই মধুসূদন হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে হাতে লিখে দিলেন। মূল গ্রন্থে যা ছিল মধুসূদন তাই লিখলেন। বার্ড সাহেব পড়ে বিস্মিত ও অবাক ! বলেছিলেন এমন প্রতিভা আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

● কবি মধুসূদন কত বড় প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন তা বোধ করি সমসাময়িক অথবা পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত মানুষদের বুঝতে জানতে অনেক দেরি হয়েছিল। এমন কি তারা অর্থাৎ অনেক বিদ্বেষ্টগণ প্রায় সময় বলতেন মাইকেলের লেখা ও সব ছাইভষ্ম। সেদিন অনেক পণ্ডিতগণ মনে করতেন মাইকেল বোধ হয় অভিধান দেখে প্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই জন্যই তাঁর রচনা ছিল এত দুর্বোধ্য। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যে রূপ কোমল ও সর্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগের দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহরিতা চিত্তাকর্ষতা ও মধুরতা জন্মে থাকে মেঘনাদবধ কাব্যে তার বিন্দুমাত্র নাই। এইসব নিন্দুকের দল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমালোচনা করে খুশি হত এবং প্রমাণ করতে চাইত যে তারাও যথেষ্ট সমজদার ব্যক্তি। একবার একটি যুবক বেলুড় মঠে মেঘনাদবধের সমালোচনায় পঞ্চমুখ। হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দ এই সমালোচনা শুনে চিৎকার করে বলে উঠলেন ওহে ছোকরা তুমি তো বেশ পণ্ডিত দেখছি। বলি মেঘনাদ বধ কাব্য পড়েছ? যুবকটি মাথা নিচু করে উত্তর দিল অভিধানের কঠিন শব্দ চয়ন করে তিনি যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ অপাঠ্য। স্বামী বিবেকানন্দ যুবকের কথা শুনে মনে মনে ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, যাও সেলফ্ থেকে মেঘনাদ বধ কাব্যটি নিয়ে এস। যুবকটি বইটি এনে বিবেকানন্দের হাতে দিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ একটি সর্গ বার করে বললেন পড়তো দেখি? যুবকটি পড়া আরম্ভ করল পাঁচ দশ লাইন পড়ার পর বইখানি কেড়ে নিয়ে বললেন, এখনও বই পড়তে শেখ নি, অথচ সমালোচনায় পঞ্চমুখ, শোন আমি পড়ি। বলেই বিবেকানন্দ পড়তে লাগলেন। যুবক মন দিয়ে শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিবেকানন্দ বললেন কি কিছু বুঝতে পারলে? যুবক অধোবদনে উত্তর দিল, আপনার কণ্ঠে মেঘনাদবধ তো বেশ ভালোই লাগল। স্বামিজী বললেন অহেতুক সমালোচনা করার অভ্যাস আগে ত্যাগ কর, তোমরা জানো না মধুসূদন কত বড় মাপের কবি। তাঁকে বুঝতে অনেক সময় লাগে। না বুঝে কখনও সমালোচনা করতে নেই।

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কম সমালোচনা করেন নি। না বুঝে যারা মাইকেলকে সমালোচনা করেছিলেন তারা পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন মধুসূদনের প্রতিভাকে। মেধনাদবধ কাব্য সম্পর্কে ১২৮৯ সালে ভারতী পত্রিকাতে যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন তা স্পষ্টত মানুষের জানা দরকার অথচ পরবর্তীকালে সেই রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। যৌবনে মেঘনাদবধ ঠিকমত বুঝতে পারিনি বলেই এত কঠোর সমালোচনা করেছিলাম।

কবি মধুসূদন দত্তের কাব্য সমালোচনা শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, আরো অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতও কঠোর সমালোচনা করতে কসুর করেননি।

● একদিন রত্নাবলী নাটকের রিহার্সাল দেখে মধুসূদনকে বাবু গৌরদাস মহাশয় বললেন, 'তাহা আমরা জানি, কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি। ইহা অবশ্য তোমার ইচ্ছা নয়, ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না।" কিন্তু ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়? মধুসূদন বললেন "আচ্ছা ভাল নাটক আমি রচনা করিব।" গৌরদাস জানতেন মধু যা বলে তা করার

চেষ্টা করে! তবে মনে মনে প্রমাদ যে গোনেন নি তা নয়। যে পৃথিবী লিখতে প্র-থি-বী লেখে সে বাংলা সাহিত্যের মোড় কিভাবে ঘোরাবে। মধুসূদনের কথা গৌরদাস মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছেও বলেছিলেন। মহারাজা মনে মনে একটু হেসেও ছিলেন। বললেন ইংরাজী নবীশ-মাদ্রাজী সাহেব সেই মধুসূদন বাংলা ভাষায় নাটক লিখবেন! ঠিক আছে ব্যস। কবি মধুসূদন মহারাজাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে শর্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে মহারাজাদের পড়ে শোনালেন। মহারাজাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পণ্ডিত ও নাটুকে লোক সকলের উৎসাহ পেয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শর্মিষ্ঠার বাকিটুকুও শেষ করে জমা দিলেন।

বিধি বাম। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ এই নাটকের বিরুদ্ধে ঝড় তুললেন। রত্নাবলী ও কুলীন কুল সর্বস্ব নাটক দুটি সে সময় রচিত হয়েছিল সংস্কৃত রীতি অনুসারে। সংস্কৃত নিয়মনীতি বাদ দিয়েও যে নাটক রচনা করা যায় তা পণ্ডিতগণের ধারণারও বাইরে, তদানীন্তন পণ্ডিতদের ধারণাই ছিল না যে সংস্কৃত নিয়মনীতি বর্জন করেও নাটক লেখা যায়। তাই পণ্ডিতগণ ভয়ঙ্কর ভাবে শর্মিষ্ঠা নাটকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগলেন। তারা পরিষ্কার বললেন "মধুসূদন শর্মিষ্ঠা গ্রন্থারম্ভে নট এবং নটী ও সূত্রধরের অভিনয় ত্যাগ করিয়া ছিলেন। নাটকের অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে যে রূপ নাটকীয় পাত্রগণ যেরূপ পার্থক্য রাখা দরকার ও কর্তব্য এবং নাটকীয় পাত্রগণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, তিনি সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই। ব্যাকরণে বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার কোনকালেই অধিকার ছিল না। সুতরাং তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ব্যাকরণ দুষ্ট ও অলঙ্কার বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সংস্কৃত রীতি পক্ষপাতীগণের নিকট মধুসূদনের এই সকল ত্রুটি অমার্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহার রচনায় "দুঃশ্রবত্ব" "চ্যুত সংস্কারত্ব" "নিহতার্থত্ব" "অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ" প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষ নির্দেশ করিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।"

সংস্কৃত পণ্ডিতদের এই সব মন্তব্য ও সমালোচনা শুনে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তো কিছুটা বিস্মিত, অথচ মহারাজার তো বেশ ভালই লেগেছে। এক দিকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সমালোচনা, অপর দিকে তাঁর নিজস্ব ভাললাগা, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পণ্ডিতদের উপেক্ষা করে তো তিনি বাংলা সাহিত্যের চরম রায় দিতে পারেন না। উপায়হীন অবস্থায় মহারাজা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং বললেন—আপনি শর্মিষ্ঠা পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিন। মহারাজের অনুরোধে দুই চারি পাতা পড়ে মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় বললেন, "সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই। কাট্‌কুট করিলে রচনাটি সমুদয় নষ্ট হইবে। আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই। এমন কি ঘৃণার স্বরে বললেন 'ইহা বোধ হয় কোন ইংরাজী শিক্ষিত নব্যবাবুর রচনা হইবে। ইহা পড়িয়া সময় নষ্ট করিতে পারিব না।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র শর্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত পড়ে অতিশয় খুশি হয়েছিলেন। হয়ত মনে মনে বলেছিলেন এই সব পণ্ডিতদের জন্যই বাংলা সাহিত্যের মান উন্নত হতে পারছে না। এরা এমনভাবে লোহার তার দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বেঁধে রেখেছে যে বাংলা সাহিত্যের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পণ্ডিতদের উপেক্ষা করে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠা অভিনয় করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে শর্মিষ্ঠার জন্য সংগীত রচনা করলেন। শেষাঙ্কের শিব স্তোত্র বিষয়ক সঙ্গীতটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন মহাশয়ের রচিত।

এত ঘৃণ্য সমালোচনা সত্ত্বেও শর্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা সেপ্টেম্বর মহাসমারোহের সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনীত হল। সমালোচকগণ বহু সমালোচনা করেছেন, যে হাতে মাইকেলের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন সেই ই হাতে তারা পরবর্তীকালে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ও প্রশংসা করেছেন। প্রতিভাবান মানুষদের সমসাময়িক পণ্ডিতগণ বোধ হয় রুক্ষ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। মেঘনাদবধ কাব্যে যে সব অভিযোগ পণ্ডিতেরা এনেছেন সেগুলি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা

ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা বলছেন— দুরূহ আভিধানিক শব্দের বাহুল্য, শ্রুতিকটু শব্দের সংকলন, বাক্য গঠনে সরলতার অভাব, সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমন্বিত শব্দের প্রয়োগ উপমার কষ্ট কল্পনা ও অতিশয়োক্তি, সাধুর সহিত চলিতের মেশামেশি, ক্রিয়াপদ গঠনে স্বেচ্ছাচার এবং সর্বোপরি ব্যাকরণ লঙ্ঘনের কথা তো আছেই। মাইকেলের ভাষায় আড়ম্বর আছে ঐশ্বর্য আছে কিন্তু ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ নেই, তার ভাষায় কাব্যরচনাতে কলাকৌশল যেন কলকব্জার মতো কার্য করে। এই জন্যই তাহার অনুপ্রাস শিশুবোধ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। ভাষার এই জীবন বিমুখ। সুদূরতা বলতে গেলে কাব্য রচনার অভিশাপ। কবি বুদ্ধদেব এক স্থানে বললেন—মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ বলেই মাইকেলি কলারোল আমাদের কানে শুধু পৌঁছায় কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশে না। এই সব কঠোর সমালোচনা কবিকে বিশেষ আঘাত করতে পারেনি। কবি জানতেন এইসব সমালোচকগণ না বুঝে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করছেন, যে দিন নিজের অর্জিত কৃতবিদ্যা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে সেই দিন তারা স্বীকার করবে মধুসূদন কে? এবং মধুসূদনের সাহিত্য কি?

সত্যই তাই হয়েছিল উদীয়মান সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ষোল বছর বয়সে মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনায় হাত দেন। হাত পাকাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে স্বীকার করেছিলেন যে তিনিও মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করে নিজেকে অমর করে তুলবার জন্য সর্বাপেক্ষা সুলভ পথ অবলম্বন করেছিলেন।

রবীন্দ্র জীবনী লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে বেশ সুন্দর জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে "যে আঘাত সহ্য করিয়া আহত হয় না আঘাত তাহারই ভূষণ; সুতরাং সাহিত্যের মানসূচী প্রতিষ্ঠা কল্পে মধুসূদনের রচনাকে আক্রমণ স্থল রূপে নির্বাচন করিয়া ভালোই করিয়াছিলেন, কারণ ক্ষীণ প্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা সায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হইত। কিন্তু মধুসূদনের কঠিন প্রাণ রবিকর পীড়নে ম্লান হইবে না। প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনায় কেবল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের গৌরবময় অধ্যায় হইয়াছে। মধুসূদনের কোন গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ মধুসূদনের এই মহৎ কাব্যের সর্বতোমুখী ও নির্দোষ সমালোচনার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তাহা তখনও রবীন্দ্রনাথের দেখা দেয় নাই। অন্যতম পণ্ডিত কবি বুদ্ধদেব বসু যে হাতে মাইকেলের সাহিত্যিকে ব্যর্থ সমালোচনা করেছিলেন একদা সেই বুদ্ধদেব আবার বললেন, "মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত ঝাড়ানোর যাদু মন্ত্র। কি অসহ্য ছিল "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কি আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ যতি উর্মিলতা। বাংলা ছন্দের প্রবহমানতার জনক বলে মাইকেল উত্তরপুরুষের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পণ্ডিতদের অত্যাচারে সৃজনশীল কবি সাহিত্যিকগণ যুগে যুগে নানাভাবে সৃষ্টির পথে বাধা পেয়েছেন, নিন্দা অবজ্ঞা উপহাস বর্ষিত হয়েছে বার বার। এমন কি অমিত্রছন্দকে হেয় করবার জন্য কতই না উপহাস্যসম্পদ ব্যঙ্গ রচনা করেছে কত অভাজন। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকারের মত পণ্ডিতগণও মাইকেলি ভাষাকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি প্রথমার্ধে। নিন্দা বিদ্রুপ এবং শ্লেষোক্তিকে সহ্য করতে না পেরে অনেক কবির প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। আবার শক্তিশালী কবি সাহিত্যকগণ বিরুদ্ধ বাদীদের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কবি শ্রী মধুসূদন তাঁদের অন্যতম। সমালোচনায় আঘাত পান নি। আঘাত পেয়েছিলেন যারা কবিকে সমালোচনা করেছিলেন। মধুসূদনকে চিনতে বুঝতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের সময় লেগেছিল। পরবর্তীকালে সকলেই বলেছেন মধুসূদন একটি প্রতিভা।

● মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনে কখনো মাথা নিচু করে কাজ করেন নি। তিনি স্বদেশকে ভালবাসতেন ভীষণভাবে, বিদ্যা অর্জনে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসককালে যখন ইংরাজদের বিশেষ দাপট ছিল তখনও মধুসূদন কলকাতা হাইকোর্টের ইংরাজ বিচারপতিদের

তোষামোদ করে কাজ করতেন না। বরঞ্চ বিচারপতিগণ মধুসূদনের বলিষ্ঠ বক্তব্যকে কোনদিন অস্বীকার করতে পারেনি।

হাইকোর্টে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করলেন, প্রথম বাঙালী ব্যারিস্টার।

· মধুসূদন কবি ছিলেন, কবি, ব্যবহারজীবী ছিলেন। ব্যবহারজীবী ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। এই সুপণ্ডিত ছিলেন বহু ভাষাবিদ। কবির বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার কথা সেদিন কারো অজ্ঞাত ছিল না। কবির কণ্ঠস্বর ছিল মধুর, গানও গাইতে পারতেন সুন্দর, কিন্তু দূর মাদ্রাজ প্রবাসকালে কবির কণ্ঠস্বর হয়ে গিয়েছিল বিকৃত ও ভঙ্গ। কবি উচ্চকণ্ঠে ভাঙা গলায় বেশ সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন, কোর্টে তার বক্তৃতাসুলভ বক্তব্যে বিচারপতিরা বিরক্ত হতেন, আবার কোন কোন বিচারপতি যারা একটু বাংলা বুঝতেন তাদের খুব ভাল লাগত কবির ভাঙা গলার বক্তব্য শুনতে।

কবির উচ্চকণ্ঠে ভাঙা গলার বক্তব্যে বিচারপতি মিঃ স্যার লুইস জ্যাকসন বিরক্ত হয়েই বলে ফেললেন, তুমি বড্ড বাজে বকবক কর, ভাবো উচ্চ গলায় চিৎকার করলেই বোধ হয় সব জয় হয়ে যায়, বিচারপতি কবির দিকেও তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে বলেছিলেন ধর্মাধিকরণের নির্দেশ, কোর্টে আস্তে কথা বলুন, কারণ কোর্টের কান আছে। কবি বিচারপতির কটাক্ষপাতে সুন্দর জবাবও দিয়েছিলেন। বিচারপতি মধুসূদনের মেজাজ ও ঔদ্ধর্ত্যকে মেনে নিতে পারতেন না। সেই জন্য বিচারপতি জ্যাকসনের সঙ্গে সধুসূদনের বাকবিতণ্ডা লেগেই থাকত। কবির জ্বলন্ত প্রতিভাকে বিচারপতি কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না। তবে মনে মনে মধুসূদনের প্রতিভাকে অস্বীকারও করতেন না। তিনি জানতেন মধুসূদন একজন তেজপূর্ণ ব্যারিস্টার।

বিচারপতি জ্যাকসন ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন তোমার কথা শুনবার মত মানসিকতা আমার নাই, তোমার কথা আমি শুনতে রাজি নই, সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন স্প্রিং এর চশমাটি বাঁ হাত দিয়ে চোখ থেকে নামিয়ে বললেন আমি তোমাকেই বলি নাই, আমি বেঞ্চকে বলেছি। জ্যাকসন কবির এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষণ সহ্য করতে না পেরে গোল চশমা এক চক্ষে লাগিয়ে তীব্রভাবে কবির দিকে তাকিয়ে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বসা তো দূরের কথা কবিও তার মূল্যবান স্প্রিং এর চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে নাকের ডগায় এনে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন বিচারপতি জ্যাকসানের দিকে। জ্যাকসন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কবির বীরত্বে। বাঙালীর যে এত সাহস হতে পারে তা স্যার লুইস জ্যাকসন জানতেন না। দুর্ধর্ষ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার ক্ষমতা বাঙালীর আছে সে দিন জ্যাকসন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। মধুসূদন যে কত বড় প্রতিভা সে দিন জ্যাকসন সাহেবের বুঝতে কষ্টও হয়নি। জাতীয় মর্যাদাকে কবি কখনও ক্ষুন্ন হতে দিতেন না। জাতীয় মর্যাদা ছিল কবির কাছে প্রধান। পরবর্তীকালে বিচারপতি কেম্প সাহেব অবলীলাক্রমে স্বীকার করে বলেছিলেন কবিতার মাধ্যমে আপনি আইন সৃষ্টি করেন এবং তা আসামীর পক্ষে সহায়ক হয় এবং আসামী মুক্তি পায়। সেদিন মধুসূদন না থাকলে অন্যান্য ব্যবহার জীবিগণও বিপদাপন্ন হতেন। অন্যান্য বিচারগণের প্রতি তোষামোদ ও সন্তুষ্টকরণের জন্য বিবিধ কর্মপন্থা গ্রহণ করা যে সব ব্যবহারজীবীর প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছিল, মধুসূদন এই সব মোসাহেব চাটুকার ব্যবহারজীবীদের ঘৃণা করতে লাগলেন, ব্যারিস্টার এম. এস. ডাট্ সেদিন ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। খ্রীষ্টান তিনি হয়েছিলেন শুধু সাদা চামড়ার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে নয়, বাঙালীর প্রতি তাকে এবং সৃষ্টিকে সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। ইংরাজদের তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না।

● সেদিন হাইকোর্টে দুর্ধর্ষ বিচারপতি স্যার লইস জ্যাকসনের ভয়ে যখন সকল ব্যবহারজীবী শঙ্কিতগ্রস্ত, যার সন্তুষ্টিকরণের জন্য অন্যান্য ব্যবহারজীবীগণ অধীর হয়ে উঠতেন তখন কবি মধুসূদন অবলীলাক্রমে তর্কবিতর্কে বিচারপতি জ্যাকসন সাহেবকে যৎপরোনাস্তি আইনের দ্বারা বিস্মিত ও হতবাক করে দিলেন। ইংরাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা বা তাদের তুষ্ট করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। যদিও কবির এই ঔদ্ধত্য অন্যান্য ব্যবহারজীবীদের কর্মে অনেক বাধার সৃষ্টি হত, এমন কি কবির ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক

ক্ষতি হত। কর্মজীবনে উন্নতি হয়নি তার কারণ অন্যান্য ব্যবহারজাবীদের মত তিনি সাহেবদের তোষামোদ করতে পারতেন না। দাম্ভিক বিচারপতি জ্যাকসনকে সকলেই ভয় করত। কবি মধুসূদন তার দাম্ভিকতা ও রক্তচক্ষুকে হিসাবের মধ্যে রাখতেন না। কারণ জ্যাকসন সাহেব ছিলেন ভারত বিদ্বেষী। কবির ঐ দাম্ভিকতার সংবাদ হাইকোর্টের পাঁচিল টপকে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বন্ধু গৌরদাসের কানেও পৌছেছিল। বিচারপতি জ্যাকসনের সঙ্গে মধুসূদনের বাকবিতণ্ডার কথা। বন্ধু গৌরদাস বসাক কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন। বিচারপতির সঙ্গে এমন বাকবিতণ্ডা করা উচিৎ নয়। বন্ধু গৌরদাস বসাক কবির কাছে এসে বললেন, মধু বিচারপতিদের সাথে এমন বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হলে তোমার ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

বিচারকদের সঙ্গে এমন আচরণ করা ঠিক নয়। অন্যান্য ব্যবহারজীবীদের মত তুমিও পসার বাড়াও কারণ তুমি মনোযোগ দিয়ে শীর্ষস্থানে সহজেই পৌছাতে পারবে। তোমার মত পণ্ডিত হাইকোর্টে কেউই নেই। কবি বন্ধু গৌরকে খুব ভালবাসতেন। গৌর জানতেন এই বীর কেশরী মাইকেলকে কখনই নিরস্ত্র করা যাবে না। ইংরাজ ব্যারিস্টার সাহেব মিঃ এ, বি মিলার বলতেন সে সময় হাইকোর্টে বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য মধুসূদনের সমকক্ষ বা তুল্য কেউই ছিলেন না, সুতরাং মধুসূদন জ্যাকসনের অন্যায় দম্ভকে মেনে নেবেন কিভাবে? আর এক দিনের ঘটনা।

● বিচারপতি জ্যাকসনের এজলাসে তিলধারণের স্থান নেই। বিচারপতি তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আছেন। ব্যারিস্টার উকিলগণ তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছেন। বিচার চলাকালীন সকল উকিল ব্যারিস্টারগণ ভয়ে তটস্থ, জ্যাকসনের শ্যেন দৃষ্টির কবলে যাতে না পড়ে তার জন্য ব্যবহারজীবীগণ ধীরে শান্ত মেজাজে স্ব স্ব বাদী প্রতিবাদীর মামলা চালাত। তারা জানত যখনই জ্যাকসনের দৃষ্টি পড়বে তখনই তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়তে হবে। বিচারপতি জ্যাকসন এক চোখে একটি গোল চশমা লাগাতেন। তাঁর নিময়ই ছিল গোল চশমার মধ্য দিয়ে যদি তিনি কারো দিকে তীব্র নজর ফেলেন অথবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান কোন উকিল ব্যারিস্টার বা কৌশুলীর দিকে, তাহলে তিনি যেই হোন, তাকে কথা না বলে বসতেই হবে। মধুসূদন জ্যাকসনের এই ঔদ্ধত্যকে মনে মনে ঘৃণা করতেন এবং প্রায়ই সময় তিনি এই সব ঘটনা লক্ষ্য করতেন। একদিন কবি জ্যাকসনের দাম্ভিকতা ভাঙবার জন্য এবং ভারতীয় ভীতু চাটুকার কিছু ব্যবহারজীবীদের চোখ খুলে দেবার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করলেন। কবি ভাবলেন, ভারতীয়দের উপর ইংরাজদের দম্ভ মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। ভারতীয়দের মর্যাদা ও অসীম শক্তি সম্পর্কে সাহেবদের কিছু কিছু সমুচিত শিক্ষা দরকার। কবি সেই সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। প্রাণ দিয়ে ডাকলেই হয়ত মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। এজলাসে তিল ধারণে জায়গা নেই। বিচারপতি জ্যাকসন বসে আছেন। কবি এক মক্কেলের পক্ষে বক্তব্য রাখবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং পরে অপর এক মক্কেলের একখানি দরখাস্ত পেশ করতে চাইলেন। জ্যাকসন বোধ করি এতদিন কিছু তোষামোদকারী উকিল ব্যারিস্টারদের প্রতি যে প্রভুত্ব করে আসছিলেন ভেবেছিলেন বরাবরই এমনই চলবে। জানেনা ভারতীয় শার্দুল কত তেজবান ও শক্তিশালী। এত দিন কিছু পোষা ময়নার সঙ্গে ঘর করে আসছিলেন মিঃ জ্যাকসন। কবি উঠে দাঁড়ালেন, প্রথম যে দরখাস্তখানি দিয়েছিলেন তা জ্যাকসন গ্রহণ করলেন না। কবি একটু উত্তপ্ত হয়ে বললেন, আপনি কি মনে করেন ডেমোক্রিসের সরু সূত্রে বাঁধা ঝুলন্ত তরবারি খানা আমার মক্কেলের মাথার উপর ঝুলবে?

জ্যাকসন বেশ গম্ভীরভাবে বললেন তুমি বড় বাজে কথা বল, আমি নিশ্চয়ই জানি তোমার মক্কেল ডেমোক্রিসের ঝুলন্ত তরবারীর ইতিহাস জানে না এবং আদালতে কবিতা গল্পের মাধ্যমে কোন মামলা করা যায় না। আদালত কবিতার জায়গা নয়। আদালতে আইনের কথা হয়, আদালত কবিতার জন্য নয়। কবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতার সুরে সুরে বলে ওঠেন আমি বাজে বকি আর কবিতাই বলি অথবা নরম্যান বিজয়ের ইতিহাস বলি তা তোমাকে শুনতেই হবে।

● উনবিংশ শতাব্দীর মহান বিপ্লবী ও নব জাগরণে প্রাণ পুরুষ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খ্রীষ্টান

তিনি হয়েছিলেন, ব্যারিস্টার তিনি হয়েছিলেন, খ্রীস্টান ব্যারিস্টার তিনি হয়েছিলেন সাদা চামড়ার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে নয়। জাতীর চরমতম স্বার্থের এবং মঙ্গলের জন্য। যদি কেউ সব থেকে বিরোধিতা করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তিনি মধুসূদন দত্ত।

হাইকোর্টে স্যার লুইস জ্যাকসনের ন্যায় দুর্ধর্ষ বিচারকদের ভয়ে যখন সকলেই শঙ্কিত, সকলেই ব্যস্ত, যার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অন্যান্য ব্যবহারজীবীগণ অধীর হয়ে উঠতেন, তখন কবি মাইকেল অবলীলাক্রমে তর্ক বিতর্কে জ্যাকসনকে যৎপরোনাস্তি আইনের দ্বারা বিস্মিত হতবাক ক'রে দিতেন। ইংরেজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা বা তাদের তুষ্ট করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যদিও তাঁর ব্যবহার জীবনের পথে অনেক বাধার সৃষ্টি হত, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে চরম ক্ষতিও হয়েছে। কর্মজীবনে উন্নতি হয়নি, তার প্রধান কারণ অন্যান্য হতভাগ্যদের মত তিনি তোষামোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি।

মধুসূদন কত বড় প্রতিভাবান মানুষ, সেদিন জ্যাকসন সাহেব স্বীকার করেছিলেন। জাতীয় মর্যাদাকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দিতেন না। অনেক বিদ্বেষ্টগণ তাঁর বিরুদ্ধে যতই অপবাদ ঘোষণা করুক, তাতে কবির কিছু আসে যায় না। সেদিন বহু বাঙালী উকিল ব্যারিস্টার সাহেবদের প্রতি আনুগত্য ও প্রভুজ্ঞানে মান্য করত, তাদের চরিত্রের কথা অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়, তাই উল্লেখ করা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজন। তারা ছিলেন চাটুকার আর কবি ছিলেন ব্যক্তিত্বময়।

এ মাটিকে কবি যে কত ভালবাসতেন তাঁর একটি কবিতার দু'চার ছত্র পড়লেই অনুমান করা যায়। এইসব চাটুকার ব্যবহার জীবিদের জন্য লেখলেন।

শুনগো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যাজ ঘুম ঘোর হইল হইল ভোর
দিন কর প্রাচীতে উদয়।

তাই তো কবি দেশ মাতৃকার মর্যাদা রক্ষার্থে ইংরাজদের কড়া হাতে দমন ও শাসন করতেন। নীলকর সাহেবগণ বহু চেষ্টা করেও কবির কোন ক্ষতি করতে পারেন নি।

● শ্রীমধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের প্রথম প্রাণপুরুষ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত অসভ্য সমাজ যখন আর চলে না, ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গ নারী যখন অবগুণ্ঠনবতী হয়ে বার বার অত্যাচারিত, যখন পুরুষেরা সর্বেসর্বা অথচ দাস্য বৃত্তিতে প্রভাবিত সাদা চামড়ার কাছে, বঙ্গসন্তান ইংরাজের স্তব, স্তুতিতে ক্লান্ত তখন কবি মধুসূদন আর চুপ থাকতে পারলেন না। পুরুষের যেখানে শেষ নারীর সেখানে আরম্ভ। কবি পুরুষের উপর সঠিকভাবে নির্ভরশীল হতে পারলেন না। নারীশক্তিকে আহ্বান করলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রমীলার মাধ্যমে। প্রমীলার মাধ্যমে কবি নারী স্বাধীনতার কথা প্রথম উচ্চারণ করলেন। তিনিই প্রথম স্ত্রী জাতির প্রতি মমত্ব দেখিয়েছেন, সাম্যের কথা বলেছেন। কবি জানতেন, শক্তিরূপিনী, অসুরকুলদলনী, হরহৃদি বিলাসিনী কালিকার মূর্তি দেখলে বীর পুরুষেরও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে সেইরূপ সৃষ্টি করলেন প্রমীলার মাধ্যমে। কবি বুঝেছিলেন এই পর্যায়ের প্রেমে ভারতবর্ষের কোন পরিবর্তন হতে পারে না। কবি ভাবতে লাগলেন, জাগরণের নতুন সূচনা কেমনভাবে প্রভাবিত করবেন বঙ্গসাহিত্যে। তাঁর গতি হল বিদ্যুতচমকের মতো, শুধু বঙ্গ সাহিত্যের কিছু পুঁথি গলাধঃকরণে কোনো নব জাগরণ ঘটতে পারে না। সুস্থ পরিবর্তনে চাই সুস্থ জ্ঞানচর্চা। ভাষা শিক্ষা, ভাষার প্রবাহ, ঠিক যেন মন্দাকিনী। ইতিমধ্যে বহু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। মাদ্রাজে থাকাকালীন বেশ কিছু ভাষা অর্জন করেছিলেন। হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, তামিল, সংস্কৃত, লাটিন, ইংলিশ এবং অতি অল্প বয়সে অর্জন করেছিলেন পারসী ও উর্দু। তাছাড়া ফ্রান্স, জার্মান, সামান্য পর্তুগীজও শিখেছিলেন। অধীত ভাষা শিক্ষা কবিকে প্রতি মুহূর্তে নতুন আলো দেখাতে লাগলো। প্রতিভার এমনই গুণ যে সকল সময় নতুন সৃষ্টির জন্য অধীর হয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পক্ষাঘাত, অনুর্বর ও তোষামোদের কর্মযজ্ঞ দেখে পয়ারের নিগড় ভেঙে চুরমার করে দিলেন, সৃষ্টি করলেন বঙ্গ সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কবি মধুসূদন বিহার প্রদেশে আরা জেলায় মাঝে মধ্যে যেতেন এবং উর্দুতে 'চাহের দরবেশ' অধ্যয়ন করতেন। চাহের দরবেশ মূল ভাষায় অধ্যয়ন করে মুগ্ধ হতেন। উর্দুতে এমন উন্নত ভাষা ও মনস্বিতা আছে যা অনেকের কাছে অজ্ঞাত। বিভিন্ন চরিত্র পাঠে কবি বিস্ময়াভূত হতেন, ভাবতেন এমন ছন্দে কাব্য রচনা করলে কেমন হয়। কবি ভাবতেন, পয়ারের নিগড়ে বঙ্গ সাহিত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। কবি কাব্যের স্বাধীনতার জন্য বার বার 'চাহের দরবেশ' অধ্যয়ন করে বঙ্গ সাহিত্যে তার প্রবাহ মন্দাকিনীর মতো আনলেন। 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ রচনায় 'চাহের দরবেশ' এর ভূমিকা অনন্য। কবি 'চাহের দরবেশের' বহু রীতি, ছন্দ, মাত্রা যতি ও ভাবাবেগ হুবহু গ্রহণ করেছেন। কবির পাণ্ডিত্য কবিকে নানা ভাষার গুপ্ত রত্নরাজির প্রতি ইঙ্গিত করে দেখিয়েছে এবং কাব্য রসাধার আহরণ করে বঙ্গ জননীর কোলে সমর্পণ প্রতি ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন কাব্য রসাধার আহরণ করে বঙ্গ জননীর কোলে সমর্পণ করেছেন। কবি এক স্থলে লিখেছেন, তাঁর কাব্যে 'অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী', চাহের দরবেশে তদনুরূপ লক্ষণীয় 'আঁধারি ঘরমে এক দিয়া না দিয়া।'

কবি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাথে পাঞ্জা লড়ে বলেছিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। কবি জানতেন উর্দু সাহিত্যে 'চাহের দরবেশ' কত উর্ধ্বে। কবির জ্ঞাত অনুশীলনী শক্তি এবং জ্ঞাতব্য প্রচেষ্টা কবিকে দৃঢ় গ্রানাইট পাথরের উপর অধিষ্ঠিত করেছিল। দৃঢ়প্রত্যয়ের আত্মবিশ্বাসে অমিত্রাক্ষরের প্রবাহ বঙ্গ সাহিত্যে এক নব জাগরণ ঘটাল। তেমনি আমদানিকৃত চতুর্দশপদী বা সনেট কবিকে আর এক পর্যায়ে উন্নীত করল।

কবি গৌরদাস বসাককে যদিও তাঁর লেখা সনেট বিদেশ থেকে প্রথম পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সনেটের সমঝদার হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কবি ফ্রান্স রাজ্যের বিখ্যাত নগরী ভারসেলস-এ দুই বৎসর ছিলেন, কবি পের্ত্রাকের কাব্য পড়তেন এবং তদনুকরণে চতুর্দশপদী কবিতা একশ লিখে পাঠিয়েছিলেন। অতীব কৌশলে এই সব কাব্যের রস সংগ্রহ করে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। কবি গৌরদাস বসাককে প্রায় সময়েই লিখতেন, উদরপূর্তির জন্য জীবনের সবটুকু উৎসর্গ করতে ইচ্ছা হয় না। শুধু দিগম্বর মিত্রের মতো কিছু অসৎ মানুষের জন্য সাহিত্য চেষ্টা করে জীবন কাটাতে পারলাম না, বঙ্গভাষা মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এ ভাষায় বিদ্যমান। কবি হয়তো বঙ্গ ভাষায় আরও নতুন কোনো ইঙ্গিত নির্দেশ করতে পারতেন। পারলেন না বলেই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত দুঃখ করে লিখেছিলেন, "দেশে ফিরে দিগম্বর মিত্র এবং হরি বাঁড়ুজ্যের মত কিছু অসৎ লোককে স্বহস্তে হত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলব।"

● ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই মধুসূদন পূর্ণ ইউরোপীয় ঢঙে চাপরাশী, আরদালী, করণিক, পাচক, বাবুর্চি সকলকে ডেকে হুকুম দিয়ে বললেন, দেশীয় খানা বিদেশীও খানার ব্যবস্থা কর, যে যেমন খায় তেমনি খাওয়াও। হ্যাঁ, রেডি টু পেগ, বহু মানুষের ভিড়। সকলেই নিমন্ত্রিত। সাধ্বী হেনরিয়েটা, পতিপ্রাণা তখন আঁতুরঘরে। স্বামীর এই অতীব অর্থ; ব্যয়ের বহর দেখে বলেছিলেন, অসংযতচিত্তে সবকিছু করা ভাল নয়। পতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় এমিলিয়া হেনরিয়েটা সতত অধীর হয়ে পড়তেন। আঁতুরঘরে বাংলার মেঘনাদ উঁকি মারছে। চোখ পিট পিট করে দেখছে, দেখছে পিতার প্রাণভরা উদারতা—এই মেঘনাদই মাইকেলের পুত্র যার নাম রাখা হয়েছিল ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টন দত্ত। মিল্টন মৃত্যু বরণ করল অল্প বয়সে। ভগবান মঙ্গলময় পবিত্র সৃষ্টিকে বেশিদিন পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যে রাখতে চান না, তাই মিল্টনকেও যেতে হল মানব জীবনের শেষ পরিণতির আশ্রয়ে। মাত্র তের বছর দশ মাস ঊনিশ দিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করেছিল। মিল্টন। কৃত্তিবাসের মেঘনাদের মত কবির মেঘনাদও মৃত্যু বরণ করল। মৃত্যু বরণ করল পঞ্চরথীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মহারোগের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হল।

কবি বহু চেষ্টা করেছিলেন মেঘনাদকে বাঁচাবার, কিন্তু বিধি যার বাম—পুরে মনস্কাম? কবির কান্না সক্রেটিসের ভাষায় ডেমোন যেন কবির মধ্যে ভয়ংকরভাবে জেগে উঠল। ভালবাসার প্রতিদান ভগবান কবিকে দারুণ ভাবে আহত করেছে বার বার।

হেনরিয়েটা ফরাসী কন্যা, ইংরাজী বাংলা ভালই শিখেছিলেন। এমন পতিব্রতা স্ত্রী খুব কমই দেখা যায়। হেনরিয়েটা কোনদিন চাননি স্বামী তাঁর অঙ্গুলী হেলনে পুত্তলিকার মত চলুক। হেনরিয়েটা কোনদিনই চাননি কবি অসংযতচিত্তে উচ্ছৃঙ্খলতার মোহগ্রস্তে ভবিষৎকে অন্ধকার করে ফেলুক। তিনি ভাল রকমই জানতেন এই পুরুষসিংহ কোনদিনই রমণীয় অঙ্গলীহেলনে ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে থাকবে না। বুদ্ধিমতী হেনরিয়েটা গুণনৈপুণ্যে কবিকে মুগ্ধ করতেন, গুণমতী পত্নী কবিকে অসামান্য কর্ম-নৈপুণ্যে সংযত করার চেষ্টা করতেন। মিল্টনের জন্মের দু'বছর আগেও হেনরিয়েটা আঁতুরঘরে গিয়েছিলেন, নবজাতকের নাম হয়েছিল শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা কবির কাছে অনেক আগেই জন্মেছিল—কবির শর্মিষ্ঠার সব গুণই আঁতুরঘরের শর্মিষ্ঠা পেয়েছেন উত্তরকালে। হেনরিয়েটাকে সতেজ করে তুলতেন কবি, কবির ভালবাসার কোন মাপকাঠি ছিল না। জ্ঞান অর্জনের জন্য কবি যেমন প্রতিনিয়ত চিন্তা করতেন, পুত্র, কন্যা, স্ত্রীর জন্যও তেমনি কবি প্রতিনিয়ত চিন্তা করতেন। হেনরিয়েটার সামান্য অসুখ হলে কবির দুশ্চিন্তার শেষ থাকত না। তিনি উন্মাদের মত ছটফট করতেন, কিভাবে কি করবেন ভেবেই পেতেন না। হেনরিয়েটার সকল সাধ পূরণ করার চেষ্টা করতেন। না-বাচক কিছু ছিল না, ভালবাসার কাছে অসাধ্য কি থাকতে পারে। হেনরিয়েটার সামান্য কষ্টে বা অসুখে কবি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। হেনরিয়েটা যা চাইতেন আশাতিরিক্ত কবি দিতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে হেনরিয়েটা বলত আমি তো এত দামী চাইনি। অট্টহাস্যে কবি বলতেন, মধু কখনও ছোট জিনিস দিতে পারে?

কবি পুত্র মিল্টন পিতার ন্যায় অনেক কিছুর অধিকারী হয়েছিল। মাত্র তের বছর বয়সে মিল্টন প্রতিভার স্বাক্ষরও রেখে গিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব নৈপুণ্যতার পরিচয় দিয়েছে। জননী হেনরিয়েটার ছবি অবিকল নিজে হাতে এঁকেছিল। ফরাসী ভাষার যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিল, ইংরাজীতে এত সুদক্ষ যে পিতার ন্যায় মিল্টন কবিতাও রচনা করেছিল। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল। কন্যা শর্মিষ্ঠাও তদ্রূপ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শর্মিষ্ঠার জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম ছিল হেনরিয়েটা এলিজা শর্মিষ্ঠা। গান এবং পিয়ানোতে ছিলেন অতীব সূক্ষ্মশিল্পী। প্যারিসের কোন সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠা নিজের হাতে তাঁর বিবাহের রুমালে এমন সুন্দর সূচের কাজ করেছিলেন যে সকলেই চমৎকৃত হয়েছিল। কাগজের ক্রেপের উপর পশমের ক্রুশ তুলেছিলেন, ছবি আঁকার হাত ছিল অসামান্য, পিয়ানো বাজাতেন এমন সুন্দর যা বড় বড় শিল্পীও অবাক হয়ে যেতেন। পিতামাতার প্রতিটি গুণ পুত্র কন্যা পেয়েছিল। শর্মিষ্ঠাকে তদানীন্তন বিত্তশালী ও গুণী মানুষেরা ভালবাসতেন। তাঁর গুণের জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী তাঁর বিবাহের সময় ৩৫০ টাকা মূল্যের গাউন উপহাব দিয়েছিলেন। পিতামাতার সমস্ত গুণই শর্মিষ্ঠা পেয়েছিলেন। হাইকোর্টের এক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়, সাহেবের নাম ফ্রয়েড। সংস্কৃত ভাষায় ফ্রয়েডের জ্ঞান দেখে কন্যার জন্য পাত্র নির্বাচন করেছিলেন কবি স্বয়ং। ফ্রয়েড মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার নিস সাহেবকে বিবাহ করেছিলেন ১৮৭৯ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারী। বিধির নিয়ম এমনই শর্মিষ্ঠা এবারও বঞ্চিত হল। নিস সাহেব মারা গেলেন। শর্মিষ্ঠা কয়েকজন পুত্র কন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন সম্ভব। মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ান পিতামাতার স্নেহ থেকে প্রায় পরিপূর্ণ বঞ্চিত ছিল। পিতামাতার ক্রোড় স্নেহের সোহাগ আলবার্টের ভাগ্যে ছিল না। পুত্রের জন্মের কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁরা পরলোকগমন করেছিলেন। মধুসূদন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, বিশেষ করে বাবু গৌর দাস বসাক সুহৃদবন্ধু মনোমোহন ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন তাঁর পুত্রের অন্ন কষ্ট না হয়, মাইকেলের একমাত্র পুত্রজ্ঞানে তদানীন্তর সরকার বাহাদুর অহিফেন বিভাগে চাকরি দিয়েছিলেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কোন ভারতীয়দের

চাকরি দেওয়া হত না। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আলবার্ট বেঁচেছিলেন। একদিন বাইসাকেলে করে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন (লক্ষ্ণৌ শহরে) দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না। অ্যাক্সিডেন্ট-এ হঠাৎ মারা গেলেন।

● দেশের মাটিও মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। বলতে গেলে নিজের জীবনকে প্রায় বিনষ্ট করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীতারকনাথ ঘোষের বাড়িতে বসে নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন। এই অনুবাদ করার জন্য মধুসূদনকে ইংরাজ সরকার খুবই সন্দেহ করত, স্পাই হিসাবে সরকার বাহাদুর বিচারপতি ওয়েল সাহেবকে লাগিয়েছিল। বিচারপতি লং সাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন অনুবাদকের নামটি বলার জন্য, কিন্তু লং সাহেব বলেন নি। না বলার জন্য লং সাহেবকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল ইংরাজ সরকার, কিন্তু লং সাহেবের হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠত নীল চাষীদের জন্য। কবি দেশকে যে কত ভালবাসতেন তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। দেশের জন্য সাহেবদের কবি কম হেনস্তা করেন নি, সাহেবরা কবির বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু কবিকে অনেক সাহেব আবার সহ্য করতে পারতেন না। নাই বা পারল সহ্য করতে, নিজের মাতৃভূমির জন্য যে কবি নিজের সব থেকে প্রিয় জনকে পরিত্যাগ করতে পারলেন, ভুলে গেলেন রেবেকার গর্ভজাত দুই পুত্র দুই কন্যার কথাও, সে মানুষটা তাহলে কতো কঠোর আত্মপ্রত্যয়ী ও নির্মম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কবি মধুসূদনের এই খামখেয়ালীপানার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কবির জীবনের রেবেকার মূল্য যে কতখানি তা কবি সবসময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতেন, যে মানুষকে নিয়ে এত বিপ্লব এত আলোড়ন এত বাতবিতণ্ডা তার পরিণতি কি? সেজন এই বিষয়ে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর চিন্তা, তাঁর সঙ্গে থাকত মেঘনাদসহ কাব্য, গভীর মনোযোগ সহকারে তাহা তিনি পাঠ করতেন, কৈশরে উপলব্ধি করতেন মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ ও কবির চিন্তাধারা।

এ সংবাদ বেশ কয়েকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এবার সঙ্গী হলেন অনেক যেমন, তেজস্বী ইঞ্জিনীয়ার ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র মেঘনাদবধ থেকে আবৃত্তি করতেন অন্যেরা সকলে গুণমুগ্ধকর শ্রোতা হয়ে শুনতেন। সকলে ঝিমিয়ে অবাক হতেন এমন সৃষ্টি বঙ্গসাহিত্যে আর সৃষ্টি হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় চন্দ্র রশ্মির ন্যায় বিভাসিত হতো। সকলেই পাঠ করতেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। বিদেষীগণ যাহাই সমালোচনা করুক বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কবি শ্রীমধুমূদন এক অনন্য প্রতিভা।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন—

The next author to be considered is Mr. Michael Madhusudan Datta, a most prolific writer of pomes and plays. There is probably no writer whose, Whose merits are more variously estimated, some enthusiasts thinking him fit to compare with Kalidas.......

The country is over run with men of this sopt and Mr. Datt's Picture is true of life, but they must not be confounded with the really cultivated class.

● মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যের সমালোচনা সে দিন কে করেন নি? বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা মধুসূদনকে পাগল সাব্যস্ত করতেও দ্বিধা করেন নি। মেঘনাদবধ সম্পর্কে ভিন্ন পণ্ডিতের ব্যর্থ সমালোচনা আজ আমাদের কাছে বিশেষ লজ্জার কারণ। মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা করতে তদানীন্তনকালে সকলেই একবার 'বুড়ি' স্পর্শ করেছেন। অতি সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ পর্য্যন্ত, সাধারণ মানুষের ব্যর্থ সমালোচনার খুব একটা ব্যথার সৃষ্টি করত না। অর্থাৎ কবি কর্ণপাত করতেন না। তিনি এইসব অজ্ঞ সমালোচকগণ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন।

● একবার মধুসূদন গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পদস্খলিত হয়ে বিশেষ আঘাত পান, কবির কোন বন্ধু এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে কবিকে দেখতে যান। যুবকটি নিজেকে খুব বড় দরের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ভেবে

গর্ববোধ করত, মধুসূদনের সঙ্গে যখন ইংরাজীতে বাক্যালাপ করছিল, তখনই মধুসূদন তার ইংরাজী ভাষার দখল সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান হয়েছিলেন, বেশিক্ষণ কথা বলেননি, কিছুক্ষণ পরে কবি তাঁর বন্ধুটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই যুবককে লইয়া বড় বড় সাহেবের নিকট যাইও না, ইহাকে দেখিয়াই সাহেবরা শিক্ষিত বাঙালী যুবকের নমুনা বুঝিয়া লইবেন।' These are The specimens of educated Bengalees, ঠিক সেই সময় মধুসূদনের নেশার উদ্রেক হয়েছিল, বিধাতা এমনই নির্মম, তাঁর পান পাত্রে একটি মাছি এসে পড়ল। এই অবস্থা দেখে কবি বিস্মিত হলেন, পান করা আর হল না, তাকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করে যুবকটিকে পড়তে বললেন, যুবকটি কবির বাংলা হাতের লেখা পড়তে পারছিল না, কবি আবার বললেন, 'পড় ভদ্রলোক কবির হাতের লেখা পড়তে না পারায় ফিরিয়ে দিল, ঠিক সেই সময় এক ফিরিঙ্গি বন্ধু কবির কাছে উপস্থিত হল, কবি কবিতাটি তাঁহার হাতে দিয়ে বললেন, Just read this young man. যুবক বাঙালীটি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি পারলাম না—সাহেব কি করে বাংলা বুঝবে। মধুসূদন উত্তর দিয়েছিলেন "ও একজন প্রকৃত পণ্ডিত সাহেব"। তৎক্ষণাৎ কবির হস্তলিখিত কবিতাটি পড়ে দিলেন। যুবকটি অবাক চোখে কবির দিকে তাকিয়ে রইল। এই জাতীয় অনেক শিক্ষিত শ্রেণী মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করতেন। ঐ ব্যক্তির নাম প্রিয়নাথ কর। প্রিয়নাথের মত একব্যক্তি যিনি বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। পড়াশুনা না করেই মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করত। তার উত্তরে স্বামিজী বলেছিলেন—তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নতুন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোক তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য, যা তোদের বাংলা ভাষায় মুকুটমণি। তাকে আদ্যোপান্ত করতে কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হল? তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি যায় আসে? এই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমালয়ের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর খুঁত ধরতে যারা ব্যস্ত ছিলেন, সেই সব সমালোচকেরা কোথায় ভেসে গেল। মাইকেল নতুন ছন্দে, তেজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণ কি বুঝবে? স্বামিজী মেঘনাদবধ কাব্যের একটি বিশেষ অংশ নিজে পাঠ করে শিষ্যকে শোনালেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরুক।

সমালোচক ও বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন—যদি বাঙ্গালার সমস্ত কবিদিগের একটি সভা হয়, আর সেখানে যোগত্য অনুসারে সকলের আসন নির্দেশ করা হয়; ত হলে মাইকেল বসবেন ঘরের ভিতরের এই চেয়ারে, আর আমার যদি কোন স্থান সেই সভায় থাকে তাহলে সেটা এই বাড়ির ফটকের কাছে। এ কথাও বলেছিলেন, "বাংলায় এমন কবি এ পর্যন্ত জন্মান নাই, যাঁহাকে মাইকেলের উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।' 'ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের (আষাঢ় ১৩২০) সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আরও লিখিয়াছিলেন,—(তখনও রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পাননি।)

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধিরসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন এক উত্তাল ভাব সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরাজি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।.....মাইকেলও তেমনই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নতুন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ও মাইকেল আধুনিক বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক। এই দুই ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের শাসন কর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের কদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ

হত না। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আলবার্ট বেঁচেছিলেন। একদিন বাইসাকেলে করে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন (লক্ষ্ণৌ শহরে) দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না। অ্যাক্সিডেন্ট-এ হঠাৎ মারা গেলেন।

● দেশের মাটিও মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। বলতে গেলে নিজের জীবনকে প্রায় বিনষ্ট করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীতারকনাথ ঘোষের বাড়িতে বসে নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন। এই অনুবাদ করার জন্য মধুসূদনকে ইংরাজ সরকার খুবই সন্দেহ করত, স্পাই হিসাবে সরকার বাহাদুর বিচারপতি ওয়েল সাহেবকে লাগিয়েছিল। বিচারপতি লং সাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন অনুবাদকের নামটি বলার জন্য, কিন্তু লং সাহেব বলেন নি। না বলার জন্য লং সাহেবকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল ইংরাজ সরকার, তবু লং সাহেবের হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠত নীল চাষীদের জন্য। কবি দেশকে যে কত ভালবাসতেন তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। দেশের জন্য সাহেবদের কবি কম হেনস্তা করেন নি, সাহেবরা কবির বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু কবিকে অনেক সাহেব আবার সহ্য করতে পারতেন না। নাই বা পারল সহ্য করতে, নিজের মাতৃভূমির জন্য কবি নিজের সব থেকে প্রিয় জনকে পরিত্যাগ করতে পারলেন, ভূলে গেলেন রেবেকার গর্ভজাত দুই পুত্র দুই কন্যার কথাও, সে মানুষটা তাহলে কতো কঠোর আত্মপ্রত্যয়ী ও নির্মম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কবি মধুসূদনের এই খামখেয়ালীপানার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কবির জীবনে রেবেকার মূল্য যে কতখানি তা কবি সবসময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতেন, যে মানুষকে নিয়ে এত বিপ্লব এত আলোড়ন এত বাতবিতণ্ডা তার পরিণতি কি? সেজন্য এই বিষয়ে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর চিন্তা, তাঁর সঙ্গে থাকত মেঘনাদবধ কাব্য, গভীর মনোযোগ সহকারে তাহা তিনি পাঠ করতেন, কৈশরে উপলব্ধি করতেন মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ ও কবির চিন্তাধারা।

এ সংবাদ বেশ কয়েকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এবার সঙ্গী হলেন অনেকে যেমন, তেজস্বী ইঞ্জিনীয়ার ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র মেঘনাদবধ থেকে আবৃত্তি করতেন অন্যেরা সকলে গুণমুগ্ধকর শ্রোতা হয়ে শুনতেন। সকলে বিস্ময়ে অবাক হতেন এমন সৃষ্টি বঙ্গসাহিত্যে আর সৃষ্টি হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় চন্দ্র রশ্মির ন্যায় বিভাসিত হতো। সকলেই পাঠ করতেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, বিদ্বেষীগণ যাহাই সমালোচনা করুক বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কবি শ্রীমধুসূদন এক অনন্য প্রতিভা।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন—

The next author to be considered is Mr. Michael Madhusudan Datta, a most prolific writer of pomes and plays. There is probably no writer whose, Whose merits are more variously estimated, some enthusiasts thinking him fit to compare with Kalidas.......

The country is over run with men of this sopt and Mr. Datt's Picture is true of life, but they must not be confounded with the really cultivated class.

● মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যের সমালোচনা সে দিন কে করেন নি? বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা মধুসূদনকে পাগল সাব্যস্ত করতেও দ্বিধা করেন নি। মেঘনাদবধ সম্পর্কে ভিন্ন পণ্ডিতের ব্যর্থ সমালোচনা আজ আমাদের কাছে বিশেষ লজ্জার কারণ। মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা করতে তদানীন্তনকালে সকলেই একবার 'বুড়ি' স্পর্শ করেছেন। অতি সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ পর্য্যন্ত, সাধারণ মানুষের ব্যর্থ সমালোচনার খুব একটা ব্যথার সৃষ্টি করত না। অর্থাৎ কবি কর্ণপাত করতেন না। তিনি এইসব অজ্ঞ সমালোচকগণ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন।

● একবার মধুসূদন গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পদস্খলিত হয়ে বিশেষ আঘাত পান, কবির কোন বন্ধু এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে কবিকে দেখতে যান। যুবকটি নিজেকে খুব বড় দরের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ভেবে গর্ববোধ করত, মধুসূদনের সঙ্গে যখন ইংরাজীতে বাক্যালাপ করছিল, তখনই মধুসূদন তার ইংরাজী ভাষার দখল সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান হয়েছিলেন, বেশিক্ষণ কথা বলেননি, কিছুক্ষণ পরে কবি তাঁর বন্ধুটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই যুবককে লইয়া বড় বড় সাহেবের নিকট যাইও না, ইহাকে দেখিয়াই সাহেবরা শিক্ষিত বাঙালী যুবকের নমুনা বুঝিয়া লইবেন।' These are The specimens of educated Bengalees, ঠিক সেই সময় মধুসূদনের নেশার উদ্রেক হয়েছিল, বিধাতা এমনই নির্ম্মম, তাঁর পান পাত্রে একটি মাছি এসে পড়ল। এই অবস্থা দেখে কবি বিস্মিত হলেন, পান করা আর হল না, তাকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করে যুবকটিকে পড়তে বললেন, যুবকটি কবির বাংলা হাতের লেখা পড়তে পারছিল না, কবি আবার বললেন, 'পড় ভদ্রলোক কবির হাতের লেখা পড়তে না পারায় ফিরিয়ে দিল, ঠিক সেই সময় এক ফিরিঙ্গি বন্ধু কবির কাছে উপস্থিত হল, কবি কবিতাটি তাঁহার হাতে দিয়ে বললেন, Just read this young man. যুবক বাঙালীটি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি পারলাম না— সাহেব কি করে বাংলা বুঝবে। মধুসূদন উত্তর দিয়েছিলেন "ও একজন প্রকৃত পণ্ডিত সাহেব"। তৎক্ষণাৎ কবির হস্তলিখিত কবিতাটি পড়ে দিলেন। যুবকটি অবাক চোখে কবির দিকে তাকিয়ে রইল। এই জাতীয় অনেক শিক্ষিত শ্রেণী মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করতেন। ঐ ব্যক্তির নাম প্রিয়নাথ কর। প্রিয়নাথের মত একব্যক্তি যিনি বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। পড়াশুনা না করেই মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করত। তার উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন—তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নতুন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোক তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য, যা তোদের বাংলা ভাষায় মুকুটমণি। তাকে আদ্যোপান্ত করতে কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হল? তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি যায় আসে? এই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমালয়ের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর খুঁত ধরতে যারা ব্যস্ত ছিলেন, সেই সব সমালোচকেরা কোথায় ভেসে গেল। মাইকেল নতুন ছন্দে, তেজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণ কি বুঝবে? স্বামীজি মেঘনাদবধ কাব্যের একটি বিশেষ অংশ নিজে পাঠ করে শিষ্যকে শোনালেন। স্বামীজির সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরুক।

সমালোচক ও বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন—যদি বাঙ্গালার সমস্ত কবিদিগের একটি সভা হয়, আর সেখানে যোগত্য অনুসারে সকলের আসন নির্দেশ করা হয়; তাহলে মাইকেল

বসবেন ঘরের ভিতরের এই চেয়ারে, আর আমার যদি কোন স্থান সেই সভায় থাকে তাহলে সেটা এই বাড়ির ফটকের কাছে। এ কথাও তিনি বলেছিলেন, "বাংলায় এমন কবি এ পর্যন্ত জন্মান নাই, যাঁহাকে মাইকেলের উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।' 'ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের (আষাঢ় ১৩২০) সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আরও লিখিয়াছিলেন,—(তখনও রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পাননি।)

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধিরসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন এক উত্তাল ভাব সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরাজি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।.....মাইকেলও তেমনই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নতুন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ও মাইকেল আধুনিক বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক। এই দুই ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের শাসন কর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের কদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন......। বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি দান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাইকেলের জননী। হতাশার কারণ নাই।

১৩২১ সনের চৈত্রে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ও মেঘনাদবধ মহাকাব্যের উপর যে বিশেষ বক্তব্য রাখেন তাহাও উল্লেখযোগ্য—

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সাজাইয়াছেন, মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ হয়, হয় না সত্য কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই?

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যও "পুরাতন প্রসংগে" মধুসূদনের প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন—

মাইকেল প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল রামায়ণ মহাভারত হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত। রাজনারায়ণ বসু শুধু সুহৃদ ছিলেন না, কিম্বা মাইকেলের শুধু কঠোর

সমালোচনাই করতেন না। মাইকেল প্রায় সময়ই রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করতেন মেঘনাদবধ কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে। রাজনারায়ণ বলতেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! সকল কবিদের এমনই একটি ব্যাধি আছে; স্বয়ং কবি জয়দেবও নিজ কাব্যের জন্য আত্মশ্লাঘাতে ভুগতেন—জয়দেব বলতেন—

মধুর কোমল কান্ত পদাম্বলী;
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতী;

কবি হাপেজও বলতেন, আমার কবিতা এত মধুর যে আকাশ মণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর তাহার উপর মুক্তা বর্ষণ করিতেছে, সে হিসাবে মাইকেলও সেই ব্যাধির সঙ্গে সংপৃষ্ঠ তো থাকবেনই। কারণ তিনিও প্রতিভাবানদের মধ্যে অনন্যা।

প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রই তাঁর লক্ষণ কিছুটা বিষদৃশ ও কিম্ভূত। আশার মোহেই এদের মহা উত্তরণ ঘটে থাকে, খামখেয়ালীপনাও কিছুটা পরিদৃশ্য। বিশেষ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে—

মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা সবে শেষ হল, এখনও গ্রন্থকারে আসে নি, পাণ্ডুলিপিতে আছে, সময়টা ইং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ—দিগম্বর মিত্র (পরে যিনি রাজা হয়েছিলেন) তাঁর নিজ বাটীতে বসে আছেন, হঠাৎ মাইকেল উপস্থিত হলেন এবং বসলেন দিগম্বর মিত্রের পাশে, কবি মিত্র মহাশয়কে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মহত্ত সম্পর্কে বোঝালেন, কবি জোর করেই তাঁকে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করালেন—এমন মহাকাব্য বঙ্গ সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি সম্ভব নয়। তিনি 'মেঘনাদবধ' থেকে নানা অংশ তুলে ধরলেন—

"হেন ভাষি যোভ, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব দেব মাতা।
যুগল মুরতি উর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শস্প নয়ন—রঞ্জন
শিশির মুকুতা ফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধ্যা জাফরান দল
কোমল কুসুমগুচ্ছ হয়ে শয্যাধাম,
কঠিন পৃথিবী হতে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরসে দম্পতি তথা সুবর্ণ মণ্ডিত

মিত্র মহাশয় তাঁর শব্দ প্রয়োগ ও সংযোজন ভাষাড়াম্বর কিছুই বুঝলেন না, তবে এইটুকু বুঝলেন যে অভিধানের এই দুরূহ দুরূহ শব্দগুলিকে চয়ন করে এক সাথে গেঁথেছে। কবি মধুসূদন, মিত্র মহাশয়কে নানারকম ভাবে বোঝালেন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার আগ্রহ কবির ভীষণ কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। শেষ পর্য্যন্ত মিত্র মহাশয় মেঘনাদবধ কাব্যের মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ভার বহন করলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় কবি গ্রন্থখানি উৎসর্গও করলেন মিত্র মহাশয়ের নামে, উৎসর্গ পত্র যেমনভাবে লিখেছিলেন—

মঙ্গলা চরণ
বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়
বন্দনীয় বরেষু।

আর্য্য—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যে অকৃত্রিম স্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধহয় এ অভিনব কাব্য কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে, তবু আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহসপূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীনদেখায় না। যখন আমি 'তিলোত্তমা সম্ভব' নামক কাব্য রচনা করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এদেশে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ত্বরায় আদরণীয়া হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয় নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রের সংরোপিত হইয়াছে। বীর কেশরী মেঘনাদ কঠোর সুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিত মধ্যে সমাদৃত হইলে আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা ইতি — ·

২২শে পৌষ, সং ১২৭৬ সাল দাসশ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যে দিগম্বর মিত্রকে কবি আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করেছেন, নিজেকে সমর্পণ করেছেন শ্রীমিত্রের পদতলে, যাকে মহান স্থানে উপবেশন করিয়েছেন, অর্থের প্রয়োজনে, কবি শ্রীমিত্র মহাশয়কে উদার ও অমায়িক আখ্যা দিয়ে নানা সম্মানে ভূষিত করেছেন, সেই মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে কবির সম্পর্ক পরবর্তীকালে কেমন হয়েছিল একটা পত্রের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যেতে পারে, পত্রখানি লিখেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, দিগম্বর মিত্র কত বড় খল ও চতুর লোক তার সম্পর্কে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র গ্রন্থের ভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবি দিগম্বর মিত্রের উপর বৈষয়িকী ব্যাপারে এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন দেশে ফিরিয়া আমি দু-একটি মানুষ হত্যা করিব, তাহার মধ্যে দিগম্বর মিত্র প্রধান।

আবেগ প্রবণতা কবির মধ্যে যে কত প্রকটভাবে ছিল তাহা আজ আর লুক্কায়িত নয়। অর্থের জন্য তিনি ছুটেছেন শুধু ছুটেছেন। জনৈক ব্যক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য ও বৈষয়িক আলোচনা কালে বলেছিলেন, মধু মোহগ্রস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে ভ্রান্ত পথে চলতেন, তিনি বুঝতেন, জানতেন তবুও আশার এক দারুণ মোহে অন্ধের মত কন্টককীর্ণ পথেও পা বাড়তেন। টাকা ধার সেই করতে পারে যার টাকা আছে, তদানীন্তনকালে মধুর বাবার ৭৫০০০ টাকার সম্পত্তি ছিল, এবং মধুই ছিল তার সম্পূর্ণ অধিকারী। তাঁর আভ্যন্তরীণ দুই বৃহৎ মহাশক্তি দুরন্ত বেগে প্রতিনিয়ত কাজ করত। তাই মধু বাঁধা মানতেন না—তাই অর্থকে তিনি ধূলিমুষ্ঠির ন্যায় জ্ঞান করতেন, বলতেন অর্থের কোন স্বামী নাই, সে বারবনীতা যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন, মনোরঞ্জন করে অর্থ। এ আমারও না তোমারও না। তাই তিনি তাঁর সৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বেঁচে থাকতে। তৎকালীন অনেক পণ্ডিত মহল মধুসূদনের কাব্য প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, একস্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতি বিশেষ করুণ কণ্ঠে দুঃখ করে বলেছেন— জনৈক কবি।

সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কঠোর সমালোচনায় কত গ্রন্থকারের মুকুলিত আশা উদ্যম মুকুলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এমন কি কে কেহ লেখনীর তীব্র বিষাক্ত আঘাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অনেকে বলেন Keats কবির যে অকাল মৃত্যু হয়, তীব্র

সমালোচনাই তার কারণ। কবি বর Tasso সমালোচনায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। Montesquiec কঠোর সমালোচনার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিন্দুক সমালোচকদের হৃদয়ভেদী সমালোচনায় কবিবর Shelly দেশত্যাগী হন, তাহার পর হইতে সমস্ত জীবন তিনি অসুখে কালযাপন করেন।

তিনি তাঁহার বন্ধু Leigh Hunt কে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি লিখিয়াছেন আমার বুদ্ধি বৃত্তি সকল চূর্ণ ও বিচূর্ণ জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর কিছুই লিখতে পারি না। তবে এদেশের লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মধুসূদনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, আত্মশক্তিতে তিনি এত দূর বিশ্বাসভাজন ছিলেন যে কোন প্রকার প্রতিকূল সমালোচনাতে তিনি দৃকপাত করতেন না; কখনও ভীতু বা বিচলিত হতেন না, তিনি রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকে বারবাব কঠোর সমালোনার স্তুতি শুনেছেন, কিন্তু কবি শ্রীবসুর উপরই বেশী আস্থা রাখতেন, কারণ রাজই একমাত্র নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে পারে, একখানি পত্রে কবি প্রিয় রাজকে লেখেন,

If you should received the work, pray don't spear me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserved, I am not a man to be put out any amount of adverse criticism especially when that criticism is from an honest friend. Who wishes me well.

মধুসূদনকে নিয়ে কতই না বক্র ও তির্যক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে কলুষিত করবার জন্য অনেকেই যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিলেন, কবি মধুসূদন এই বিষয় নিয়ে কোথাও বাত-বিতণ্ডা করেন নি। তিনি মূল্যবানের মূল্য সকল সময় চুকিয়ে দিতেন, মহৎকে কখনও ছোট করেননি। মধুসূদন যে কতখানি মহানুভবতা ও গৌরবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা কেবল তাঁর মত মহান প্রাণের পক্ষেই সম্ভব হয়, তাঁর এই মহান প্রাণের কথা বলতে গিয়ে "সমাজ দর্পণ" সম্পাদক লিখেছিলেন, তিনি কবিগণের বা গুণীজনের অবমাননা করিতেন না। অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দশপদী কবিতায় আপনাব আলোক সামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা ভারতের অপেক্ষা মহান বলিতেন। অথচ তিনি আপন চতুর্দশ পদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণীদিগের অন্তরের সহিত স্তব-স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিৎ বটে, চারিদিকে যশঃ সৌরভ নিঃসারিত হইতেছে, অথচ অভিমান নাই, কেবল গোলাপ ফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে তিনি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা তাঁর লেখা কবিতায় পাওয়া যায় অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করা হল—

কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবি কঙ্কন,
ধন্য তুমি বঙ্গ ভূমে! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিনী
বাগ্দেবী!

কবি মধুসূদন মহৎ তাই কখনও কারোর ব্যর্থ সমালোচনা করেননি, কোথাও ঘৃণ্য কুৎসা আলোচনা করেন নি। প্রশংসা করেছেন অন্যান্য কবিদের কাব্য প্রতিভার জন্য—রায় গুণাকার ভারতচন্দ্রকে "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি" সম্বোধন করে বলেছেন—

তব বংশ-যশঃ ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রে মণ্ডলে।।

চির আদরের কবি কাশীরাম দাসের প্রতি যে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁর কবিতার অংশ বিশেষ অনুধাবন করা যায়—

—ভাষা পথ খননি স্ববলে,
ভারত রসের স্রোত ঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে!

কৃত্তিবাসের প্রতি—জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীৰ্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবি পতি
নয়ন রঞ্জন রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মানিকের দেহে!

জয়দেবের প্রতি—আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, করিও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

মহাকবি কালিদাসের প্রতি তাঁর যে বন্দনা—
কবিতা নিকুঞ্জে তুমি পিককুল পতি।
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?

কবি কৃত্তিবাস বন্দনায় তিনি আরও গভীরভাবে সনাতনী ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে কোথাও রামচন্দ্র সীতা অথবা হনুমানকেও ছোট করেন নি। তিনি একটি বীর রসের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন কাউকে ছোট করবার জন্য নয়। অনেক সমালোচক বিসদৃশ ভাবনা ভেবে নানা উদাহরণ টেনে মাইকেল দত্তকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

মহৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট্য ব্যক্তিগণ বাগাড়াম্বর করে পরিতৃপ্ত হন। কবির জীবনের একটাই উদ্দেশ্য—মহৎ ই মহৎ তাকে ছোট করা যায় না।

মধুসূদন একে জায়গায় লিখছেন—

পবন নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সংগীত লহরী;—
তেমতি, যশস্বী, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামে নাম সুমধুর তানে
কবি পিতা বাল্মিকীকে তাপ তুষ্ট করি।

বিদেশে থাকতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের প্রতি যে কতখানি অসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিলেন তা তাঁর একটি কবিতাতেই প্রতীত হয়—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ।

বিদ্যাসাগরের প্রতি কবির এত স্তব-স্তুতি করবার কোন দরকার ছিল না, কারণ মানুষ তো মানুষকে কত উপকার করে, প্রচুর অর্থ ঋণ দেয়, কিন্তু কে কার কথা মনে রাখে? কবিও তো বিদ্যাসাগরের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছিলেন তাঁর নিজ সম্পত্তি বিক্রি করে। তবে কেন এত স্তব-স্তুতি। এই খানেই মহান প্রাণের মহানুবতা। এমন সহজ সরল প্রাণ গোটা পৃথিবীতে কটা জন্মেছে, তিনি বিদ্যাসাগরের কথা জীবনে ভোলেন নি, কিন্তু অনেকের কথাই ভুলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের অসীম করুণা, গভীর স্নেহ, প্রাণের ভালবাসা, যা ছিল সাগরের জলচ্ছ্বাসের ন্যায় সরল সহজ ও পবিত্র, এই যার আছে তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা কার না থাকে। বিদ্যাসাগরের কথা উঠলেই কবি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারি ধারা বর্ষণ করতেন এক দারুণ কৃতজ্ঞতায়।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিভিন্ন সমালোচকদের ভিন্ন আলোচনা কিঞ্চিতকর প্রয়াসে সমাপন করার চেষ্টা করব।

ব্রজঙ্গনা কাব্যে'র প্রারম্ভে একটি মধুর ঘটনাও সন্নিবেশ করলাম।

ব্রজঙ্গনা কাব্যে যে রসধারা প্রভাবিত তাহা মানব মনের অন্তস্থলে নিদারুণ ভাবারসের উদ্রেক করে প্রতি মুহূর্ত্তে। কি অদ্ভুত পূর্ববিবরণ, যাহা একজন পূরদস্তুর সাহেবের পক্ষে কোনক্রমে সম্ভব নয়, তাতে আবার দুর্নিবার গতিতে ভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রভাবিত, এই হ্যাট কোটের মধ্যে যে কিয়ৎ পরিমাণ সাহেবীয়ানা নাই, সেটা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে—নচেৎ এমন জাতীয়তাবোধ কোন স্বদেশী কবির মধ্যেও প্রতিত হয় না—ব্রজঙ্গনা কাব্যে কোন একটি বিশেষ অংশে কবির কি মধুর প্রেম দান, বঙ্গ জননী তা কখনও ভুলতে পারে না। শ্রীরাধিকা একটি ময়ূরের প্রতি যে সহানুভূতি হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়াছেন তা বোধহয় অন্য কোন কবির হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না—এমন বিবরণ প্রকাশ করার জন্য চাই মহান ও পবিত্র প্রাণ যা কেবল শ্রীমধুসদনের পক্ষেই সম্ভব। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে লিখছেন—

আয়, পাখী, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস দান
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে বাধা রাধিকা রঞ্জনে?
তুই ভাব মনে ধ্বনি—আমি শ্রীমাধবে।

শ্যামের অদর্শনে পবন শন্ শন্ করে বইছে। বিহঙ্গকুল অধীর হয়ে সুমধুর কণ্ঠে গান ধরেছে, সকলেই উন্মাদিনী শ্যাম বিরহে, সখীদের চোখে অশ্রু, চারিদিক যেন শ্যাম বিরহে উন্মাদিনী ঠিক এমনই অবস্থাতে সরলা রাধিকা সকলের প্রতি যে মিনতি প্রকাশ করছে—বিষয়টি সহজ করবার জন্য তাহা কবির কলমে অপূর্ব অভিব্যক্তি।

কেন এ বিলম্ব আজি কহ ওলো সহচরী

করি এ মিনতি?
কেন অধো মুখে কাঁদ আবরি বদনচাঁদ,
কহ রূপবতী?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখী,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে?
কেন বিলম্বে হেন কালে? চল কুঞ্জবনে,
কাঁদিব লো সহচরি ধরি সে কমলপদ,
চল ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনী।
সুধে মধু শূণ্য কুঞ্জে কি কাজ রমণী?

স্বজাতীয় প্রীতিতে মধুসূদনের যে প্রাণ কতখানি ছিল ব্রজঙ্গনা কাব্যই তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একবার একটা মধুর ঘটনা মধুর জীবনে ঘটেছিল হয়ত অনেকেরই জ্ঞাত—।

সাহেব মাইকেল তাঁর নিজের ঘরে বসে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি লিখে যাচ্ছেন, সাহেবের অপূর্ব শ্রী, রংকৃষ্ণকায় কোট প্যান্ট টাই, মাঝে মাঝে কলম রেখে পান পাত্র হাতে নিয়ে কি যেন গলাধঃকরণ করছেন, প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিলাতী স্টাইল, এমনকি লিখবার ভঙ্গিটিও অসাধারণ। ঘরের বাইরে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে উঁকি মারছেন, সাহস হচ্ছে না—ঘরে প্রবেশ করার, ঐ গাম্ভীর্য্যের কাছে ঠাঁই সে নাও পেতে পারে। আগন্তুকের প্রয়োজন তো সাহেবকে নয়, দরকার ব্রজঙ্গনা কাব্যের কবিকে।

ভদ্রলোক অনেক দূর থেকে এসেছেন, নবদ্বীপ, অনেক খুঁজে বাড়ী বার করলেন, সবই ঠিক কিন্তু কবিকে খুঁজে পাচ্ছেন না, কবি তো সাহেব নন, এমন প্রাণমনোহারিণী কবিতা এমন সাহেব মানুষের পক্ষে লেখা তো আদৌ সম্ভব নয়। সাহেব মাইকেল দত্ত আপন মনে লিখে চলেছেন, ওদিকে ভদ্রলোক অতিশয় চিন্তিত ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, বার বার উঁকি মারছেন, ভদ্রলোক সাহেবের চোখ এড়াতে পারলেন না—টেবিলের উপর কলম রেখে মাথা উঁচু করে সাহেবী ঢংয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাকে খুঁজছেন? এবার পরিস্কার ভাষায় বললেন,—

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—এ বাড়িতে মধুসূদন দত্ত থাকতেন?

সাহেব—কেন? তাঁকে আপনার কি প্রয়োজন?

আগন্তুক—আমি বৈষ্ণব, তাঁহার প্রাণমনোহারিণী ব্রজাঙ্গনা কাব্য পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। অমন মানুষকে একবার চোখে দেখাও পুণ্য। বৈষ্ণব শেখর পুণ্যবান মধুসূদনকে দেখব বলে নবদ্বীপ থেকে এসেছি। এমন প্রাণের কথা বৈষ্ণব শেখর মধুসূদন ছাড়া আর কে লিখবে। তাঁকে দেখে একবার জীবন সার্থক করার জন্য অতদূর থেকে এসেছি। দয়া করে বলবেন, তিনি কোথায় থাকেন? আপনার এই ঠিকানায় আমাকে কয়েকজনের অনুরোধে আসতে হয়েছে, দয়া করে সত্বর বলুন—তিনি কোথায় থাকেন, আমি তাঁর শ্রীচরণ দর্শনে অতীব উদ্‌গ্রীব।

সাহেব বৈষ্ণবের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে কি যেন ভেবেই বললেন—আমিই শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের উত্তরে বৈষ্ণব স্তম্ভিত, নির্বাক, কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নেত্রে কবির দিকে তাকিয়ে রইল আবেগভরে।

হঠাৎ বৈষ্ণব চিৎকার করে বলে উঠল—"বাবা! তুমি শাপভ্রষ্ট"।

মধু বৈষ্ণবকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং তাহার সমুদয় আহারাদির সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনাকালে কবির জীবনে আর একজন ব্যবসায়ী বৈষ্ণব জুটেছিল এবং কবির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন—উক্ত বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য ছিল অন্য।—কবির পবিত্র সরলতার সুযোগ নিতে সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিল—এমনকি বৈষ্ণবগণ পর্য্যন্ত বাদ যাননি—

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মধুসূদনের রচনায় বৈষ্ণবেরা ও যে কতখানি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন তাহাও অবর্ণনীয়। মানুষ যে কত চতুর ও আত্মস্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে তা কবি মধুসূদন খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন। কবি তখন সবে ব্রজঙ্গনা কাব্য শেষ করেছেন, বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত নামে এক বৈষ্ণব পাণ্ডুলিপিটি পড়েন এবং এতবেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তার মাথায় নানা রকম ব্যবসায়ী বুদ্ধি জাগরূক ঘটতে লাগল, বৈষ্ণব- কবি মধুসূদন দত্তের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন, যদিও বৈষ্ণবটি কাব্য রসিক ও সমজদার। তথাপি তিনি কবির কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করবার জন্য নানারকম ব্যবসায়ী ফন্দি আঁটতে লাগলেন—কবিকে এমনভাবে বোঝালেন এবং ব্রজাঙ্গনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন, যে কবি তার কথায় সম্পূর্ণভাবে মজে গেলেন—কবিকে প্রলোভনও পর্যন্ত দেখালেন যদি তিনি পাণ্ডুলিপিটি দেন তাহলে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে প্রকাশ করবেন। কবি গ্রন্থ প্রকাশের মোহে ব্যবসায়ী বৈষ্ণবের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, তিনি গ্রন্থসত্ত্ব পর্য্যন্ত বৈষ্ণবটিকে দিয়ে দিলেন।

কবির মহান প্রাণের সরল উদারতার সুযোগ সকলেই গ্রহণ করেছেন, কবি কিন্তু জ্ঞাত অবস্থায় সবই করেছেন, যে পরম সত্যের উপলব্ধি অন্যের মধ্যে নেই যা কবি সমস্ত উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের সবকিছুই সহজভাবে উৎসর্গ করতেন—এই খানেই কবির মহত্ব।

১৮৫৯ সাল, প্রায়ই সন্ধ্যা বেলা পাইক পাড়ার রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সুরম্য উদ্যান বাটিকার নিম্নস্থ হলে সোপায় বসে অন্যান্য পণ্ডিত ও রাজাদের সঙ্গে রত্নাবলী নাটকের মহড়া নিয়ে আলোচনা করতেন।

মধুসূদন পুলিশ কোর্টের কাজ সমাপন করে মাঝে মাঝে সেখানে (মদ্য পান) সন্ধ্যা আহ্নিক করতে যেতেন। একদিন যতীন্দ্র মোহন কথায় কথায় বললেন ভাষা দুর্বল হলেও রত্নাবলী একটি উন্নতমানের নাটক। মধুসূদন বললেন—যতদিন না বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন বাংলা ভাষার দুর্বলতা কাটতে পারেনা—

যতীন্দ্রমোহন মধুর কথা শুনে হাসলেন, বললেন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন সম্ভব নয় আর তাছাড়া আমাদের বাংলা ভাষার যে রূপগঠন তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুললিত পদবিন্যাস কখনই উপযোগী হতে পারে না। মাইকেল কোন মতেই একমত হতে পারলেন না— বললেন, চেষ্টা না করেই যে আপনারা বিফল হচ্ছেন, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন সম্ভব কিনা—

যতীন্দ্রমোহন আবার হাসলেন, বললেন আপনার ঈশ্বর গুপ্তের লেখা কবিতাটি কি স্মরণ আছে? আপনাকে লক্ষ্য করেই তিনি লিখেছিলেন বোধ হয়, শুধু আপনাকে উদ্দেশ্যে নয়, ব্যঙ্গ করেই লিখেছিলেন।

কবিতার দুটি লাইন শুনুন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

মধুসূদন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন গুপ্ত কবির পক্ষে একথা বলা সম্ভব—কারণ তিনি হাজার চেষ্টা করলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করতে পারবেন না, আর আমি সহজেই পয়ার ছন্দে কবিতা লিখে দেব এই সৃষ্টি কেবল আমার পক্ষেই সম্ভব শুনুন কয়েকটি লাইন।

হৃদয় মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙাপদে—
থাক বঙ্গ গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতরাং আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা হৃদে!

মধুসূদন কি না পারে এটাই আগে ভাবুন, আমাকে নিয়ে অনেকেই কুৎসা রটনা করতে পারে, নিন্দুকরা অনেক ঘৃণ্য সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু আমি তো তাদের নিন্দা করতে পারি না। বৃদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে .... বলতে বলতে থেমে গেলেন। কথার মোড় ঘুড়িয়ে দিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বললেন ফরাসী ভাষা নিঃসন্দেহে বলশালী ভাষা, তবুও এ পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি তবু বলতে হয় সে ভাষা আমাদের থেকে উন্নত, সেই দিক দিয়ে বাংলা ভাষায় এই ছন্দ সার্বিক ভাবে প্রয়োগ করা কষ্ট সাধ্য। আমরা জানি বাংলা ভাষা বলশালী প্রসূতির দুহিতা, কিন্তু কর্মেই এখন এই দুহিতা ভাষাকে দুর্বল বলেই প্রতীত হয়।

মধুসূদন গম্ভীর হয়ে বললেন, অতি অল্প অল্প কালের মধ্যেই আমি আপনার এ ভ্রম ভেঙ্গে দিতে পারি, বাংলা ভাষা কোন ক্রমেই দুর্বলের ভাষা নয়। (যদিও কবি একদা বলেছিলেন বাংলা ভাষা দুর্বলের ও বর্ব্বরের) আমাদের ধরে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে সত্যকে, তাই নিয়ে বাকবিতণ্ডার মধ্যে গিয়ে কবিকে হেনস্থা করার কোন যুক্তি নেই। অল্প বয়সের গতি দুর্নিবার তাই স্মরণ থাকা দরকার কবির ঐ বক্তব্য নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা করা প্রয়োজন নাই। (ওসব তর্কের খাতিরে বলতেন, আসলে মাতৃভাষা ছিল কবির কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ)

কবি বলতেন, আপনাকে আমি অতি অল্প দিনের মধ্যে একখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর

কাব্য লিখে এনে দিতে পারি, যদি আমার দ্বারা সম্ভব না হয়, আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাই বলবেন, যতীন্দ্রমোহন বললেন—যদি আপনি পারেন তাহলে আপনার মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার আমিই গ্রহণ করব। মধুসূদন উল্লাসে রাজাকে জড়িয়ে ধরে জোরে করতালী দিয়ে বললেন, আপনি দুই তিন দিনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবির কিয়দাংশ পাইবেন।

ঠিক তিন দিনের মাথায় কবি তাঁহার 'তিলোত্তমা' কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করে পাণ্ডুলিপিটি রাজার হাতে তুলে দিলেন, রাজা যতীন্দ্র মোহন আরও কিছু গুণমুগ্ধ পণ্ডিত ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে পড়ে শোনালেন, সকলেই চমৎকৃত ও গর্বিত।

যতীন্দ্র মোহন বললেন—আপনি যে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে সফল কাম হয়েছেন, এবং আপনার রচনা কৌশলে ছন্দের শিল্প নৈপুণ্য কবিতার ভাব ও মাধুর্য্য যে সর্বজন গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই, কবির চিরাচরিত রীতি অনুসারে যতীন্দ্রমোহনকে জোরে করমর্দন করলেন। তারপর ১৮৬০ সালে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য মুদ্রিত হল, এবং মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কথা রেখেছিলেন, তাই তিলোত্তমা'র সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছিলেন।

কবি তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যখানি যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বই লিখলেই তো হবে না, তা প্রকাশ করা কর্তব্য, প্রকাশ করতে চাই প্রচুর অর্থ, কবির সে অর্থ কৈ? যখনই যিনি গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন কবি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহার নামে উৎসর্গ করেছেন। মধুসূদন উৎসর্গ পত্রটি কেমন ভাবে রচনা করেছিলেন—

মঙ্গলা চরণ

মান্যবর শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেষু বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ, যে উদ্দেশ্যে 'তিলোত্তমা' সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্য মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হল, এতদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা, এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত সে শুভকালে এ কাব্য রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক ও যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না। সে যাহা হউক, এ কাব্য আপনার নিকট সর্বদা সমাদৃত থাকিবেক। যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রহকতা, এবং বন্ধুতা গুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যে রূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যা দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি ইতি—

গ্রন্থকারস্য—

'তিলোত্তমা' সম্ভব কাব্য কবিত্বে সৌন্দর্য্যে প্রাণহরণকারিত্বে, রসাস্বাদনে যে কতখানি স্ফটিকবৎ

ও কল্লোলিনী তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়—আজও তিলোত্তমার জলধারা সমানে প্রভাবিত মানব জীবনে তার প্রভাব যে কত মর্মস্পর্শি তাহা প্রতি সর্গের সামান্য অংশ উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হইতে পারে।

প্রথম সর্গে কবি ধবল গিরির বর্ণনা করেছেন।

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেবআত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অতল, অটল;
যেন উর্দ্ধ সদা, শুভ্র বেশধারী,
নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোম কেশ শূলী—
যোগী কুলধ্যেয় যোগী। নিকুঞ্জকানন,
তরু রাজী, লতাবলী, মুকুল কুসুম,
অন্যান্য অচল ভালে শোভে যে সকল
(যেন মরকতময় কনক কিরীটি)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবী পতি পৃথ্বামুখে যেন জিতেন্দ্রয়।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মালোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়া জলে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু হে শারদে, দেবী বিশ্ব বিনোদিনী,
তব বলে বলী যে মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে?

দ্বিতীয় সর্গে কবি এক দারুণ আত্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন—যে আত্মবিশ্বাস তিনি ব্রহ্মালোকে পৌছতে পারেন, সেখানে যদি কিছুই না থাকে তার জন্যও তিনি বিচলিত নন সামান্য শক্তিই হবে ব্রহ্মশক্তি, যে শক্তির মাধ্যমেই কবি পৌছাবেন পরম অমরাবতীতে—

তৃতীয় সর্গে কবি সৃষ্টি করতে চলেছেন তিলোত্তমা। সৃষ্টির বিশ্ব মনোহারিণী রূপ। তার জন্য চাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি বিশ্বকর্মাকে অর্থাৎ দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার আহ্বানে তিলোত্তমা সৃষ্টির রূপ বর্ণনা করেছেন। এমন অপূর্ব বর্ণনা পয়ার ছন্দে কোনক্রমেও সম্ভব হয়'ত হতো না—ভাবের কিরণ ধারা শব্দের মূল্যে অলঙ্করণে পরিপূর্ণতা, আহা যেন মধুময় চন্দ্র কিরণ, তিলোত্তমা যেন কবির সর্বৎকৃষ্ট প্রেয়সী, তা না হলে এমন বর্ণনা কি সম্ভব? মনের গভীরে যদি এ রূপ না থাকে তাহলে প্রকাশ কি করে সম্ভব—।

.... যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখাদেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস রাগ।............
.. তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অ-কলঙ্ক ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃ পুঞ্জ, দুইখানি করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেন দেব পদে আমি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধরদেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃত রসে; গজ মুক্তাবলী
শোভিলরে দন্ত রূপে বিশ্ব বিমোহিয়া
আপনি রতি রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরু ছুলে বসাইলা নয়ন উপরে;

চতুর্থ সর্গে দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে যাচ্ছে তিলোত্তমা ইন্দ্রের আদেশে, তিলোত্তমা-চলেছেন ধীর পদক্ষেপে তাঁর চলার বর্ণনা কবি এক স্বর্গীয় মর্যাদায় পরিণত করেছেন।

প্রবেশিলা কুঞ্জ বনে কুঞ্জর গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নব কুল বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুল বনে কুরঙ্গিনী, কভু
চমকে রমণী শুনি নুপুরের ধ্বনী;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্মরে;
মলয় নিশ্বাসে কভু; হায়রে, কভু বা
কোকিলের কুহু রবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন হিল্লোল। এই রূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ পরশে
সম্মোহন বানাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি

চন্দ্রচূড়! বনদেবী যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতে ছিল। ফুল রত্ন মালা
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোহাইতে কুঞ্জবিহারীর বর গলে)
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অক্লান্ত তুলি,
রহিলেন এক দৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধিব মাগি মনে মনে

কবির বর্ণনা কি সুমধুর, শব্দপ্রয়োগে নানারূপ গোলযোগ থাকতে পারে কিন্তু ভাব প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে বাগদেবীর বরপুত্র বলে স্বীকার করতে হবে। কবি একস্থানে উল্লেখ করেছেন প্রবেশয়ে ব্যাকরণগত সামান্য ত্রুটি থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য, বহু সমালোচক এই তিলোত্তমা কাব্যের সমালোচনা করেছেন, অহেতুক উল্লেখ করে কবির প্রতি কটাক্ষ করার কোনো দরকার নাই। সমালোচনা করলেই হয় না। সমালোচক হবার উপযুক্ততা অর্জন করা দরকার। সে কারণ সমালোচনার বিষয় উল্লেখ না করাই কর্তব্য।

তিলোত্তমা'র পাণ্ডুলিপিটি যখন কবি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হাতে তুলে দেন, রাজা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন, তিনি তাহা তাঁহার লাইব্রেরিতে অতি যত্ন সহকারে আজীবন রক্ষা করেন। "মধুসূদন পাণ্ডুলিপিটি স্বহস্তে উপহার দিতেছেন এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা হস্ত-প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবে একখানি ছায়চিত্র তদানীন্তন ফটোগ্রাফার রিগেন কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত হইয়া ছিল। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অতিশয় আনন্দিত হইয়া কবিকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশ দেওয়া হইল।

My dear sir,

I know not how to thank you, adequately for the valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the poets own handwritting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks a grand epich in our literature when Bengali poetry first broke throw the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will than be proud to think that the manuscript in the author's autograp of the first Blank verse Epic in the languages, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an its valuable present by the poet himself.

....

....

Praying sincerely that you may live long to adorn the literature of our mother country with your inestimable contributions.

(22nd may, 1860) I remain, very sincerely
Yours J.M. Tagore,

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রমেশ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকল যশস্বী মনীষীগণ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে মধুসূদনের সম্মান মর্যাদা ও যশ খ্যাতি ক্রমান্বয়ে আকাশচুম্বি পর্যায়ে উপনিত হয়েছিল। যশস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা যথার্থই।

১৭৮২ শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সংবাদ পত্রে তিনি তিলোত্তমা'র সমালোচনা লিখতে গিয়ে বলেন—দত্তজ মহাশয় যথার্থ মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়, তাহা পরিত্যাগে কবিতা কামাবচর হইতে পারে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে যদি নয়ন নিক্ষেপ করা যায় তাহাতে কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই সুচারুরসাত্মকভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। যদিও ঐ সকল ভাব দত্তজ ভুবন বিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন, প্রভৃতি কবিকুল কেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যে নানা বিষয় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গ ভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

যে বিষয় আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করে—মধুসূদন ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ৯ই জুন, ক্যাণ্ডিয়া (S.S. Candia) জাহাজ করে আশৈশবের স্বপ্ন মধুর দেশ ইংলণ্ডে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল বঙ্গ ভাষার উন্নতি এবং ভাষা শিক্ষা ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। ভারতবর্ষে থাকাকালীন কবি ইংরাজী ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, তামিল, তেলেগু, পারসী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।—ইউরোপে এসে কবি ফরাসী, জার্মানী, ইটালী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষা শেখার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভাষা শেখার ব্যাপারে কবি বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্রও লেখেন—

Though I have been very unhappy and full of anxiety here. I have very nearly mustered French. I speak it well and write it better, I have also commenced Italian and mean add German to my stock of knowledge.-If not spanish and portuguese, before I leave Europe.

I hope to be a capital sort of European scholer before I leave Europe. I am getting on well French and Italian. I must commence German soon. Spanish and portuguese will not difficult after latin, French and Italian you cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe. I wrote a long letter in Itaian to Satyendra the others day but he has replied in English. I wonder why, I know he did a little Italian last year.

মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং

ভরসেলস্ নামক তখনকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুইবৎসরকাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়ে একশত কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দশমাত্রা পদ বিশিষ্ট। য়ুরোপ খণ্ড হইতে ইতিপূর্বে আর কখনও বাংলা কবিতা লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইবার নিমিত্ত কলকাতায় প্রেরিত হয় নাই, এইজন্য বন্ধুদিগের এবং সাধারণের সন্তোষার্থে কবিতাগুলির উপক্রমনিকা ভাগটি মুদ্রাক্ষরে না ছাপাইয়া যেরূপ লিখিত ছিল অবিকল অনুরূপ হস্তাক্ষরে ছাপাইলাম। উপক্রমটি দেখিয়া পাঠকবৃন্দ কবিবরের হস্তাক্ষরে বুঝিতে পারিবেন এবং যেরূপ কবিতাটি লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবেন। দত্তজ মহাশয় বিদেশে গিয়া এবং বিদেশে থাকিয়াও মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে বিরত হন নাই, তিনি দেড়মাসের মধ্যে বিদেশ থেকে প্রিয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অবকাশ কিছুইমাত্র ছিল না। রায় দীননাথ সান্যাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়গণ তাঁহারা পত্রিকায় কবিতাগুলি পর পর প্রকাশ করেন যথাক্রমে 'রহস্য সন্দর্ভ' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ও রায় দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত চতুর্দশপদী কবিতাবলী। সংবাদটিও প্রকাশিত হয় তদানীন্তন সংবাদপত্রেও।

কবির সকল সময় নতুন সৃষ্টির প্রতি নজর যাহা অসাধ্য তাহা তিনি সাধন করবেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি প্রথমকাব্য রচনা করলেন তিলোত্তমা। দ্বিতীয় কাব্য রচনা করলেন মেঘনাদ ও তৃতীয় বীরাঙ্গনা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত হল তিলোত্তমা। ব্যয়ভার বহন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দ্বিতীয় কাব্য রচনা করলেন মেঘনাদবধ কাব্য ১২৩৭ সালের পৌষ প্রথমখণ্ড ও ১২৩৮ সালে প্রথম দিকে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত করেন। মঙ্গলাচরণ করেন প্রথমবার দিগম্বর মিত্রকে পরে নিজ প্রয়োজনে ঐ উৎসর্গ পত্র প্রত্যাহার করেন। ১২৬৮ সালের ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলাচরণ করেন বঙ্গকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করকমলে। ইংরাজী ১৮৬১ সালে জেমস্‌লেনের বাটীতে অবস্থানকালে তাহা রচনা করেন, ১৮৬২ সালে পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর সমস্ত কাব্যতে প্রায় বীর রসের কথা বলছেন, শেষ পর্যন্ত বীর রস কোথাও বজায় থাকেনি— যতদূর সংগ্রহে জানা যায় কবি সনেট বিদেশীভাব অবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য একশ'রও বেশি কবিতা রচনা করেছিলেন এবং তা চতুর্দশপদী কবিতাবলী নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোথায় পেলেন, একি তাঁর নিজের সৃষ্টি? এই তিনখানি মহাকাব্য ইউরোপ যাবার আগেই রচনা করেছিলেন সাল পূর্বেই উল্লেখ করেছি—১৮৬২ সালে তিনি ইউরোপ পাড়ি দিলেন। অথচ বঙ্গসাহিত্যে এমন ধূমকেতুর মত এক অভিনব ভাষা সৃষ্টি কেমন করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হল—আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি তিনি বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন বিশেষ করে পারসী ও উর্দু—অভ্যাস সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয় না প্রচেষ্টা থাকলেই উন্নতি হবে—যেটা কবির মধ্যে ভয়ংকর ছিল। তিনি বহু ভাষায় মূল সাহিত্য পাঠ করতেন। উর্দুভাষায় তিনি চাহের দরবেশে পড়েছিলেন এবং তা কবিকে চমৎকৃত করেছিল। যেমন পেত্রাকের সনেট কবিকে মুগ্ধ করেছিল ঠিক তেমনি চাহের দরবেশ। অধুনা আরা জেলায় প্রবেশ করলে কিছু তথ্য মিললেও মিলতে পারে। সত্য সন্ধানের জন্য যাঁহারা সতত ব্যগ্র তাঁহারাই পারে নতুন কিছু করতে, তদানীন্তন কবি সাহিত্যিক প্রবন্ধকার জীবনকে খুব বেশী সরস্বতীর শ্রীচরণে উৎসর্গ করতে পারেন নি—যেমনটি কবি মধুসূদন পেরেছিলেন। তিনি চাহের

দরবেশ পড়ে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন দুর্বল বাংলা সাহিত্যের কথা। উর্দুভাষায়, পারসী ভাষায় যখন এত সুন্দর সুন্দর কাব্য সৃষ্টি হতে পারে তবে বঙ্গ ভাষায় হবে না কেন? চাহের দরবেশকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি তাঁর মত করে সৃষ্টি করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কবির অনুকরণ করবার দরকার ছিল না তাহা তিনি ইউরোপ প্রবাসের আগেই করেছিলেন বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের ভাব অবলম্বনে। তিনি সৃষ্টি কর্তা না হলেও বঙ্গ ভাষার রক্ষা কর্তা হয়েছিলেন।

কবি মধুসূদনের আর একটি লক্ষণীয়—কবি চাহের দরবেশ সমাপ্ত করে নানারূপ সাংসারিক অর্থনৈতিক ভাবনা চিন্তার মধ্যে জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন, বেশ কিছুকাল আগে পাইক পাড়ার রাজাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল—কবি তথায় রাজাদের সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দান করতেন, এবং কবি একজন কৃতবিদ্যা বিশারদ ছিলেন সে বিষয়েও রাজারা অবহিত হয়েছিলেন। কবি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই ধনীক শ্রেণীর সঙ্গেই বসবাস করতেন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দ্বিতীয়তঃ তিনি চাহের দরবেশ বঙ্গ ভাষায় আনয়ন করবেন, এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প। এ বিষয়ে তিনি ঘুনাক্ষরেও কাহারও সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন না, কবি বুঝতেই পারেন নি তদানীন্তন প্রবাসী অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী চাহের দরবেশ পাঠ করেনি।

যাহা হউক দেশজ বেশীর ভাগ শিক্ষিত বাঙ্গালী এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই অজ্ঞাত ছিল, রাজারা তো বটেই, কবি তখনও তিলোত্তমা রচনা করেন নি। মনে প্রাণে ছিল তাঁর পরিকল্পনা—ভেবেছিলেন গ্রন্থ প্রকাশের যে খরচ, তাহা ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—এ বিষয়ে কোন না কোন সাহায্যের দরকার। সুযোগ ঠিক সময় মতো পেয়ে গেলেন। মহড়া চলছিল রত্নাবলী নাটকের, তিনি ঐ নাটক দেখেই যতীন্দ্রমোহনকে বললেন দুর্বল বাংলা ভাষার জন্য আমি নতুন গ্রন্থ রচনা করে দিচ্ছি, যেটা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করা হবে—এই ছন্দে একটি বিশেষ সময়ে ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ হবে। শেষ পর্যন্ত রাজারা মেনেও নিলেন মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে রাজাদের স্তবস্তুতি করেছিলেন। কবি সর্বদাই নিজ স্বার্থেই চলতেন। যে বিদ্যাসাগর এমন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছিলেন অথচ সেই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের ব্যাপারে কবি কোনদিন সাহায্য করবার জন্য প্রয়াসী তো হন নি এমন কি তিনি একবারও এই সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য কলমও ধরেন নি। যখনই বিপদাপন্ন হতেন তখনই টাকা নিয়েছেন অথচ যখন বিদ্যাসাগর ভয়ংকরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখনও তিনি একবার চোখের দেখা দেখতে যাননি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জন্য তাঁর হৃদয় কাঁদত সবসময়। সেই সময়ও তিনি চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া যায় তাঁর লেখা একটি কবিতা উদ্ধৃতি করলাম—যদিও মধুসূদন্ নানাভাবে অর্থনৈতিক কারণে জর্জ্জরিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো সমাজকল্যাণের নানা কাজে নিঃস্ব হতে চলেছিলেন কবি কি একবারও বিদ্যাসাগরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন? প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। যখনই কবির প্রয়োজন হয়েছে তিনি সকলকেই অক্টোপাসের মত বেঁধেছেন নিজ প্রতিভাবলে।

তাঁর কবিতাতেই তাহা স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন পীড়িত ও শয্যাশায়ী কবি কোন্ মানবধর্মে বা মানবতায় অর্থের কথা বলেছিলেন সেটা জানি না। যে বিদ্যাসাগর কবির জন্য

প্রতিমুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সেই বিদ্যাসাগর আজ শয্যাশায়ী অথচ দু লাইন কবিতা দিয়ে শুধু সমবেদনা জানালেন এও যেন য়ুরোপীয় ঢঙে—

'শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম খনি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে।

কবি পুত্র সহমাতা কাঁদে বারংবার।

যখন ধর্মের ব্যাপারে যশস্বী ঋষিগণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র প্রায় সকলেই চিন্তিত অথচ কবি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বাক ও নির্লিপ্ত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির কাছে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারের জন্য একটি ব্রাহ্ম সংগীত রচনা করতে অনুরোধ করেন, অথচ কবি তাঁর অনুরোধের উপর কবিতা লিখলেন না, ব্রাহ্ম সংগীতের পরিবর্তে দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদময় ঘটনা, কবিতা আকারে সৃষ্টি করলেন, নাম দিলেন "আত্মবিলাপ" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় তা প্রকাশও করলেন। কবি তাঁর নিজের সাহিত্যিকে অমর করে রাখবার জন্য—যা কিছু করার সব করেছেন। কবি মহান মানুষদের নানাবিধ সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন নি, কিন্তু তাদের কোন বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রয়াসী হন নি—অনেকে এই ধারণায় প্রতীত হন। তিনি যে প্রকৃতই মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমে উপনীত ছাড়া কিছু নয়। যে বিধবা বিবাহকে নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক মহাবিপ্লব করলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বড় বড় মনিষীগণ বিনা বাক্যব্যয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন সেখানে মাইকেল নীরব। ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে, চলছে মহান মানবধর্মী আন্দোলন, তখনও কবি নির্বাক। হিন্দুদের দেব দেবতা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি কোনদিন সাধারণভাবেও চিন্তা করেন নি। মাটির একটি স্পর্শ ও প্রাণ আছে, যার গুণে দৈবদুর্বিপাকে কবি যখনই মহাবিপদাপন্ন তখন হিন্দু দেব দেবতাদের বিষয়ে হিন্দু বন্ধুদের বেষ্টনীতে, উপস্থিতি দেখা গেছে। তবে তিনি যে নিবেদিত খ্রীষ্টে তার প্রমাণ বহু দেওয়া যেতে পারে। অনেক খ্রীষ্টান বন্ধুগণও সন্দেহের মধ্যে ছিলেন এমন কি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনও সন্দেহ করতেন কারণ কবি বড় একটা গীর্জায় যেতেন না, কবি জানতেন গীর্জায় গেলেই খ্রীষ্টকে পাওয়া যায় না, তার জন্য চাই প্রাণ, চাই উপলব্ধি,—মৃত্যুর আগেই খ্রীষ্টানগণ কবির অন্তেষ্টি ক্রিয়ার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—কবির কর্ণাগোচর হওয়া মাত্রই তিনি কৃষ্ণমোহনকে বীরত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি মনুষ্য নির্মিত গীর্জার সংশ্রব গ্রাহ্য করি না, আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই, আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন।' মৃত্যু শায়িত কবি খ্রীষ্টের প্রতি যে আনুগত্য প্রত্যাশা ও দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলেন তাহাতে সহজেই অনুমেয় তিনি পূর্ণ হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন। কবি যখনই কোন হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে ভোজের জন্য গিয়াছেন, তখনই তিনি খ্রীষ্টানদের নিয়মানুসারে খাদ্যদাতা প্রভুকে ধন্যবাদ দিতেন, তিনি লক্ষ বিপদের মধ্যেও পরিত্রাতা কে কখনই স্মরণ করতে ভোলেন নি।

অনেকে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন, অনেকের বক্তব্য, মাইকেল মধুসূদন

দত্ত মহাশয় নাকি উদারান্নের জন্য খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন ভ্রম এবং নেশা বা মোহগ্রস্থতার জন্য ধর্ম ত্যাগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নাকি তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছিলেন এবং তত্ত্বকথা শুনবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনা, যতদূর অনুসন্ধান করে জেনেছি, সবই ভ্রম, উপরিউক্ত লেখকগণ যে কি পরিমাণ ভ্রমে পতিত হয়ে এই জাতীয় তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন যা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রথম কথা বিখ্যাত ধনশালী উকিল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টধর্মাবলম্বনের পূর্বে রাজকীয় ভোগে জীবন কাটিয়েছেন। অভাব কাকে বলে জানতেন না, উদারান্নের কষ্ট বোধ করি তার জীবনে স্পর্শ করতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময় পেটের জ্বালা উক্ত সময়ে তাঁর জীবনে আসার কোন সুযোগ ছিল না। যিনি পালকি করে চাকরের তত্ত্বাবধানে যেতেন স্কুলে, ক্লাশে যার প্রতি সময়ে পোষাকের পরিবর্তন করতে হতো, তার আবার অভাব। তাও উদারান্নের! দ্বিতীয়ত—তাঁর মত একজন খাঁটি খ্রীষ্টান ও চোগা চাপকান পরাসাহেব যাবে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছে? দানবীর বিদ্যাসাগর সমাজে যিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন তাঁর কাছে সাহেব মাইকেল বোধ করি অল্পই গেছেন। বিদ্যাসাগর গেছেন বহুবার, টাকা নিয়েছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে, সেও এক নাটকীয় শক্তিতে, মাইকেল যখন পরিপূর্ণ খ্রীষ্টান এবং ধর্মতত্ত্ব পড়ে অথবা ধর্ম পুস্তক পাঠ করে তিনি তাঁর মাথা ঝামা করে ফেলেছেন, যিনি মূল গ্রীক ভাষায় নিউ টেষ্টামেন্ট অথবা ওল্ড টেষ্টামেন্ট পাঠ করেছেন, তিনি যাবেন এক দরিদ্রপূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণের কাছে তাও নাবালক ব্রাহ্মণ। মাইকেল যখন পরিপূর্ণ খাস সাহেবী মেজাজে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যমণি হয়ে আছেন তখন রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সামান্য পুরোহিত, তাছাড়া মধুসূদনের থেকে রামকৃষ্ণ দেব বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। শ্রীমধুসূদনের সাহেবীয়ানার কাছে অনেক খাস সাহেবও হার মানতেন। তিনি হিন্দুদের ঐ তাবিজ মাদুলি অথবা মন্ত্র তন্ত্র, তুকতাক্ মানতেন না, তিনি বলতেন এগুলি হিন্দুদের এক অদ্ভুত কুসংস্কার, ইংরেজ সাহেবরা হিন্দুদের এইসব বালখিল্যতা দেখে বলতেন এসব ম্যাজিক বা জাদু।

রামকৃষ্ণের কাছে মধুসূদন দত্ত কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে যান নি—তা প্রমাণ ব্যক্তিগত সংগ্রহে পেয়েছি, তা উল্লেখ করছি, উনিশ শতকে ঝামাপুকুর এলাকাতে বাস করতেন ধনী চাটুজ্জেরা। যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপশালী বংশ ছিল, আজও তাঁদের অস্তিত্ব ঝামাপুকুরে আছে, ঐ অঞ্চলে শ্যামসুন্দর তলাটি ছিল ধনী চাটুজ্জেদের অধীনে; শ্যামসুন্দর তলায় চাটুজ্জেদের যে পাঠশালাটি ছিল, তার শিক্ষক ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, ওখানে দীর্ঘদিন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেছিলেন, রাজা দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘটেছিল। দিগম্বর মিত্রের বৃহৎ অট্টালিকা চাটুজ্জেদের পাশে। দিগম্বর মিত্রের বংশধরেরা এখনও অনেকেই জীবিত, যদিও তাঁরা কেউ ঝামাপুকুরের থাকেন না, বাড়ীটির অর্ধাংশ এক কালোয়ারের কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন। বাড়ীর প্রবেশদ্বারেই লেখা আছে "দিগম্বর মিত্রের বাড়ী"। দিগম্বর মিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রায় উন্মাদ—নাম নরেন মিত্র, কথিত আছে জনৈক পুত্র ইংরেজদের জাতীয় পতাকার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, এবং একবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন, গ্রামবাসীদের প্রচুর খাদ্য ও সাইকেল নির্বাচনী প্রচারের জন্য বিতরণ করেছিলেন। আজ সেই রাজ অট্টালিকা যেন সাহারা মরুভূমি। কথিত আছে মধুসূদনের প্রচুর অর্থ দিগম্বর মিত্র মহাশয় আত্মসাৎ করেছিলেন, পাশেই আছে শ্রীতারকনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী। তারকনাথ ঘোষের বাড়ীও বৃহৎ। তিনি কবিকে

ভীষণ কাছের মনে করতেন এবং অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন। সংক্ষেপে সেই সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ প্রয়োজন, তাহলে আমরা রামকৃষ্ণের ঘটনাটি সহজেই উপলব্ধি করতে পারব।

তারকনাথ ঘোষ মহাশয় ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার মত মহানুভব মানুষ খুব কমই ছিল, তাঁহার ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনটি ছিল সারস্বত কুঞ্জ। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণের ছিল অবাধ যাতায়াত। মধুসূদন দত্ত ছিলেন সকলের মধ্যমণি, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এক রাত্রিতে বসে নীলদর্পণ নাটকখানি ঐ বাড়িতে বসে অনুবাদ করেছিলেন, একজন "নীলদর্পন" পাঠ করে যাচ্ছেন আর মধুসূদন ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করে যাচ্ছেন, স্বভাবতঃ কবির সেই ওজস্বিনী ভাষা বা পাণ্ডিত্য পূর্ণ সংযোজন ও উপমার সাহায্যে অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি। ভাষার ত্রুটি থাকতে পারে। যাই হোক, তারকনাথ ঘোষের বৃহৎ অট্টালিকা আজও দণ্ডায়মান।

তবে অট্টালিকার কলেবর হীন অবস্থায়, সামনেই আছে তারকধাম। তারকনাথ ঘোষ মহাশয়ের মোট সন্তান আটজন তন্মধ্যে এক পুত্র গুপীনাথ ঘোষ, তিনিও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক পুত্র শ্রীঅজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বয়স পঁচাশী-ছিয়াশী ১৯৮২ সালে বসেছিলাম তাঁর বাসভবনে। এইসব তথ্য আমাকে ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণদাঁ মহাশয় দিয়ে উপকৃত করেছেন, রামকৃষ্ণের এই সময় প্রথম কোলকাতা দর্শন। দাদা রামকুমারের সঙ্গে প্রথমে চাটুজ্জেদের বাড়ীতে পরে দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে আসেন। দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণের কাজে বহাল হলেন, বেশ কিছু বছর সেখানে থাকার পর দাদার সাহায্যে রামকৃষ্ণ চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পূজারী হয়ে। পরে তিনি মহা ঐশী শক্তি পেয়ে বিশ্বমানবের মনে পবিত্র স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন। এই বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোনদিন যাওয়া তো দূরের কথা, রামকৃষ্ণের নামও বোধকরি তিনি শোনেন নি।

তখনও তিনি মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রূপে প্রতীত হন নি। অনেক পরে তিনি মহাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। যতদূর সন্ধান করে জানতে পেরেছি ১৮৬৯ সালে মথুরানাথ রাসমনীর জামাতা একবার কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে কবিকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি গিয়েছিলেন রাজকীয় সম্মানে। ধর্ম সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা বলতেন না। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি, মহান তেজী মধুসূদনের খ্রীষ্ট অন্তপ্রাণ। বাহ্যড়ম্বরকে তিনি খুব একটা আমল দিতেন না। নির্জনে তিনি যীশুর নাম নিতেন, বাইবেল পড়তেন। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তিনি কোন দিন অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নি। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তিনি নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু খ্রীষ্টে তিনি ছিলেন অবিচল। তাঁর কবিতার মধ্যে বহু নাটকের মধ্যে বহু ঘটনা উল্লেখ আছে। সাহিত্যের জন্য তিনি যথেষ্ট লড়াই করেছেন। আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন, তবু তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে কখনও চ্যুত হন নি, মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন নি, জীবনের প্রতি মুহূর্তে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে জ্বলন্ত প্রতিভার মত ছুটেছেন খ্রীষ্টে নিজেকে সমর্পন করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্য্যন্ত বলেছেন, আমি প্রভুর শ্রেষ্ঠ স্থানে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি।

প্রতিভার এমনই গুণ, যখন যে কাজই তিনি করেছেন এক বিরাট মনোবল নিয়ে করেছেন। তাঁর অসীম আত্মবিশ্বাস, অসীম প্রাণভরা দরদ, তাঁর অফুরন্ত উদারতা—প্রত্যেককে—ভালবাসা, প্রাণ মনোহরা আবেগ তিনি সবটাই প্রায় শিখেছেন এক দারুন সমর্পন থেকে। যে কোন বিষয়

শিখতে বা জানতে তাঁর বেশী সময় লাগত না। তিনি হিমালয়ের মত ছিলেন দাম্ভিক ও উদার। তদানীন্তন সমগ্র উচ্চশ্রেণীর মানুষদিগকে তিনি এক সূত্রে বেঁধেছিলেন, তিনি ছিলেন সকলের মধ্যমণি। যাঁর বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল, তিনি হঠাৎই বাংলা ভাষায় এক অভিনব কান্ড ঘটিয়ে বসলেন। কি অপূর্ব প্রতিভা, যিনি কদাপি নাটক রচনা করেন নাই, যিনি পিতার মৃত্যুকালে একখানি পত্র লিখতে পর্যন্ত সাহায্য নিয়েছিলেন জনৈক বন্ধুর কাছে, তিনি রাজাদের সামনে (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ) যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিলেন, যখন রত্নাবলী নাটক বাংলাতে অভিনীত হচ্ছিল, তখনই ডাক পড়ল মধুসূদনের। যিনি পুলিশ কোর্টের সামান্য একজন আমলা, নাট্য প্রয়োগের কলা কুশলীতে তিনি স্বাভাবিক মতে আদৌ ছিলেন না, নাটক লিখে কোনদিন হাতও পাকান নি—অথচ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বললেন রাজাদের সামনে—'ইহা কিছুই তো হয় নাই, কবির কথায় সকলেই ব্যঙ্গহাস্য হেসেছিল, কবি ইত্যবসরে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিছু বাংলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করে নতুনভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে বাংলা নাটক শর্মিষ্ঠা লিখে সকলকে অবাক করে দিলেন, মধুসূদনের রীতিই ছিল এমন, অতর্কিতে সব কিছু করতেন, মাদ্রাজ পালিয়ে যাওয়া যেমন অতর্কিতে, প্রতিটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করাও অতর্কিতে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাও হঠাৎ।

বঙ্গীয় নাটকের "জন্ম" পত্রিকায় নানা বিষয় আলোচনাও আছে। তবুও মধুসূদন দত্তকে পরিত্রাহি রব ছাড়তে হয়েছে প্রাচীন পন্ডিতগণের আঘাতে। কবি যেন যুদ্ধং দেহি গোছের একটা আহ্বান করেছিলেন। ওদিকে প্রাচীন পন্ডিতগণ বলছেন সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই নয়, "সংশোধন করিতে হইলে একটি পংক্তি আস্ত থাকে না, কবির কপালে হাসি, ব্যঙ্গ ও টিট্‌কারীর অভাব রইল না। উনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক যদি কোন বিপ্লবী থাকে তো সর্বপ্রথম বিপ্লবী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যেন পুরানো নিয়ম ভেঙ্গে ছারখার করে দিতে চান—মধুসূদনের এই সব সৃষ্টিতে প্রাচীন পন্ডিতদের মনে বড়ই ব্যথার উদ্রেক ঘটেছিল, তারা চিৎকার আরম্ভ করলেন। মধুসূদন প্রাচীন আদর্শ এবং আলঙ্কারিকদিগের ছন্দ ও নিয়মকে বাংলা নাটককে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। কবি তার জবাবে বলেছিলেন—

এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পন্ডিতসংঘকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিব। তবে বলিয়া রাখি, বেশি আশংকারও কারণ নাই, মনে রাখিও আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্য লিখিয়াছি, যাহারা আমার ভাবেই ভাবুক, যাহারা নূন্যধিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের দাস্যশীল অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তাশক্তির চরণেই যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে সর্বপ্রথমে দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।" বোধকরি অসুবিধার সৃষ্টি হবে না—ধুমকেতুর মত তিনি সহসা স্থানান্তরিত হয়েছেন। নানা দেশ দেশান্তরে নানা সাহিত্য কর্ম যজ্ঞে, তিনি প্রাচীন পন্ডিতদের একটু ফুঁ দিয়া লড়াইবার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্যই তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি উঠেছিল। তিনি চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙ্গে মানবের মনে আনতে চেয়েছিলেন দানবীয় শক্তি, এবং সততা ও অদম্য উৎসাহ, মধুসূদন যেন এক অসুর বালক, জীবনে যেন কোন ক্লান্তি নেই, শুধু চাওয়া আর চাওয়া সাধারণ ভাবে চাওয়া নয়, বীর দর্পের সঙ্গে চাওয়া। এ চাওয়া সবার মানায় না, যা কেবল এই মানুষটিকে মানাত, কবি মধুসূদন পণ্ডিত সংঘের একচেটিয়া

আধিপত্য দেখে এবং তাদের মহাভ্রম অবস্থা লক্ষ্য করে কবি বঙ্গ ভাষার প্রতি একটি কবিতা প্রাচীন সংঘকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

"শুন গো ভারত ভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিৎ না হয়।
উঠ, ত্যজ' ঘুমঘোর হইল হইল ভোর;
দিনকর প্রাচীতে উদয়!
কোথায় বাল্মিকী ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি ভয়।
সুধারসে আনা দরে, বিষ বারি পাণ করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে জাগো জাগো বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হোক তনয় নিচয়।

কবি কারো প্রতিভা বা মহৎ প্রচেষ্টা কখনও অস্বীকার করেন নি সত্য কিন্তু কবি পরম সত্য উপলব্ধি করেছেন। ঐ প্রাচীন ঘেঁসা পয়ার কিম্বা পন্ডিতদের গা সওয়া সনাতন নয়, তাই কবি এবারেও যেন বীর দর্পে ঐ সব প্রাচীন পন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন এবার শ্রীমধুসূদন মর্ত্তে অবতরণ করেছে, তাঁর প্রতিভার কাছে তার সৃষ্টির কাছে, আর কোন কিছু টিকবে না, সবই সমুদ্রবক্ষে চলে যাবে। তাই তিনি বললেন ব্যাস বাল্মিকী জয়দেব ছেড়ে এখন শ্রীমধুসূদন বলতে হবে। রাজনারায়ণকেও তিনি বলতেন, "আমি কি অমর হয়ে থাকব না?" আশার নেশায় তিনি দানবীয় শক্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

কবি বিদ্রোহ করলেন কিন্তু এ যেন উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মত অবস্থা। কি হল তাঁর বিপ্লবে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে শুনল, জীবন মর্ত্যে কতখানি কাজে লাগল, "বঙ্গের নাট্যকলা অসমর্থ অভিনেতৃগণের তেমন অযোগ্য দর্শকগণের দাসীরই নহেন কিছু দাসীর' সোনার মল মানাইবে কেন?" এত যুগ পার হয়ে গেল কিন্তু কবির নাটক কি কবিতা বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কখনও কোথাও অভিনয় করেছেন? তাঁর সৃষ্টির পর কত অজস্র নাটক কবিতা গান মানুষের কণ্ঠে কয়েকজন ছাড়া আর কি কেউ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কখনও কোথাও অভিনয় করেছেন? তাঁর সৃষ্টির পর কত অজস্র নাটক কবিতা গান মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে। সেই উনবিংশ শতাব্দীর জোয়ারে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া আর কি কেউ অমিত্রাক্ষরে কোন কিছু রচনা অথবা নাটক অভিনয় করেছেন? বোধকরি বিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি পাঠ্যতালিকার মধ্যে প্রবিষ্ঠ না করাত তাহলে তাঁর অমর সৃষ্টি অনেকটা গোপন হয়ে থাকত, বহু ভাষাবিদ হিসাবে শ্রীমধুসূদন সম্পূর্ণ সার্থক, তবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ আজও কটা মানুষ গ্রহণ করতে পেরেছে? ভাষাড়ম্বরে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না, সাময়িকভাবে সুনাম অর্জন করা যায়। পড়ার আন্তরিকতা না থাকলে কবির ভাষা বুঝবে কে?

ঢাকার জগবন্ধুভদ্র মহাশয় যে কাব্য রচনা করেছিলেন অথবা আরও অনেকে অমিত্রাক্ষর

ছন্দের অনুরূপ যে কাব্য রচনা করেছিলেন তাহাও অমর হয়ে থাকত। পার্থক্য, মাইকেল পণ্ডিত, তদানীন্তন সভ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, জ্ঞানী ও জ্বলন্ত প্রতিভা। বঙ্গ সাহিত্যের নানা বিষয়ের প্রতি উন্নতির প্রচেষ্টা, সব মিলিয়ে তাঁর জয় জয়কার। অমরত্ব তাঁর এইখানে, সৃষ্টির মাহাত্ম্য তাঁর জানা ছিল, অমরত্ব কিভাবে আসে তিনি জানতেন, তাই তাঁর কর্ম ছিল বাঁধাধরা গন্ডির নিগড় ভেঙ্গে ফেলা। নতুন সৃষ্টির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যকে রাজাসনে বসান। তাঁর লক্ষ দোষ থাকা সত্ত্বেও কে না স্বীকার করবে তাঁর জ্বলন্ত প্রতিভাকে? সংস্কৃত ইংরাজী পারসী উর্দু এতগুলো ভাষা জলবৎ করে ফেললেন। তাঁর কাছে এ পৃথিবীতে অসাধ্য কি থাকতে পারে। তাঁর পক্ষে এক রজনীতে একখানি নাটক রচনা করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নয়। সমালোচনার দিকে নজর দিলে, তাঁর সৃষ্টি বাংলাতে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমা ব্রজঙ্গনা নানা দোষে দূষন হতে পারে, কিন্তু তাঁর যে জ্বলন্ত প্রতিভা তা প্রতি ছত্রেই যে বিভাসিত হয়। তেমনি নীল দর্পনের ভাষা দুর্বল কি নাট্যপোযোগী নয়, অথবা দীনবন্ধু মিত্র সত্যই নিমে চরিত্রের মধ্যে অপমান জনক ঘটনা ঘটিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে আমি কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। অনেকের ধারণা মাইকেল মধুসূদন দত্ত চোস্ত সাহেবী ইংরাজী বলতেন, কিন্তু নীলদর্পনে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় উহা মধুসূদনের সৃষ্টি নয়। অন্য কোন অপোক্ত হাতের সৃষ্টি। তবু বলতে হয় একজন কবির সব কিছুই যে মহৎ সৃষ্টি হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নাই। মিলটনের প্যারাডাইসলষ্ট ব্যতিত অন্য কোন বইগুলি পাঠক বা সমালোচক মহলে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে? হোমারের ইলিয়ড ওডিসি দুই খানি মহাকাব্য ছাড়া কজন পাঠক তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে অবগত হতে পেরেছেন? বেদব্যাসের মহাভারত ছাড়া তাঁর যে অন্য মহান গ্রন্থ আছে সে সম্পর্কে কজন অবহিত? শুধু তাঁর মহাভারতই জনগণমনে স্থান পেয়েছে সেইরূপ এক রজনীর মধ্যে সৃষ্টি নীলদর্পণ যত দোষেই দুষ্ট থাক তাহা যে অনবদ্য ও সাবলিল তাহা অনস্বীকার্য্য। এ বিষয়ে কিছু তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।

নীলদর্পন ইংরাজীতে মধুসূদনই লিখেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই বিভিন্ন বক্তব্যে।

দীনবন্ধু চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—এই গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকা ডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র নিজ হাতে অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কিছু কথা লিখেছিলেন এবং তিনি এ বিষয়ে সামান্য আলোচনাও করেছিলেন।

"বঙ্কিম যুগের কথা" লেখকও বলেন,— অবিলম্বে নীল দর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদিত হইল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কিন্তু লং সাহেবের নামেই তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ঐই নীল দর্পনের সংস্রবে আসিয়া মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীল দর্পনের অনুবাদ করিয়া একেবারে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই, গোপনে তিনিও তিক্ত মধুগোছের কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ভারতী" পত্রিকাতে লিখেছিলেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ন অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।

নীলদর্পনের অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন কিনা এ বিষয়ে যেরূপ সন্দেহ ও বাতবিতণ্ডা প্রচলিত আছে সে বিষয়ে কিছু ঘটনা থেকে পরিষ্কার হওয়া যেতে পারে। কে প্রকৃত অনুবাদক নীলদর্পনের? স্বজাতীর প্রতি মাইকেলের যে অগাধ ভালবাসা ছিল এবং নীলচাষীদের প্রতি তাঁর যে অপার করুণা ছিল তার প্রমাণ যথাযথভাবে বর্ণনা করেছি রেবেকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের মধ্য দিয়ে।

সুস্থ মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ বা যুক্তি গ্রাহ্য, সেকারণ যুক্তি যদি গ্রানাইট পাথরের উপর বসান যায় তা খণ্ডন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

যখন নীল বিদ্রোহ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে, যখন মানুষ নানা ভাবে সাহেবদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, তখন কি কোন তেজী বালক অলস জীবন-যাপনের সময় কাটাতে পারে? মাইকেল তখন রাজকার্য্যে নিযুক্ত, সাহেবদের বিরুদ্ধে তিনি কিভাবে কলম চালাবেন, চাকরি নষ্ট হবার সম্ভাবনা যেমন, তেমন অত্যাচারিত হবারও সম্ভাবনা, তাই তিনি নিজের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীতারকনাথ ঘোষের বাড়ীতে বসে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক রজনীর মধ্যে ইংরাজীতে নীল দর্পন অনুবাদ করলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন, তাঁরা নীলদর্পন পাঠ করে যাচ্ছেন এবং মধুসূদন চেয়ারে বসে টেবিলের উপর অবিরাম কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, কলম অবিরাম চলেছে কোথাও বিরাম নেই। এমনই একটি মুহূর্তে নীলদর্পন অনুবাদ করা হয়েছিল। তারকনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীটি এখনও ঝামাপুকুরে বর্তমান, ঘোষের বাড়ীটিতে অনেক কবি ও সাহিত্যিকগণ যাতায়াত করতেন। মাইকেল প্রায় সময়ই কাটাতেন তাঁর বাড়ীতে, আসতেন দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রও মাঝে মধ্যে মনোমোহন, গৌরদাস বসাক এবং আরও অনেকে ঐ বাড়ীতে সাহিত্য বৈঠকে উপস্থিত হতেন। তারকনাথ ঘোষের বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের তীর্থভূমি। শ্রীঘোষের বাড়ীর সামনেই ছিল রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ী সেখানে মধুসূদনের অবাধ যাতায়াত ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এ বিষয়ে বলতে পারি নীলদর্পন গ্রন্থে মাইকেলের নাম থাকার কথাও নয়। গ্রন্থে যে টুকু উল্লেখ করার দরকার ছিল তাহা ছিল—

Nil Durpan on the Indigo Planting Mirror A DramaTranslated from Bengali by a Native.

বিচারপতি ওয়েল সাহেব, লংসাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন অনুবাদকের নামটি বলার জন্য। কিন্তু লং সাহেব বলেন নি তারজন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়ছিল, শাস্তিরও ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু লং সাহেব হৃদয় দিয়ে গ্রামবাংলার নীল চাষীদের প্রতি যে উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন, ইতিহাস কোন দিন বিস্মৃত হবে না। লং সাহেবের এমন উদার মহানুভবতা দেখে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক হাজার টাকার জরিমানা ও অন্যান্য খরচ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন, তবু মধুসূদনের নাম করেন নি। মধুসূদনের কৃপায় লং সাহেবও বেঁচে রইলেন মানুষের কাছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনকে বাঁচাবার জন্য এবং ইংরাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য লং সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন, যে কোন সাহায্য দিতে তিনি প্রস্তুত। শুধু তাই নয় লং সাহেবকে বাঁচাবার দায়িত্বও আমাদের। ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজের মোকদ্দমা সত্বর নিষ্পত্তি ঘটবে কিন্তু একজন নেটিভের সঙ্গে ইংরেজের মামলা—বিপজ্জনক অবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে। মহান প্রাণ কালীপ্রসন্ন অনেক ভেবে, এমন ভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়েছিলেন। নীলদর্পন নাটক করার আর একটি কারণ রেবেকা মেকাটাভিস। বিবাহ বিচ্ছেদের ও বিশেষ কারণ নীলবিদ্রোহ কবি ইংরাজের কৃপা প্রার্থী

কোন দিনই ছিলেন না, বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন ফ্রান্সে। উত্তঙ্গ আশা নিয়ে কবি ছুটেছেন দিগ্‌ভ্রান্তের মত। তিনি সকল সময় বলতেন জ্ঞান অর্জনের জন্য যা কিছু দরকার তা আমি করবই। এমনকি ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য তিনি ধনাঢ্যের কাছেও গিয়েছিলেন টাকার দরকারে, প্রচুর টাকার দরকার ; তিনি মনস্থ করেছিলেন বোম্বের এক পার্শী ধনাঢ্যের কাছ থেকে সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ২৫০০০ টাকা নেবেন, সেই সূত্রে তিনি দাদাভাই নৌরজের কাছে গিয়েছিলেন পরামর্শের জন্য। তিনি (কবি) শুনেছিলেন, যদি কোন ভারতীয় ছাত্র ইংলন্ডে গিয়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যতদিন পসার না করতে পারে, ততদিন ঐ পার্শী ধনকুবের সম্পত্তির বিনিময়ে টাকা ধার দিয়ে থাকে। অর্থের ব্যাপারে সেখানেও হলেন পরাজিত। দাদা ভাই নৌরজে তাঁকে হতাশ করলেন— নানা বিষয়ে কবি পরাজিত হয়েছেন। পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে কবির বন্ধুগণই কবিকে নানা বিষয়ে যে কি পরিমাণ সাহায্য করেছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গৌরদাস বসাকের কথা মতো কবি অনেক সময় অনেক কিছু করেছেন, এবং একটি পত্রে লিখলেন বহুবাজারের স্টানহোপ প্রেসের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট গ্রন্থের ব্যাপারে, গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। তাঁর কাছে অনেক শিক্ষিত মানুষ কাবলিওয়ালার মত তাগাদা করত। কবি যখনই বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ১৩টি টাকা দিলেন তখননি এক পাওনাদার প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থের দিকে নজর দিয়ে তাগাদা আরম্ভ করলেন, কবি উত্তর দিলেন, এখন হাত সম্পূর্ণ রিক্ত। এই রিক্ত অবস্থায় এমন দুঃখে তিনি প্রসন্ন বদনে দান করলেন। যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেতে চাইছেন না—তখন বললেন—কেন আমাকে আপনারা লজ্জা দেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, এখনতো আপনার অর্থের দরকার নাই, যখন আপনার অন্নকষ্ট উপস্থিত হবে তখন ঋণ করে পরিশোধ যদি করতে হয় করে দেব।

এমনই উদার মানুষকে ফ্রান্সের এক পাদ্রির কাছ থেকে অর্থ ধার করতে হয়েছিল বাঁচবার জন্য। মাত্র ২৫ ফ্রাঙ্কস। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তাঁর কাছে ছিল ভয়ঙ্কর সময়। অর্থাভাব এমনই বিপন্ন হয়েছিলেন যে কঠোর অনশনে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ঐ ১৮ই জুন তিনি বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখলেন—আমার কোন রাস্তা নেই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও নিজেকে হত্যা করতে চলেছি তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি বাঁচি তবে দেশে গিয়ে স্বদেশবাসীকে জানাব তুমি শুধু বিদ্যাসাগর নও করুণাসাগর—

I send this letter to you through Pran Kissen Ghose of Police office for misfortune and suffering have made me suspicicus and who knows if my last two letters have found you? Alas! my dear friend I cannot possibly exoect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letter and go to work will all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the galf that yawns between us and the joyfulday when I shall hear from you? If we perish, I hope our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation however base and low, which

I have not sounded! God had given me a breave and proud heart or it would have broken long ago.

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Megharnad, 'বৃথা সে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।'

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my country man that you are not only Vidya-sagara but Karunasagara (করুণাসাগর) also.

এই পত্রে এক স্থলে মধুসূদন লিখিতেছেন,—

Thonga I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with reference to M-b; I felt certain that you would soon find out the real nature of the man he is mean, a varicious, and fain hearted; a Bengalee of the class now happily passing away. As for D-, he is as you say, rich and great. Ia have too high a nation of myself to envy him as a man; though I am too poor to desoise his wealth! But away with him not to te hang man; but to silent contempt!

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই-এর পত্রে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখেতেছেন—

I have lost all the terms of this year, and unless you send me money I shall not be able to return to England by November to keep my Michaelmas term.

I hope my dear friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than any body else, and I assure you I must have money raised on my property without delay.

You know the English proverb-"A burnt child dreads fire." On our own one-"He whose mother has been eaten up by an alligator dreads even এ ঢেঁকি ! My friends in calcutta have frightened me out of al courage! This will be forwared to you by my friend I.C. Bose.

মধুসূদনের ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত একখানি পত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করলাম ইহা হতে মধুসূদনের ফ্রান্স প্রবাসের অনেক কথা জানতে পারা যাইবে।

12, Ruedes Chantiers Versailes.
France-26th January, 1865

My dear Gour.

I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though fathers and myself "bearded like a pard"-we still have the same hearts beathing in us. Is it not so, my good old friend? I pray you, whenever any raseal tells you anything unworthy of your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool not a

mad man, and (as they say in England) "Know what is what" You can scarcely conceive how Europe has changed me, in my habits, in my tastes, in my nations of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself my Boy! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones.You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course, I am still romantic for that you know is my nature; for I am a bit of a poet, and s superabuntance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor "man of the world". I have my dreams and aspirations and vague longings but I am growing. wise excuse this egotism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to-d, idle reportes about me when I am too great a distance to defend myself. Let Frown from Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my Boy!

You ask me when I mean to return homewords? If I had not been balely neglected by Mahadad Chatterjee and Digumber Mitter. I should have been called to the Bar in the course of the present month; but, as it is, I am afraid. I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend. Iswarchandra Vidyasagar has taken me by the had; If you ask him he will tell you how shabbily I have been treated te subject is an important one and I don't like to enter into it. I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God. I hav had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, Viz, Italian, German and French languages,-which are well worth knowing for their leterary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European languae is like the acquisition of a vast and well cultivated state intellectual of course. Should I live to return, I hope of familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all there is nothing like cultivatind and enriching our own tongue. Do you think England of France or Germany or Italy wats poets and Essayists; I pray God, that the noble ambition of Milton to do soemething for his mothertongue and his native land may amimate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself

to his mother tongue. That is his legitimate sphere-his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized auarters of the globe; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh tought in them, fly to their mother tongue. Here is a bit of "lecture" for you and the gents wo fancy that they are swarthy Macaulays and carlyles and Thackerays! I assure you they are nothing of the sort I should scorm the pretensions of that man to be called "edvcated" who is not master of his own language.

বিদেশ বিভুঁইয়ে কবি বিভিন্ন সময়ে নানা রকম বিপদাপন্ন হতেন। বিগতদিনের দুঃখ কষ্টকে কেমন সহজভাবেই ভুলে যেতেন, তবে তিনি বলতেন অর্থ কারো স্বামী নয় যখন যার কাছে সেই তার প্রভু। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নয়, অর্থ খরচের জন্য, কবিরে মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাবা না থাকার যথেষ্ট কারণও ছিল, তাঁর মনের গভীরে যে মন ছিল, সে মন বড়ই নিঃসঙ্গ। এত বেশি সুপ্ত যা জনমানসে প্রতিফলন হবার যোগ্য নয়। কবি জানতেন তাঁর বিশাল সম্পত্তি এক জীবনে ধ্বংস হবার নয়, বসে বসে খেলে ধ্বংস হতে পারে না। এবং সমাজ জীবনে বিশ্বাস একটি মূল্যবান সম্পদ! ব্যবসায়ী জীবনে ঝুঁকি ও গুডউইল যেমন নেহাৎ জরুরী তেমনি, বিশাল সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রেও বিশ্বাস ঝুঁকির প্রয়োজন, যেটা কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। সেই ঝুঁকির উপর দাঁড়িয়ে কবি মহৎ কর্মের প্রতি অগ্রসর হয়েছিলেন, অমরত্বের জন্য তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছিলেন। জীবনে চরম সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং ঝুঁকি নিতে পেরেছিলেন। পশ্চাতে বিশাল অর্থ সংস্থানের কথা চিন্তা করে। শুধু তাই নয় বিপদাপন্ন হতেন নিজের জীবনকে বুঝে, তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার হবেনই কারণ মহাশক্তি তাঁর পশ্চাতে বিদ্যমান—সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে তিনি সৃষ্টির নিমিত্তে, জ্ঞানের নিমিত্তে, শিক্ষার নিমিত্তে, মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, বন্ধুভাগ্য সকলের সমান হয় না এ বিষয়ে বৃহস্পতি ছিল কবির তুঙ্গে। লন্ডনে একবার ভাড়ার ব্যাপারে কবি কেমন তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সে বিষয়েও বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছেন, যখনই বিপদাপন্ন হতেন তখনই কবি তাঁর স্বদেশী বন্ধুদের কাছে পত্র লিখতেন সম্পত্তির বিষয় উল্লেখ করে। কবি জানতেন বিনাস্বার্থে কেউ একটি পয়সাও দেবে না—প্রতিটি পত্রে তাঁর সম্পত্তির কথা প্রায় উল্লেখ আছে কবি জানতেন, পৈতৃক সম্পত্তিই আমার ম্যাগনেট। তিনি কত মহৎ, দেশে যাকে আপন করে নিতে পারেন নি, বিদেশের মাটিতে তাকে কত আপন করে বিপদাপন্ন অবস্থায় পত্র লিখেছেন প্রিয় বিদ্যাসাগর তুমি যদি সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাকে তিনশত টাকা না পাঠাও, তাহলে আমি এই গৃহে বসবাস করবার সুযোগ পাব না, উপরন্তু এই মাসের শেষে চলে যেতে বাধ্য হব।

I Tell my wife that when I get back to calcutta. you will give me a little room in your house and a lot rice to keep body and soul together.

ভাড়া থাকা ও ভাড়া পাওয়ার যে কত কষ্টকর সে বিষয়ে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা কবিকে উতলা করেছে, কবির মুখ দিয়ে তাই এত ছোট কথা বেরিয়েছে, দেশে গিয়ে তোমার বাড়ীতে থাকব একটি ছোট ঘরে, অন্নকষ্ট যেন না হয়। পরবর্তীকালে যখন কবি ফিরলেন, তখন কবির

সবই বিস্ফরণ ঘটল—ইংলন্ড থেকে ফিরে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে উঠলেন না উঠলেন ব্যয়বহুল স্পেনসেস হোটেলে। বিদ্যাসাগর কর্তব্য করেছিলেন, কবি উত্তরে বলেছিলেন—বামুন পাড়ায় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

I hope you will send me L 300 September, for I must get out of this house and the last quarter of the year ends with that months. The Propritors are hard-hearted people and Is I am unable pay and move out, They no doubt, will apply the hard enactments of the English law of land lord and Tenants to my case for I am a yearly tenants and if I remain one day after the expiration of the Term. They might compel me to keep the house another year at a higher rate of pent. All so ....

I am sorry for your little son, for I am afraid, the mistaken kindness of your parents will not suffer him to be made a man; of course, I am far from condemning your filian respect for their feelings.

You again date your letter from "Bagirhat Is this "Bagirhat" on the bank of my own native rever? I have been latiely reading Petrarca, the Italian poet, and scribbling some 'sonnets', after his manner. There is one addressed to this very river. I send you this and another-the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the Sonnet "চতুর্দশপদী" will do wonder fully well in our language. কবতক্ষ I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an elegant compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to Polish it up. Such of us, as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserable wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. ! wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not suficient means to lead a litearary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor,perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড় মানুষ; among us? The No bodies of Chorebaganand Barrabazar! Make money, my boy, make money! If I haven't done something in the literary

line, if I do posses tetents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

But let us turn other subject; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand Rupees. Of course, if you were left to yourself, you could not do it but I can hope to be of great use to you. When you let me know that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more useful than any guide you can think of.

You want me to write by every mail, My good soul, do you know that I should in that I should in that case have to write no less that four letter every bleased month. I am not an idle man besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old friend, altogether, but give him a call, now and then.

You must remember me to all our old friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch-Behar and that of Trailokya Mohun Tagore, who, I see has been transported for 7 years. I feel for his poor mother. Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart.

Mrs. D and the little ones are all going on well, thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards, I remain my dear Gour,

Ever your affectionate.

যখনই বিপদে পড়েছেন প্রবাসে তখনই স্মরণ করেছেন, বিদ্যাসাগরকে। তিক্ত অভিজ্ঞতার কবলে পড়ে মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কারও দিয়েছেন, সকল সময় বলতেন কেউ কথা রাখেনা। মানুষ কেন এমন হয়। এদের মধ্যে পবিত্র রক্ত কি নেই? এদের মধ্যে মানুষের রক্ত কি নেই? এরা তো যেকোনো মানুষকে অতি ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে। কবির পত্তনীগণ প্রতিভূগণ ও তাঁর স্টেটের কর্মচারীগণ, এদের কি অদ্ভুত চরিত্র, ফরাসী দেশে থাকাকালীন অনেকের ধারণা হয়েছিল অর্থের অভাবে কোন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে মধুসূদনকে ফরাসী দেশে.কোন সংশোধনাগারে অবস্থান করতে হচ্ছে। বিদ্বেষ্টাগণ ও অনিষ্টাভিলাষীগণ প্রায় সময়ই এমন অলীক কল্পনা করে দেশে এমন অপবাদ প্রচার করত। তারাই বেশি অপবাদ প্রচার করত যাদের কাছে কবি টাকা পেতেন। তারা ভেবেছিল এমন অপবাদে ও দুর্ণামে মধুসূদনকে ব্যতিব্যস্ত করে করে পাগল করে তুলবে। ফরাসী দেশে থাকাকালীন তিনি সব বিষয়েই শুনেছিলেন। যারা

তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করছিল, মধুসূদন তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলেন নি—তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে লিখেছেন—তিনি দুঃখের কথা বার বার অকপট চিত্তে স্বীকার করেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওনা টাকার কথাও উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন—

You cannot Imagine how unhappy I am! But you must save me, My dear Vidyasagar, For if you do not send me all the money. I want October next. I shall loss another term and remain burid in France as I am at this moment.

In this letter of the 20th June, Digumber Promised to send us a thousand Rupees in a month time. All the mail of July reached Europe without a line from him, and we are drifting back again to the dangerous shore. We had left behind! Surely Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as save to send money to Europe as it is to send money. Does he not know that it is quite as save to send money to Europe as it is to send money from one r.›om to another in his own house? He sends me Rs 800 and then shuts shop perhaps for months to come! This is in to lerable by God! I have a 1000 Rs. in Alipore court. B.N. Mitter write to me in February last to say that he would send me that money very soon! This is August and not a peny one Hurry (হরি) Banerjee of Kidderpore owes me 500 Rs. not a word about that money from any one! What I am to do !

God help me! My great hope now is in you and, I am sure, you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders wilful permediated murders and then be hanged. The money, wing which I have bought postage stamps for this letter has been raised from a pawn-Brokers office.

কবি শ্রী মধুসূদন দত্তকে বুঝবার ও জানবার জন্য বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বিবিধ রচনা সংযোজন করা হল, এই গ্রন্থ পাঠ করলে যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি-পাঠক নিজেই মধুসূদনকে আরো আপন করে নিতে পারবেন এই সব মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের বক্তব্যে মধুসূদন আরো সুন্দর ভাবে মানুষের মনি কোঠায় উপবিষ্ট হতে পেরেছেন।

শুধুই সমালোচনা ঃ

আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় ঃ

সমসাময়িকগণের নানা মন্তব্য ঃ

কবিকে নিয়ে যিনি যতটা পেরেছেন সমালোচনা করেছেন। কে কেমন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবার দেখা যাক—

যাহা রামায়ণে নাই মেঘনাদে তাহা পড়িতেছি

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান মরিচিমালী" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে "মেঘনাদই" বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত তারা"। যিনি বাঙ্গালীকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিবেন? প্রবন্ধ লেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধে" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তান মাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্রে বীরদর্প, জগতে অতুলনীয় দোষমাত্র পরিশূন্য সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি, লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীর পুরুষদের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয় ভাব, বাল্যকালবধি হিন্দু সন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধ কিরীটিনী" লক্ষ পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদলবেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষন করেন। ইহাই রামায়ণ। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যে মনের পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, "মেঘনাদ"-এ তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না,—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাধ is with the Rakshasas! And that is the real truth" অর্থাৎ এদেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিক তাহাই বটে।" জানিয়া-শুনিয়া কবি হিন্দু সন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন। আপাততঃ ইহা রূঢ় ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর।—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই শয়তান তুল্য।—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না। এ দৃশ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্যময় বটে, কিন্তু ভয়ানকও। আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তি প্রীতির আধার। তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতু নিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চির-স্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!

এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি! হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর!"

যখন পুত্রশোকাতুরা অভিমানিনী, সাধবী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি,

তখন "মহামন্ত্রবলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন। যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই নিদানমাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণে সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধে" রাবণ কতকটা ভক্তির ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষচর অদৃশ্য হইলেন, তখন স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া।"

তখন মর্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়াছিলেন—শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, —বলিয়াছিলেন।

"এত দিনে প্রভু
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে গালি
আজ্ঞা তব হে সর্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে।"

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদবধ" রাবণ—যেন মানুষ, অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্যলাভ করিয়াছে;—দুর্বৃত্ত যুবক যে কতক ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য। আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান-পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, এ কথা মনে রাখিলে, ভরসা করি কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝিতে চাই, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে, কাব্য মধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

পঞ্চম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন; ক্রোধে কুসুমদান ছিঁড়িলেন। বলিলেন,—

"ধিক মোরে।...........
.... হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে

স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত তেমনি সরল। এতদিন তিনি নিশ্চিতমনে প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদনিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদবার্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদকে তিনি তৃণজ্ঞান করেন। সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষকুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়াছে নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব! এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎ-তরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে,—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে,
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুচিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন, রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। পুত্রবৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈব্যবল ও সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন, বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে পারেন, কিন্তু মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকেন্দারসাকে কখনও মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে। বলিলেন—

"কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশনে কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি

ইন্দ্রজিৎ! কি কহিবে শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্রময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব। আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কুঞ্জরিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরে এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর বিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি,
কে আঁটিবে দাসে দেবি, তুমি আশিষীলে।"

এই বীরত্ব, এই পিতৃমাতৃভক্তি পত্নির প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নী-বাৎসল্য প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য ও গাম্ভীর্যে হৃদয়ে আনন্দে পরিপ্লুত হয়। উষা সমাগমে কুঞ্জবনগীতে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।

"প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) 'ডাকিছে কুজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্যকান্তমণি
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুই মুদিলে নয়ন!
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্ঘ রতন!
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

আবার,—যখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি কমলিনি,
জুড়াত ও চক্ষুদ্বয়!"

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধুর

মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন। তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না।

"মেঘনাদ ধীরে ধীরে,
কুসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে"

যাইতেছিলেন। 'ধীরে ধীরে, কেননা তখন প্রমীলার চারুমূর্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল। এমন সময়,—

"সহসা নুপুর ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির পরিচিত, অয়ি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী পদশব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দ্রীবরাননা
প্রমীলারে।"

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।—দৈববৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোম্মীলন করিয়া দেখিলেন যে-মূর্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের! কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

"সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা।"

আবার যখন মূর্তিমান অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়াণ, প্রাণ দেহবিচ্যুত হইতে আর দেরি নাই, তখনও তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল। নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল, ইহাই তাঁহার ধারণা, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না।

'দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে! কি পাপে বিধাতা,
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে!"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব দৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ-চরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্যা বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য লইয়াই কাব্য;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্যময়। হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানবহৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমান মাত্র সহায় করিয়া অসহায় নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্ম চরিত্রের সর্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;—তাঁহাদের কাব্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়,—মেঘনাদের বীরদর্প, সে চরিত্রের অতুলিন সৌন্দর্য।

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বিলম্ব নাই। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল

সম্বরণ করিতে পারে! 'অন্যায় মৃত্যু!' সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা তো মনেই হয় না। সে অন্যায়বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল 'মেঘনাদবধ' পাঠকালেই হয়। ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিধ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষস কুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই তো ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে অপঘাতে মরিল কেন?

"প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী। আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!"

তাই বলিতেছিলাম যে, এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা। কিন্তু ইহাই "মেঘনাদবধ কাব্যে"র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীত কাব্যতরণী ভাসাইবা'র নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিস্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরাণতা বা Poetical Justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে, যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার ধারণায় আইসে নাই,—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিংবদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথামাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নিহারকণা, শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন, অনন্ত শূন্যে অনন্ত সৌরজগতমণ্ডলী তেমন নিয়মেরই অধীন। সর্ব্বত্র নিয়ম! তুই কবি—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও, প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে ব্যথিত হও, প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রুবিসর্জ্জন কর, তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড়জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা নহে। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে। বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে, ইতিহাসও অনুদিন এই মহত্ত্বে কীর্তন করে, "মেঘনাদবধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব। সৌন্দর্যসার মেঘনাদ দেবদুর্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্যা! সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব, অতুল্য মোহময় সৃষ্টি। সত্য বটে, কিন্তু যে অজেয় শক্তি

রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যাভিচার নাই।

এ শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে, মূর্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয় তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। আজি রুশিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তশক্তি।—শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তজগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কিনা, আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত। সাধাপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তি প্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখা কথা এক। সুতরাং না হউক পরতঃ "মেঘনাদবধ কাব্য" অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

"মেঘনাদবধ কাব্যে"র জ্ঞানময় কবি প্রমীলা চরিত্রে কয়েকটি গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃসুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের সাম্য কখনও ছিল কি ঠিক বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রীজাতি লইয়া। কাব্য দেখ স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহা সংসারে সকল সুখের আকর —কিন্তু বিধিটা এক তরফা করায় ইহার শুভ্রকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষপ্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে যে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলে,—বিষাদ—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মাত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক ধর্ম্ম নহে। ফলে নিরপেক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ। যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে নির্ম্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরুপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংস কর।

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতেষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্য সমাজে দুই তিন বার সে চেষ্টা হইয়াছে,—তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদী চরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখর বুদ্ধি শালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী!— সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদিভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন

কাজ করেন না। আর একবার সে রত্ন হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্রশাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্র প্রচারের সময় বেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বেসর্ব্বা স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে চায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণ কুলের চিরোর্ব্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিনকতক স্ত্রী চরিত্র একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিনী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদিবিলাসিনী কালিকার মূর্ত্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যাহা অনন্ত শক্তি দেবে পারিল না, কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্ত্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখনও বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখনও নহে। ওডিনের (Odin) উপস্বর্গ অসভ্য ইউরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্রশাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

''মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করেছিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্যা যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন,

> ''অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচন
> আমার নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?''

মধুর লেখা বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি মিষ্টি লাগে! প্রথমে বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়েছিল। দার্শনিক প্রবর জনস্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন ''প্রমিলা'' চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলা চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্র সাম্য, এই রাক্ষসদম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

কবির গলায় আওয়াজ ছিল ভাঙ্গা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রং ময়লা,

চুলগুলি ইংরাজী ফ্যাশানে ছাঁটা, বেশ কোঁকড়া- কোঁকড়া, মাঝখানে সিঁথি। চোখ দুটি বড় বড়, চেহারাটি দোহারা,......... তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয় নাই তখনও। তাঁহার কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন। যথা—

সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি

—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—

পুরে—অকালে—কহলে—দেবী—ইত্যাদি।

যেমন কবি বা তাঁর তেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব এবং অসাধারণ ছিল।

১৩২০ সনে কলিকাতায় **সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতি**—বললেন।

একদিন উত্তর-গোগৃহের মহা-সমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীমগর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতন হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপুরিত হই৷ দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়োনিধির ঘোরগর্জ্জনে বিশ্ববিজয়া মহারথদিগকেও পর্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্কণ, বেণুধ্বনি ও নূপুরশিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন— এই জন্য দুঃখ হয়।

মধুসূদন এক প্রতিভা

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

The later Bengali epics are all chiselled into classic grace and repose But, studied historically, they exhibit an internal life and movement. The Meghnadhadha of Michael Madhusudan Dutt is classic both in style and conception, though the ground-work of the plot is deprived from strictly oriental sources. Nothing can be a stronger testmony to the reality of Hegel's distinction between orientalism and classicism than this strange phenomenon in the history of poetic art, a splendid Parian monument of transparent classic art built on oriental foundations, a stately Pantheon on the site of a Pagoda. The phenomenon is unique and offers an experimentum curcis in favour of Hagel's classification of art.

With Michael Madhusudan Dutta, the confliet of fource which is

consititutive of the epic poem has already raised itself in Miltonic fashion from the physical plane to the moral platform, herein transcending the classic conception,-though, of course, the deus ex-maching is there still in full working, the consmingling of the super natural with natural, of the superhuman with the human of the miraculous, the mythical and the improbably with the historical and the actual, being a distinctive trait of the epic symbolism or corrstellang.

কবি সকল ভাষায় বুৎপন্ন কেশরী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কলিকাতা 'সাবিত্রি লাইব্রেরী'র বার্ষিক অধিবেশন "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বলেছিলেন—

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহার জীবনে ও ইহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে (তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ) স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্তকল্পনা উদ্দাম ভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন; ইহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য? না মহাকাব্য, না খন্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার ব্রজঙ্গ না গীতিকাব্য জয়দেবের সমস্থানীয়; তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-দেশান্তরহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়ছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবই দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা এক একটি রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাঁহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশলী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলকে ছোট করা দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল না

স্যার দেবীদাস সর্বাধিকারী

মাইকেল যে নিমচাঁদের মূল আদর্শ নহেন, একথা এখন সর্বত্র গ্রাহ্য। দীনবন্ধু মধুসূদনের স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলেন। সহস্র অসংযম সত্ত্বেও মাইকেলকে নিজ প্রতিভাবলে চিরদিনের জন্য

হাস্যাস্পদ ও লোকচক্ষে কৃপাপাত্র করিয়া রাখা দীনবন্ধুর সাহিত্যজীবনের একমাত্র কলঙ্ক। নিমচাঁদ সৃজনে সে কলঙ্ক-কালিমা কবির জীবন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র কদাপি তাহা ক্ষমা করিতেন না।

দীনবন্ধুর মাইকেলের প্রতি অনুরাগ সুরধনীকাব্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত—

মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মন্ডিত
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।

'গাম্ভীর্যমন্ডিত' মহাকবিকে লইয়া বাঁদর নাচান দীনবন্ধুর ন্যায় মহাকবি ও মহাপ্রাণের অযোগ্য ও অসম্ভব। নিমচাঁদ কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। সাময়িক যাবতীয় নিম একত্র বাটিয়া ছানিয়া এই অপূর্ব চাঁদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ-নাট্যজগতে ইহাকে তিলোত্তমা বলিলেও বলা যায়।

একবার কোন অনুসন্ধিৎসা দীনবন্ধুকে নিমচাঁদের সনাক্তি উপলক্ষে মাইকেলকে কাঠগড়ায় হাজির করিতে দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন, "মধু কি কখন নিম হয়?"

সকল কথার উত্তর এইখানে হইয়া গেল। কবির সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মধ্যে তোমারই বর্ণনা মধ্যে তোমারে খুঁজিয় দেখি—চেষ্টা অধুনাসম্মত উচ্চ সমালোচনা High Criticism-এর অন্তর্ভুক্ত। কোথাও সনাক্ত কঠিন না হইলেও হইতে পারে। শেক্সপীয়র ঘুষজীবী কি মসীজীবী কি ব্যবহারজীবী ছিলেন, ইহার আলোচনা শেষ হয় নাই—শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রাচ্য সাহিত্যে এ বালাই বড় ছিল না; পাশ্চাত্ত্য সংঘর্ষণে এখন আসিয়া পড়িয়াছে। .....কিন্তু মাইকেল কৃতী ব্যবহারজীবী না হইলেও ব্যবসায়ে ব্যবহারজীবী; তাঁহার সম্পাদিত দলিলের মধ্যে তাঁহাকে সনাক্ত করা আমার পক্ষে তত সহজ মনে হয় না। সমব্যবসায়ী বলিয়া বোধ হয় আমার এই অসুবিধা।

মাইকেলের জীবনচরিত - লেখক তাঁহার নিজ জীবনের অসংযম তৎকপোলকল্পিত রাবণের অসংযমের সহিত যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন হয়, তাহা হইলে নিমচাঁদের সহিত মাইকেলের তুলনা অধিকতর ভিত্তিহীন। মাইকেলের আদর্শের সহিত রাবণের তুলনায় প্রমাণ সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। মিল্টন কাব্যসৌন্দর্যের অনুরোধে শয়তানকে বাড়াইবার জন্য শ্রীভগবানকে খাটো করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন—সকলেই জানে—ভগবৎ-মর্যাদার তাহাতে হানি হয় না। শত্রুভাবে ভগবান ভক্তের উপর সকল শাস্ত্রানুসারেই বিশেষ তুষ্ট কারণ কি তাহা জানি না। কিন্তু তাহার জন্য পিউরিটান-মিল্টনের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকিতে পারে না। যদি যোগীন্দ্রবাবু প্রদর্শিত সনাক্ত প্রণালী অবলম্বন করা যায়, রাজদ্রোহপ্রবণ মিল্টনের "এক নম্বর মহাপ্রভুর" সহিত তুলনা অপরিহার্য। কিন্তু শয়তানের সহিত মিল্টনের তুলনা অসহনীয়।"

আমার কথা

রমেশচন্দ্র দত্ত

We will therefore confine our remarks to one of his works. Meghnadbadha, which is the greatest literary production of this cenrtury. The fame of Iswar Chandra Gupta, as well as, of all other poets that Bengal has ever produced, has been completely eclipsed by the works of a truly great poet-we mean of course Madhusudan Dutta. Nothing in the entire range of the Bengali literature can apporach the sublimity of the Meghnadbadhkabya which is a master-piece of epic poetrty. The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe with which few with which few poets can inspire him and will candidly pronounce the bold author to be indeo a genious of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki and Kalidas, Homer, Dante or Shakespeare.

১২৯৯ সালের জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'নব্যভারত'-এ যোগীন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের "মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের "সাধনা"-পত্রের সাময়িক সাহিত্য সমালোচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত্ত হইল ঃ

'মেঘনাদবধচিত্র'—বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের "ভারতীতে' মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ''ভারতী'র সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনায় বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।

মাইকেলের সমস্তই চুরি

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বোধ করি বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালককালে আমি মাইকেলের কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখার ভাবে অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্ত বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাইভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট অলঙ্কারে দুষ্ট। বালককালে এই বিতর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, যখন আমি সায়েন্স-বিদ্যা-দিক্‌গজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা,

জানি না কেমন করিয়া আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ইহার বাহাদুরি এই, দুই দশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কি না, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা-না-একটা জবাব দিতে পারিতাম। মাইকেলকে ভেংচাইয়া, অমিত্রাক্ষর পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না—অমিত্রাক্ষর কাহাকে বলে। স্তরের শেষের দিকে মিল না থাকিলেই অমিত্রাক্ষর বুঝিতাম। বাস্তবিক মিলে গরমিলে অমিত্রাক্ষর নহে। সাধারণতঃ পয়য়ারে ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ হয়। অমিত্রক্ষর সে নিয়ম নাই। মাইকেল অধিকাংশ সময় শ্লোকটা ৪০,৪৪,৫০,৫২ অক্ষরে শেষ না করিয়া ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ করিয়াছেন।

বিধাতার নির্বন্ধে, বি.এ. পরীক্ষার জন্য, বাঙ্গালার পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর স্বভাবসুলভ, অতিশয়োক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর একথা মাইকেল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "গাঁথনি নূতন মালা" অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচজনে—গাঁথনি খালি আমার তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল "অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী।" অধ্যাপক বলিলেন—"দেখ দেখি কেমন সুন্দর উপমা!" আমি বলিলাম—ও ত চাহার-দরবেশে আছে। "আঁধারি ঘরমে এক দিয়া না দিয়া।"

এম. এ. পরীক্ষা দিয়া আমি পিতার কাছে আরো একমাস কাল ছিলাম। পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দ্দু অক্ষরে চাহার-দরবেশ-রূপ শরসংযোগ করাইলেন। অধ্যাপক ও সতীর্থেরা হাসিতে লাগিলেন। এমন নিত্যই হইত। কোন দিন বা আমি তারাশঙ্করের (প্রাচীন) বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য লইয়া স্তম্ভ সাজাইয়া, মিত্রাক্ষরের মতন করিয়া দেখাইতাম। তাহাতেও হাস্য-কৌতুক হইত। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার জন্য আমি মেঘনাদবধ পুস্তক কিনিলাম না। এইরূপে বহু বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এখন আমি সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল, সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।

পাঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ-বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক কিনি নাই বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গালা বটে; আর প্রহসনের ভাষা just appropriate, যাহার মুখে যেমন হওয়া উচিৎ, তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া আছে। একথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিষয়ের জন্য মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের 'একেই কি লে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই দীনবন্ধুবাবু প্রকাশ করিলেন,—'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। শেযোক্ত দুই গ্রন্থে উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়ে লেখা। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, 'সধবার একাদশী'র নাম-ডাক 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুনে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোনও স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থ কার; 'সধবার একাদশী'তে মধুদত্ত নিমেদত্ত একজন পাত্র বা Dramatist Person কলিকাতার নর্দমায় পড়িয়া পাহারওয়ালার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে।

Hail! Holy Light! the offspring of Heaven first first-born.

Of the Eternal co-eternal beam. ইত্যাদি।

শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল-চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage. (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage-এর ছেলে বাবা!' ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।

পর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কলেজে পাঠদ্দশার সময় হইতেই, কতক মনের সহিত, কতক মজা দেখিবার জন্য মাইকেলের বিদ্বেষী ছিলাম। এক-একদিন মেঘনাদের দুই দশ পংক্তি লইয়া নব-রত্নকে ব্যাখ্যা করিতে দিতাম। কেবল 'ললিত-লবঙ্গ-লতা' কথাতেই পরিপূর্ণ।......

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি, নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্নভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—পদ্মপর্ণ শব্দের অর্থ কি? হেমবাবু টীকা করিয়াছেন, পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। সেটা কি জিনিস—পদ্মগাছের পাতা, না পদ্মফুলের পাপড়ী? যদি গাছের পাতা হয়, তা হইলে উপমা বুঝা যায় না। কেননা পদ্মপত্র হরিদ্বর্ণ। উদয় অচল হরিদ্বর্ণ নহে, আর যদি পদ্মপর্ণ নামে পদ্মের পাপড়ি হয়—সে-ই বা কি রকম হইল? পদ্মের পাপড়িতেই পদ্মযোনি সুপ্ত কেন? যদি বা কখনও থাকেন, তবে উদয়াচলের সহিত সাদৃশ্য কি? যাক্। ব্রহ্মার নয়নপদ্মের উন্মীলনের মত আদিত্যের উদয়। তবে ব্রহ্মা কি এক-চক্ষু? আর সুপ্ত পদ্মযোনিই বা নয়নপদ্ম উন্মীলন করেন কিরূপ? সুপ্তির পর হইতে পারে বটে। আর ঘুম ভাঙিয়াই বা সুপ্রসন্নভাবে মহীর পানে চান কেন? কোন পৌরাণিক কাহিনী আছে কি? যদি না থাকে, তবে কি বুঝিব? আর মহীর বা এত উল্লাসে হাসি কেন? যদি বল প্রভাত হইয়াছে বলিয়া, তাহা হইলে ত সব গোলমাল হইল। সাধ্য-সম হইল! উপমার উপমেয় পাল্টাপাল্টি হইয়া গেল। এইরূপ নবরত্নের সহিত ঘোরতর রাক্ষস-সুলভা রাক্ষসী বিতণ্ডা করিতাম।

মাইকেলকে লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডাই হইত। কোনও পক্ষে জয়-পরাজয় স্থির হইত না। আমি প্রকাশ্যতঃ মাইকেলবিদ্বেষী বটে, কিন্তু মাইকেলের কবিতা আবৃত্তিকালে, কাব্যের রসভঙ্গ করিবার জন্য, আমি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতাম না। একথা সকলেই বলিতেন এবং আবৃত্তিতে ছন্দ ও রস সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়, একথা বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতেন। তিনি একদিন বলিলেন যে মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্ট। আমি বলিলাম, "কি বলিতেছেন, বুঝাইয়া দিউন।" তিনি বলিতেন, যেমন—"কিম্বা বিম্ব-ধবা রমা অম্বুরাশি তলে।" আমি বলিলাম, "এইরূপ মিষ্ট অনুপ্রাস স্বচ্ছন্দে মুখে মুখে করা যাইতে পারে।" তিনি বলিলেন, 'একটা করুন' একটা বলিলাম, 'কান্‌চেন রাঘব বাঞ্ছা গাম্‌চা আন্‌চে কেটা? কেবল বিতণ্ডা নহে এরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সর্ব্বদা হইত।

মধুসূদন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন

রামগতি ন্যায়রত্ন

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা ৯ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ হতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও নহে; কবিতা-জননীর অসাধারণী কল্পনাশক্তি বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদে বিশেষ বাক্যপ্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালা-বিনোদীদিগের মধ্যে এক্ষণে দুইটি বিশেষ দল হইয়াছে—একদল লোকে মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী,—ইংরাজিতে কৃতবিদ্যগণই এ দলে অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেক এরূপ আছেন, যে তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম'—বলিলেই ঘুসী উচাইয়া আইসে, 'ও' পর্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না। আর একদল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোড়ষাঁড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব। সুতরাং দুইদলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেল সাগরের সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠ করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিতই মেঘনাদ যে, কত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সেতু দ্বারা বন্ধ মহাসমুদ্রদর্শনে বারণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণ সমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পথ পথ দর্শনার্থ মেঘনাদ-প্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন, অশোকবনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব পরিচয় দান, শ্রীরামের যমপুরী দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ, শোক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালার বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপে সম্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশ পরিণত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীর বস্তুর বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেরূপ হন নাই; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত বক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীর-পুরুষ বীর-পুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছেদ-স্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ, কাব্য উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হয়েছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদের টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন উহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার গুণদোষ ব্যাখ্যা লইয়া যে কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালা ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইলেও নির্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণ দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায় না সত্য বটে, কিন্তু দাম্বিনু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুশূলস্বরূপ নতুন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা তা ছাড়া, দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, মরি কিবা' হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা,

নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেকস্থলও আছে, সেখানে সেই সেই অলঙ্কারগুলি অতিকষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২/৩ টি কথা দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া যে সকল অলঙ্কার নির্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখনও কখনও দুই তিন পংক্তিও লাগিয়েছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয়, অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার রচনাও দুর্বোধ্য হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় না।

এস্থলে আর একটি বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, মেঘনাদবধ যে, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পংক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায় না—এদিকে অমিত্রাক্ষর ভাব প্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয় না—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও বলি যে, যখন কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করিয়াও বীররস বর্ণনে অসমর্থ হন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধ হয় না, ইনি একটা নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া "উৎপৎস্যতেহস্তি মন কোহপ সমান ধর্ম্মা, কোলোহ্যয়ং নিরবধিবর্বপুলা চ পৃথ্বী" ভবভূতির এই গর্ববাক্য স্বয়ং ইংরেজির অনুকরণপ্রিয়, আমাদের কৃতবিদ্যদলও মিল্টনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্তিত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব করুন এবং কৃতবিদ্যদল তাঁহার যতই সমর্থন করুন—অসঙ্কুচিত মনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে, ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। বরং অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?'

প্রতিভা কি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

The next author to be considered is Mr. Michael Madhusudan Dutta, a most prolific write of poems and plays. There is probably no writer whose merits are more variously estimated-some enthusiasts thinking him fit to compare with Kalidasa, while others regard him as a mere poetaster. For ourselves we agree with neither, and while admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great poets. HE has incurred much hostile criticism by his innovations in language, and by his introduction into Bengali of the use of blank verse, but his rightful place in Bengali literature is perhaps the highest.

His poetical works are the Meghnada Badh, the Tilottama Shambhaba, the Biragangana and the Brajangana. The two former are what in Europe would be called epic poems, and in Indian Mahakabyas. Both are written in blank verse the first instances of the kind in Bengali. Of the two, the Tilottama was the earliest, but the Meghnada Badhas Mr. Datta's greatest work. The subject is taken from the Ramayana, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana, Meghnada, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Lakshman Ram's brother. This is the subject: and Mr Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creation. In their conception and development, Mr. Dutta has displayed high order of art, and to do justice to it, or even to give a suitable idea of it, would require a much more minute examination of the poem than the space at our command will allow. To Homer and milton, as well as to Valmiki, He is largely indebted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali Literature. The machinary, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is gracefull and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they direetly express. Nor is the verse broken up in to couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but, abounding like Milton's in variety of pause, it seems to us musical and graceful, as well as a fitting vehicle for passionate feelings.

Mr. Dutta, However, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind; and the sea graws terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthty of Mr. Dutta's genious and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they almost Nousence his readers. Nor is he altogether innocent of plagiarism. Home and Valmiki are not unfrequiently put under contribution and milton and Kalidasa have equal reason to complain.

Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction in imitation of the English idiom of such verbs as stutila, swanila, nirghosila.

We have given no extracts from the Meghand Badh because we could give no adequate idea of its merits by isolated quotation, The poem is beautiful as a whole, but single passages would give no more idea of it than a brick could give of the building from which it was taken.

Mr. Dutta's other works, the Tilottama Sambhaba was the earlies. It is an epic like the Meghand Badha, but a far inferior to that poem. The subject is the birth of Tilottama, the fairest of Brahma's creation, created for the express purpose of carsing direcord between the powerful Titan brother, Sunda and Upaskunda, who had expelled the Aryan Gods from Heaven.

We gladly turn from the Tilottama to a less ambitious but more mature work, the Birangana. It is a series of poetical epistles from heroes, wives to their husbands. It follwed the Megnnada Badha, and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction, and the same musical variously modulated versification.

The Brajangana is a short and fragmentary poem in rhyme. It sings the woes of Radha during the days of her belevement-a subject so often treated before, that novelty might seem to be impossible. Mr. Dutta, however, has contrived to say much that is both now and beautiful, and he is just as successful in rhyme as in blank verse, In fact, his rhyme is the best in the language. Of his sonnets we are no great admired, though they might serve to win a, name for a loss distinguished author. They were composed in Europe. One of them is dated from Versailles, and others are addressed to Dante Professor Goldstucker, Tennyson, Victor Hugo and Italy,-a sufficiantly miscellaneous list of subjects, it must be confessed.

As a dramatist, Mr. Datta is not Generally successful. Among his plays are Sarmmistha, Padmabati, and Krishan Kumari; and the first mentioned in particular is very generaly admired. In our judgement none of them are of much value. No Bengali writer his yet shown any real dramatic power. Even Babu Dinobandhu Mitra, the best writer in this line, entirely fails when he attempts to portray any of the higher emotions, and as for Mr. Dutta, his undoubted poetic. Genius seems entirely to desert him as soon as he sets about writing a play. His farces, however, are good. One of them, entitled Is this Civilization? Is the best

in the language. This little work deserves notice independently of its own really great merit.

The Bengali Press at the present day is very prolific, but by far the largest part of the books published are mere servile imitations of some successful author. There are imitators of Vidyasagar; imitators of Tekchand Thakur of Hutam, of Babu Dinabandhu Mitra and of the author of Durgesh Nandini; but perhaps, he work has formed the model for so many imitators as is this Civilization? It is a firace with a purpose being intende chiefly to ridicule and so expose the vice of drunkenness and the other evils by which it is generally attended. The Burtolla Presses and shops actually overflow with little books containing a dozen or twenty pages each, and selling for an anna or two, all directed against the vice of durnkeness. There are firaces, too, of larger build, one of which, called Bujhile ki-na, or do you understand! is very popular, and often produced at private theatrical; and these, too, like the others, are mere copies of is this Civilization? This little work, therefore independently of its being in itself one of the two best forces in the language, gains additional importance from the large number of other books written after its model.

To give any adequate idea of this clever little works by translated extracts would be entirely impossible, because half the fullies in the absurd jargon interlarded with English words and the cant of debating clubs in which the characters speak. The scene is laid, in the "Gyan Tarangini Sabha"-a sort of scientific debating sosiety which chiefly devotes itself to nautch girls and tippling. The types of life and character which it re-presents are sufficiently disgusting and the important question is, whether the representation is correct.

To shame of Bengal we must say that we fear the picture is a true one. The reformer who never gets beyond tipsy harangues full of English expression, Should not be confounded as he often is by Europeans with the really cultivated class. But it can not be denied that he is a fair representative of that great horde of partly educated Babus, whose only claim to enlightenment lies in the fact that they drink, Wear shabby trousers and stammer out barbarous English. There are the men who swarm in every office, and plague officials with endless applications for employment, crowed the throughfares of the native town in the evening drain the liquor shops and from the majority of his audience when Babu Keshab Chandra Sen lectures in the Town Hall. Of Education, they have had nothing worth the name. Having spent a few years very unprofitable

in learining a smattering of English at some Anglo-verna-culer school, they started in life if poor at the age of eighteen, as unedwars. If rich, they devoted themselves from the same age with their whole strength to swinish pleasures. The country is over run with men of his sort, and Mr. Dutt's picture is true to life; but they must not be confounded with the really cultivated class, who, in spite off all that has been said regarding the spread of English education are comparatively few in number.*

* "The calcutta Review". No 104, Vol. 52, April 1871.

বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলী ও মেঘনাদবধ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অতি ঋজু ও পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মেহতী কীর্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাবীকালে, ঋষি কুলসম্ভব কেহ না কেহ এই ছন্দের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে পারেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতাবলী সমধিক সরল, স্বচ্ছ, কোমল এবং তরল ভাষায় গ্রন্থন করিতে পারেন, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ আর কাহারও নয়। এবং উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় প্রণালী, বোধ হয় আর না। হয়ত কেহ মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে। বোধ হয়, লেখকের ন্যায় অনেকে মনে করেন যে, এই বিপুল যশঃ তাহাদের কপালে ঘটিল না। যাহা হউক, যখন আবিষ্ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হইয়াছে তখন সকলেরই কর্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সেই ভাগ্যবন্ত পুরুষকে ধন্যবাদ করেন, যিনি কবিতাস্রোতঃ নির্গমনের এই নূতন খাদ খনন করিয়াছেন। হে মেঘনাদ বধ গ্রন্থকার, এ 'নতুন মালা' চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে।

এইক্ষণে এই কাব্য সম্বন্ধে দুই-চার কথা না বললে ভাল দেখায় না।

গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন—'তিলোত্তমা-সম্ভব', 'মেঘনাদবধ' এবং 'বীরাঙ্গনা'। ইহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিবেচনা করিলে 'মেঘনাদবধ' এবং ভাষার সারল্য ও তারল্য গণনা করিলে 'বীরঙ্গনা' সর্বোৎকৃষ্ট কিন্তু ভাষার কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ অপেক্ষাকৃত সুসভ্য। অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি ও অনভ্যাসে হ্রাস হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ এই তিনখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিলোত্তমা প্রথম উদ্যম, মেঘনাদ দ্বিতীয় উদ্যম ও বীরাঙ্গনা তৃতীয় উদ্যম। সুতরাং উত্তরোত্তর ভাষার সারল্যাদি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে সকল গুণকে কবিতা-কৌলিনের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন, সে সকল মেঘনাদবধ কাব্যে যত আছে, গ্রন্থকারের রচিত অপর কোনো গ্রন্থে তত নাই। আর এ গ্রন্থে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি যে প্রকার স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় তেমন ভদ্রোচিত আর কোনো কাব্য পাঠে হয় না। মাইকেলের কবিত্ব-শক্তির দুই প্রধান লক্ষণ—তেজস্বিতা এবং উদ্ভাবকতা। তাঁহার কাব্যোপ্যাদ্যানে কুহকিনী কল্পনাদেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। কখনও ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পহরণ করিতেছেন, কখনও স্বকীয় নিকুঞ্জ হইতে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। কখনও ইন্দ্রজিৎ জায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ করিতেছেন, আবার কখনও মায়াবশে

শ্রীরামচন্দ্রের পথদর্শিনী হইয়া ধর্মরাজভবনে গমন করিতেছেন। আর উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে কতই যে অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন তাহার আর সীমা নাই। পুনশ্চ, দেবী আবার মহাতেজস্বিনী। সর্বদা বীরভাবান্বিত— সর্বদা বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। ভারতের কল্পনার ন্যায় ইহার জন্মমৃত্যু স্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্র প্রাণী নায়ক নায়িকা নয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য , দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত কিছু বীর্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত হইয়াছে অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব? অনেকে এরূপ তুলনা করেন। তাহাতে এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত তাহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার শত যোজনা অন্তরে অবিস্থিতি করিতে পারে কি না সন্দেহ। তত্রাচ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, ভারতচন্দ্রের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয়, আর জন্মিবেও না। তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখনও গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না। কিন্তু কল্পনাদি শ্রেষ্ঠতর গুণ তাহাতে যৎসামান্য ছিল। মন যাহাতে পৃথিবীর সীমা ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করিতে পায়, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই অথচ দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে, এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া তাহার বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই অপ্রমেয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্বল ছিল যে, বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াস সদৃশ—ইহাতে কথার মিল ছাড়া কবিতার অন্য কোনো লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর না লিখিতেন তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত? ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্যত্ব প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণ রূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিত্ত কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা-শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের মধ্যে সর্বপ্রকারের নয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটি স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আপনাকে নানা রসাভিজ্ঞ দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর লেখা পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পতন দশার এখনও কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব-শক্তি তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর তো কথাই ছিল না—তাঁহার লেখার বিস্তর দোষ আছে, বলিয়া, বুঝিয়া, কথাটি বলিতে হয়। নিদেন এক্ষণে কবিতাপ্রিয় গৌড়বাসীদের কবিতা পাঠের ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসুন্দর যেরূপ, মেঘনাদও সেইরূপ আদরের সহিত পাঠ করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, জানিতে কর্তব্য। যেখানে যে কথাটি খাটে যে ব্যক্তির মুখে যে রুপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন রসের উপযোগী, কোন শব্দটি, কোন পদটি উচ্চারণ করিলে কোন রসের উদ্দীপন করে— এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের এসকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিও কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রে কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা আছে। সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। .... কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর

রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কলবেষ্টিত বৃহৎকাণ্ডভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?

পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষ্যগুলি সর্বত্রে যথাযোগ্য হয় না। স্থবিশেষে দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ানো হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানা গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের না সে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ স্বদেশীয় বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট নিবেদন এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া মনোনিবেশ পূর্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করেন। আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করিবার পরও যদি নিন্দা করেন, ক্ষতি নাই কিন্তু ব্যঞ্জন ঢাকার মত ঢাকিয়া যেন নিন্দা না করেন। আর এটিও যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে, যে পুস্তক পাঠ করিয়া দুই-চারি কথা বলা ও পুস্তক রচনা করার মধ্যেও বিস্তর প্রভেদ। এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যখানি সবিস্তারে সমালোচনা করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অনটনের জন্য সেই বাসনা অঙ্কুরেই রহিল।...

খিদিরপুর, তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল।

মেঘনাদবধ কাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে?

কবি মোহিতলাল মজুমদার

......মেঘনাদবধ কাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে?............কেহ কি কখনও পড়ে? কাব্য-কাহিনী ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দনরবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িত কুন্তলা রোদনোচ্ছুনেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্তি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য আর কি ফুটিতে পারে?—তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে আত্মত্যাগ সে এখন প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সে অনুভূতি মেঘনাদবধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে, বাঙ্গালীর গৃহসংসারের সেই পুণ্য দীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার, ভার্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাসে ডুবিয়া গেল—বীরঙ্গনার যুদ্ধ যাত্রা বাঙ্গালী-বধূর সহমরণ যাত্রার করুণ দৃশ্যে অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতলব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও অশোক-কাননে বন্দিনী নারী লক্ষ্মীর মূক শোক ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং শক্তিশেল মূর্চ্ছিত ভ্রাতার শ্মশান শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত

তিষ্ঠ ক্ষণকাল
করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লম্বাণাম্বুগর্ভে নির্ম্মল উৎস-বারির মত উৎসারিত হইয়াছে—।

সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সব
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী।

মেঘনাদবধ-কাব্যের কোন প্রাণ নেই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দেখিলাম মেঘনাদবধ-কাব্যের কোন প্রাণ নেই, পড়িয়া দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়। তবে রবীন্দ্র সমালোচক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ সমালোচনার যথার্থ সমালোচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘনাদবধ'-মহাকাব্য সম্পর্কে ১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকাতে কি লিখেছিলেন দেখা যাক।)

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিন্তু কবি নহে এই জন্য অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ন চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরী করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন, তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে, কখন বা ম্যাকবেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই,—ইহাদের কেবল কেরাণীগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষ কালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না।

পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণীনির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কি কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমর্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্রাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, রাজ্য হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায়, যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এতদিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান্ অনির্বান উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল, কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এখন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে। ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবে কোলের উপরে শোকের কংকাল তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডি উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনে বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান, তাঁহার কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফর্‌মাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণত বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারী কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন বলেন "এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্' বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই

পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন, সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনা কালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারে। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলত। বাহুলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি। বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি, আর রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব-স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবধারিত হইয়াছে—যুদ্ধে বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন, রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ বর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহার পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না : মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্য আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্ব গুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহারা শুভ্র তুষার-ললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ যাহার অন্তগূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধকাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবদ্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন, ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় হইয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনা হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য

ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছলাবসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ উপযোগী বিষয়। আর একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তি হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধ বর্ণিত ঘটনায় কোন্‌খানে সেই উদ্দীপনী মুল শক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধকাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণত নাই, অমরতা নাই। মেধনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক, নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণ পথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম, তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন, আমরা সকল সময়ে তাহা জনিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিত্ব জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্‌ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্‌ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্টি মহৎচরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I dispise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন। দেবতাদিগকে কাপুরুষের মতঅধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব জ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে

কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ হইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কাবর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহারা কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁচে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সংগীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল—মাইকেল, ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি, সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সংকীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীন-দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠামো প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন, যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্যালোকে কৌতূহলবশত পড়িতে পারে, বাংলা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্তিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্তিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেই তাহা স্পষ্ট। দেখা যাক কবি কি লিখলেন।

১৮৬১ সালের জানুয়ারি "মেঘনাদবধ কাব্য" ১ম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে। মধুসূদনের মৃত্যু কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বারো যদিও

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে দেখা সম্ভব হয়েছিল কারণ—রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মধুসূদনের বিশেষ বন্ধু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনের বিশেষ বন্ধু ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে মধুসূদন বন্ধু সারদাপ্রসাদের সঙ্গে প্রায়ই এসে সাহিত্য মজলিস বসাতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন—

"মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রং ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী ফ্যাসানে ছাঁটা কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সিঁথী চোখ দুটি বড় বড়, লোচন প্রতিভাদীপ্ত, চেহারা দোহারা মুখশ্রী লাবন্য সমুজ্জ্বল; গলার আওয়াজ ছিল ভাঙ্গা।

আমাদের সারদাবাবুকে প্রায়ই মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে শোনাতেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সবে জন্মেছেন। শৈশবে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্য রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হয়েছিল, এত কঠিন কঠিন শব্দ শিশুকালে কার ভালো লাগে, সেই রাগে মধুসূদনের মৃত্যুর চার বছর পরে অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের ষোল বছর পরে ভারতী পত্রিকাতে এই সমালোচনা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পুণমদ্রনের কোন অনুমতি দেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণার সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্মশত বার্ষিক সংস্করণে পঞ্চদশ খণ্ডে এবং বর্তমানে রবীন্দ্র রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে (১৯৯৫) সংকলিত হয়েছে।

অপরিণত বয়সের মধুসূদন বিদ্বেষ রবীন্দ্রনাথের তা খণ্ডিত হয়, পরিণত বয়সের তার মনোভাবের যে আমুল পরিবর্তন তাহাও উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতেন—পত্রখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—

On the whole the Book is doing well. It has roused curiosity your friend Baboo Debendranath Tagore. I hear, is Quite Taken up with it. told me the other day that the he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can 'Stand near this man' meaning your fat friend of No. 6 Lower chitpore Road and that his imagination goes as for imagination can go.

রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থণা ঃ

নর্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এসে রবীন্দ্রনাথকে পড়াতেন তার মধ্যে অবশ্য পাঠ্য দিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে কম বুদ্ধিমান ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকেই বোঝা যায় কেন তিনি বিকৃত সমালোচনা করেছিলেন—

এই সময়টাতে বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতি দাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আরেকটা আমাদের উত্তেজনার পরম বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু ভারতীর সম্পাদক চক্রের বাহির ছিলাম না। ইতিপূর্বে আমি অল্প বয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালি গালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীব্র

হইয়া ওঠে আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটি দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।''

...সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠককে উপহাস-পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য।

বৈশাখ ১৩১৯ ভারতী

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

পুরাতন প্রসঙ্গে, বলিয়াছেন—

মাইকেল প্রতিভায় আমরা সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মাইকেলকে দোষারোপ করিয়াছেন

ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রকে কাপুরুষের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিষয় লইয়া সমালোচকদিগের মধ্যে বড় অল্প বাগ্‌বিতন্ডা হয় নাই। নানাজনে এ সম্বন্ধে নানামত ব্যক্ত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ রচনায় কবি রাক্ষসদিগের প্রতি ইচ্ছা করিয়াই পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জন্য অনেকেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বপ্রধান। কিন্তু তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রামচন্দ্রকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন কি না, তাই ঠিক করিয়া বলা বিশেষ দুরূহ। রামচন্দ্র, কাব্যের অনেক স্থলে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বীরত্বের লাঘব হইয়াছে, আর তিনি প্রতিপদে ক্রোধোম্মত্ত হইলেই যে তাঁহার বীরত্বের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শিত হইত, এই মত যে সমীচীন তাহাও বলা যায় না। ইহা সত্য, তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। কোন প্রাচীন কাব্যকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে (বিশেষতঃ পৌরাণিক কাব্য) সেই মূলগ্রন্থের আদর্শে ও অনুকরণে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিতেই হইবে এ নিয়ম স্বাধীন প্রকৃতির কবি কখনই মানিয়া চলিতে পারেন না। আর রামচন্দ্রকে মধুসূদন যদি যথার্থই কাপুরুষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই যে কেবল অপরাধী, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিকেও উক্ত অপরাধে অপরাধী হইতে হইয়াছে। কিন্তু সমালোচকেরা মধুসূদনকে এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মেঘনাদবধের রামলক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রণ ও রাক্ষসদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতামত এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

মধুসূদনের রামের চরিত্র-চিত্রন সম্বন্ধে জনৈক প্রবীণ সমালোচক বলেন—

But he was opened also an age of taste and correctness. He has taught us to leave off our naitve narrow invention and to restrain our prurient imagination in the veins of the Bengali Muse and galvanized her with justice to Rama......... So far as my memory serves me at the present moment, I recolleet Ravana to be a great fighting formed no other fact than having taken up and brokedn the ponderous Haradhanuk. He killed Ravana by stealth of the Mrittusarabana. which reads like an Anglo-Indian stratagem in the Panjab war. His heroism is taken upon assumption it is an a praori conclusion based upon the idea of his encarnation. Rama is the great Brabmanical hero but he did not come up to Modhu's ideal. By conservation he would have pleased his countrymen, but outraged his own instiets.

এ সম্বন্ধে "বাঙ্গালী" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'মহাকবি মধুসূদন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল—

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনার নির্বিচার। বীরকবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃত নদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজবংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল। এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ একবিন্দু অশ্রুপাতে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন রাবণ পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যে সমবেদনর অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তাহার শক্তির গভীরতার পরিমাপ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীর রসের কবি নন, তিনি করুণ রসেও সিদ্ধ হস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সুখ পাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিতাক্ষর ছন্দের গুণে অত বড় গ্রন্থ পাঠ কয়িয়া আমাদের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া আমাদের সাহিত্য রাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব গঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হাস্যসম্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতসা সাধন করিয়া সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন

বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ এই উপকারটির জন্য তাহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মাইকেল স্বদেশের এবং স্বধর্মের প্রীতিতেই পরিষিক্ত ছিলেন

জনৈক সমালোচব

গূঢ়ভাবে 'মাইকেল' স্বদেশের এবং স্বধর্মের প্রীতিতেই পরিষিক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর প্রধান জাতীয় কবি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি রাক্ষসদিগের সহিতই সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া রাক্ষসজেতাদিগকেই বাড়াইয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণেরও আছে যে হনুমান রাবণকে প্রথম দেখিয়া তাহার তেজে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছেন ঃ—

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহোদ্যুত্ত।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্দ্ধ লক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদং স্যাদং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদং সুরলোকস্য স শক্রব্যাপি রক্ষিত।

অর্থাৎ, আহা! রাক্ষসপতির কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহকান্তি, সকলই অনির্বচনীয়। যদি ইহার অধর্ম এত বলবান না হইত, তাহা হইলে এই নিশাচরনাথ সুরলোক এবং বাসবেরও রক্ষক হতে পারিতেন?

মেঘনাদের মৃত্যুকালের উদ্দেশ্যে "মাতৃ পিত্যপদে" প্রণামের কথা এবং পতির অমঙ্গল বার্তা শুনিবার পূর্বেই প্রমীলার কথা "কেন লো সই! না পারি পরিতে অলঙ্কার" কবির হৃদয়ে গভীর হিন্দুভাবের এবং সতীত্বের অত্যুচ্চ হিন্দু আদর্শে ভক্তির পরিচায়ক।

বাংলা তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্বের কারণ

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা সঙ্গীত যে কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন নাই। এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশায়িত, তখন চতুর্ম্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদি কবি হইলেই, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্বব্রহ্মান্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়, বাঙ্গালার রত্নাকর, মধুসূদনের ভাগ্যের ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদিগের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জন সমালোচকের মর্মঘাতিনী কশায় মহাকবি কীট্‌সের হৃদয় শতধা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল।

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ প্রকাশ বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন! হায়,—বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি

বলিয়াছিলেন, In this respect I most thankfully acknowledge. I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. তাঁহার idle things গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বলরত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীট মণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্বের কারণ।

বাল্মীকি ব্যাসে দোষ আছে মধুসূদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন

দীননাথ সান্যাল

লক্ষ্মণের জন্য সমধিক ভয় ব্যাকুলতা ও কাতরতা ও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ এবং রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এ কাব্যের মখ্যু বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং রাম এ কাব্যে সুভ্রাতৃবৎসল-রূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা ত্যাগ কালে সুমিত্রা জননী লক্ষ্মণকে রামের হস্তে দাস্য- স্বরূপই তাহা শুনিয়া, লক্ষ্মণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে স্বাভাবিক।

অষ্টম সর্গে মূর্চ্ছাগত লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের বিলাপ ভ্রাতৃ-বৎসলতার চমৎকার অভিব্যক্ত। যাহাকে সুমিত্রামাতা দাস্য-স্বরূপ রামের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সুমিত্রা মাতার কাছে দায়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কি সীতার উদ্ধার? এ দায়িত্ব ভাবিয়াই রাম বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন—

—চল ফিরে বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারি।

এই উক্তি রামের বীরত্বে আঘাত লাগে নাই, বরং তাঁহার ভ্রাতৃত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে অন্যান্য রামায়ণ-কবিরাও এইরূপেই রামকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করাইয়াছেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হীন করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু রামকে এ কাব্যে হীন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ভ্রাতৃবৎসল রামের ভ্রাতৃবৎসলতা অতি সুন্দর রূপেই দেখান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলিতে হইতেছে যে, রামায়ণেরও রাম-লক্ষ্মণের চিত্র একেবারে নির্দোষ নহে। বনবাসের আজ্ঞায় পিতার প্রতি লক্ষ্মণের অযথা ঘোরতর উষ্মা নিতান্তই পুত্রানুচিত এবং স্ত্রীলোক শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন বীরপুরুষানুচিতই হইয়াছে। রাম কর্তৃক বালী-বধ-ব্যাপার বীর-চরিত্রের আদর্শ নহে। লঙ্কাযুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ বীরত্বে সর্বত্রই যে রাবণ, মেঘনাদ বা অন্যান্য রাক্ষস বীর অপেক্ষা মহত্তর, তাহাও রামায়ণে দেখি না। মেঘনাদ কর্তৃক নাগপাশ বন্ধনে রাম-লক্ষ্মণকে বিষ্ণু প্রেরিত গরুড়ের সাহায্যে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-পক্ষকে নানা সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে—শুধু বীরত্বে কুলায় নাই। বস্তুতঃ মানুষ এবং মানুষের কৃত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, কাব্য-নাটকও নির্দোষ হয় না। বাল্মীকি-ব্যাসে দোষ আছে, কালিদাস ভবভূতিতে, শেক্সপীয়ার মিল্টনে, হোমার-ভার্জিলে,—সকল কার্য্যেই দোষ লক্ষিত হয়। মধুসূদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাঙ্গালায় আর একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। আদ্যরস ছানা, বীরকরুণাদি প্রধান ও পরম উপভোগ্য

রসগুলি এ কাব্যে চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত,—বীর ও করুণরস বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা এখন পর্য্যন্ত অদ্বিতীয়। বঙ্গ মাতার প্রতি কবি একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন—

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

বঙ্গজননী কবির নিবেদন শুনিয়াছেন। গৌড়জন তাঁহার কাব্যের দোষ ভুলিয়া গুণই ধরিয়াছেন এবং যতদিন বঙ্গভাষা বিদ্যমানথাকিবে, ততদিন অমর কবির এই কাব্যখানি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সরোবরে "মধুময় তামরস" স্বরূপ চির প্রস্ফুটিত থাকিবে।

উত্তেজনা না থাকিলে কাহারও পক্ষে লেখা সম্ভব নয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কঠোর সমালোচনায় কত গ্রন্থকারের মুকুলিত আশা-উদ্যম মুকুলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ লেখনীর তীব্র বিষাক্ত আঘাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, Keats কবির যে অকালমৃত্যু হয়, তীব্র সমালোচনাই তাহার কারণ। কবিবর Tasso কঠোর সমালোচনায় ব্যথিত হইয়া উম্মাদগ্রস্ত হয়েন। Montesquieu কঠোর সমালোচনার আঘাতে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিন্দুক সমালোচকদের হৃদয়ভোগী সমালোচনায় কবিবর Shelly দেশত্যাগী হয়েন। তাহার পর হইতে সমস্ত জীবন তিনি অসুখে কাল যাপন করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু Leigh Hunt-কে যে পত্র লেখেন তাহার পাঠ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার বুদ্ধি বৃত্তিসকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর কিছুই লিখিতে পারি না। যাহা লেখা যায় তাহাতে অন্যের নিকট সহানুভূতি পাব এইরূপ প্রবল উত্তেজনা না থাকিলে কাহারও পক্ষে লেখা অসম্ভব।"

সকল দেশেই প্রসিদ্ধ কাব্য বা নাটকের ভাগ্যে প্রথমে সমালোকচকদিগের এইরূপ অশনি বর্ষণ হইয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত কবি শেক্সপীয়রের নাটকগুলি প্রথম প্রথম ইউরোপের নানাদেশীয় সমালোচকদিগের দ্বারা কিরূপ ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তখন কেহ মনে ভাবিতেই পারেন নাই যে, শেক্সপীয়রের নাটকগুলি কালেকালে প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য ও চিরজীবী হইবে। ভারতবর্ষেরও এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। কবি ঘটকপর্ব মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ-মহাকাব্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন 'রঘুরপি কাব্যম্ তদপি চ পাঠ্যম্' অর্থাৎ রঘুবংশও আবার কাব্য, আর লোকেও তাহা পাঠ করে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সকল দেশেই মহাকাব্য লিখিয়া সহজে প্রতিষ্ঠাবান হওয়া বড় সহজ কথা নয়। সম্পূর্ণ অভিনবত্বের পক্ষপাত মধুসূদনের পক্ষেও সেই চিরাচরিত সনাতন নিয়মের কণামাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

কিন্তু এ দেশের লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল একমাত্র মধুসূদনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আত্মশক্তিতে তিনি এতদূর বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, কোনপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনাতে তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না; কখনও ভীত বা বিচলিত হইতে না।

যা হবার হোক তাতে দুনিয়া থাক আর যাক

স্বামী বিবেকানন্দ

"ঐ একটা অদ্ভুত (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গলা ভাষাতে-ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"

"তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নতুন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবোধ কাব্য লিখা হল! তা যত পারিস্ লেখ্ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমালয়ের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critic দের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নতুন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?"......

এইরূপ মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, —"যা নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধ খানা নিয়ে আয়।" শিষ্য মাঠের লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধ লইয়া আসিলে, বলিলেন,—"পড়দিকি কেমন পড়তে জানিস্?"

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীরা মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া, শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া, প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল্‌দিকি—এই কাব্যের কোন্ অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট?"

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন,—"যেখানে ইন্দ্রজিত যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমান হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বর্হিগমনোম্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। "যা হ'বার হ'ক্ গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক্ আর যাক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন ভঙ্গী আজিও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরুক রহিয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের কথা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাহাকেও বলেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ সোম

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া মাথাটা ঝামা করিয়া ফেলিয়াছি, তত্রাচ ইহার প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা আজও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।' ধর্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত কখনও ঠিক বুঝা যায় নাই। খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কখনও কোন কথা বলিতে শোনা যায় নাই। তিনি মহাপ্রাণ ছিলেন; তিনি সকল ধর্ম্ম ও সকল সমাজকেই আপনার ভাবিতেন, তাই তিনি কোন সমাজের

সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু-সমাজের চূড়ামণি ব্রাহ্মণকেও বলিতে শুনিয়াছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবরণে মধুসূদন একজন পূর্ণ হিন্দু ছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনাল্ড একটি বক্তৃতায় মধুসূদনের প্রসঙ্গে বলিয়াছে, "He drew his inspirations from Jesus of Nazareth and from the well of purity." তাঁহাদের এ সকল কথা মধুসূদনের প্রতি তাঁহাদের গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। মধুসূদনের ধর্ম্মভাব এত নিগূঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে নিহিত ছিল যে, অপরের তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের কথা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্যন্ত তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

মধুসূদন জীবনে কখনও বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে যে ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তাঁহার বিষাদান্ত জীবনের ধর্ম্মমহিমামণ্ডিত প্রোজ্জ্বল শেষ-দৃশ্য ধর্ম্ম-জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বীর-কবির বীর হৃদয় মৃত্যুভয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। যিনি যথার্থ জ্ঞানী ও ভক্ত যিনি যথার্থ মনুষ্যেত্বের সহিত জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি অন্তিমে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় তনুত্যাগ করেন। কে বলেন মধুসূদনের পরিণাম শোচনীয়? যে মহাপুরুষের নিকট পার্থিব পথের ধূলি মূল্যবান ছিল না, সেই মধুসূদনের পরিণাম যেরূপ পুণ্যময়, তোজোময় ও গৌরবজনক হইতে পারে স্বয়ং বিশ্ববিধাতা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে মধুসূদনের হিন্দু ও ব্রাহ্মচরিত লেখকগণের প্রতিবাদ করিয়া "সম্মিলনী' নামক বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ সম্মিলনীর মাসিক পত্রিকায় "মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি খ্রীষ্টে অবিশ্বাসী ছিলেন?' নামক ধারাবাহিক বিস্তৃত প্রবন্ধে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া মধুসূদনকে যথার্থ খ্রীষ্টবিশ্বাসী পুরুষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরাও মধুসূদনকে কখনও কোথাও অবিশ্বাসী বলি নাই; বরং খ্রীষ্টধর্মে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্মচরিত-লেখকগণের বিপক্ষে নানা কথা বলিলেও, আমরা উক্ত প্রবন্ধাবলী হইতে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আমরা অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তিনি (মাইকেল মধুসূদন) সর্ব্বদা গ্রীক্ ভাষায় New Testament পড়িতেন এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অনেক সময়ে নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিয়া পরামননে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার উপাসনা কোন লোকের পরিলক্ষণের বিষয় ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে সাধারণ খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিতেন।

*   *   *   *   *

একদিকে তাঁহার আত্মীয় অনাত্মীয়দের আক্রোশ ও অত্যাচার এবং অপর দিকে তাঁহাদের প্রলোভন প্রসাদ বর্ষণের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি হারান নাই। জগতে স্বজন-নিষ্কাসিত, বিতাড়িত ও নিঃসম্বলীকৃত হইয়াও, তিনি সেই পৌলবর্ণিত আদর্শ-বিশ্বাসীর ন্যায় খ্রীষ্টের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসে পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসের এরূপ প্রগাঢ় ধৃতি দেখিয়া কে তাহাকে ন্যায্যতঃ খ্রীষ্টে অবিশ্বাসী বলিয়া অবগান করিতে পারে?

*   *   *   *   *

"যদিও বা কখনও খ্রীষ্টীয়ান মাইকেল মধুসূদনের ধর্ম্মজীবন...অবিশ্বাসীর ন্যায় দেখাইয়াছিল, তাহা হইলে কি তাহা শেষ পর্যন্ত এরূপ ছিল? যখন আমরা জানি তাহা ছিল না, তখন তাঁহার

ধৰ্ম্মজীবনের অনেকের অপেক্ষ আরও অনুসন্ধিৎসুতা, আরও জ্ঞানপিপাসুতা, আরও সজীবতা সপ্রমাণ করিয়াছিল। ....তিনি জীবনান্ত পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী ছিলেন।

"মাইকেল মধুসূদন একটি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, অনেক বিপদ, অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। এবং তিনি যে সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার অমূল্য ধৰ্ম্মকে হৃদয়ে অক্ষতভাবে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা শ্লাঘ্য, এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি মনুষ্য স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও অনুভূতির উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক,—

"Earth cannot show so brave a sight
As when a single soul doth fence
The batteries of alluring sense,
And heaven views it with delight,

"আমি এখানে মাইকেল মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মের অটল বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটি নির্ব্যূঢ় প্রমাণ দিব। কয়েক দিবস হইল, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধবলাটের প্রবীণ জমিদারবাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, 'অনেক বৎসর পূর্বের তাঁহার বাটীতে মাইকেল মধুসূদনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন; কিন্তু আহার করিবার পূর্বে খ্রীষ্টীয় প্রথা অনুসারে প্রার্থনা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'মাইকেল মধুসূদন যে সম্পূর্ণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা আবার কে সন্দেহ করে। এ বিষয়ে ত তর্কের কিছুই নাই।

"খ্রীষ্টীয়ানদের ভোজন করিবার পূর্বে খাদ্যদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার বা grace উচ্চারণ করিবার প্রথা আছে, এবং সেই ধন্যবাদ খ্রীষ্টের নামে দেওয়া হয়। যিনি যাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি তাঁহার প্রতি আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে চান। তাই হিন্দু বাটীতে নিমন্ত্রনের প্রসন্নতার উপভোগী হইতে গিয়া, সেখানে খ্রীষ্টীয় প্রথা পালনে বা "খ্রীষ্টীয়ানী" করায়, কিন্তু গৃহস্বামীর প্রীতিকার না হইবারই কথা। কিন্তু ইহা জানিয়াও যে, মাইকেল মধুসূদন grace পালনে বিরত হন নাই, তাহার দ্বারা তাঁহার পরীক্ষায় অবিচলিত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি মনে অখ্রীষ্ট বিশ্বাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু বাটীতে তাহা পালন না করিতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি যখন সেখানে তাহার পালনে বিরত হন নাই, তখন তাঁহাকে বরং অনেকের অপেক্ষা অধিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসী না ভাবিয়া, অন্য কি ভাবিতে পারি?

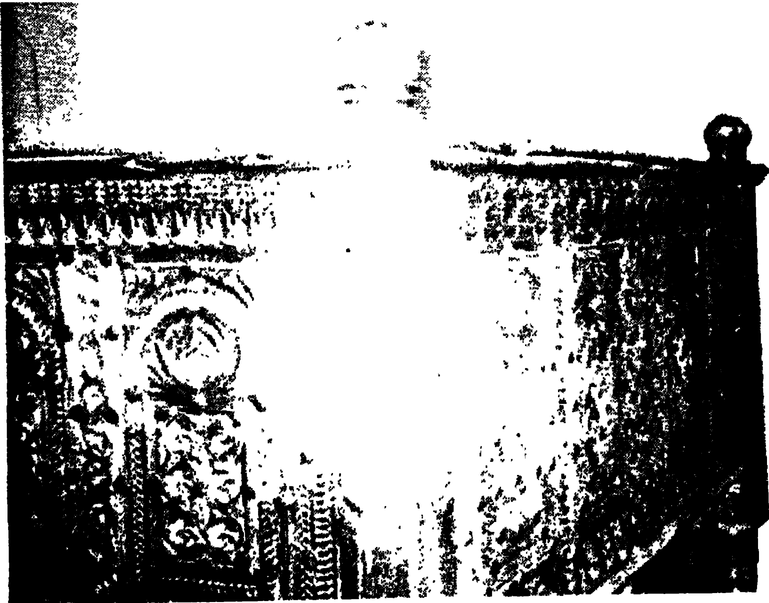
"...... আমি সত্যের মর্য্যাদার জন্য বলিতে চাহি যে, সমস্ত অনুধাবন পূৰ্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার ন্যায় কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া কয়জন বিশ্বাসী অবশেষে বিজয়ী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? তিনি তাঁহার প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া কয়জন বিশ্বাসী অবশেষে বিজয়ী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? তিনি তাঁহার প্রলোভন ও পরীক্ষা-ভূয়িষ্ঠ জীবনে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি আমাদের প্রশংসাহ ও তাঁহার জীবন আমাদের বিশ্বাস প্রবৰ্দ্ধক। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় weighed in the balance and not found wanting.



কবি শ্রী মধুসূদন জন্মেছিলেন এই কক্ষে (সাগরদাঁড়ি)



কবি শ্রী মধুসূদন দত্তের বাড়ি (সাগরদাঁড়ি)



পিতা রাজনারায়ণ দত্তের ব্যক্তিগত সিন্ধুক (সাগরদাঁড়ি)



এই কাঠবাদাম বৃক্ষটি কবিকে পিতার ন্যায় স্নেহ দান করেছিল,
এরই ছায়াতলে কবি বিশ্রাম নিতেন। (সাগরদাঁড়ি)



রাজনারায়ণ দত্তের এটি কাছারি বাড়ি (সাগরদাঁড়ি)



শ্রী রাজনারায়ণ দত্তের নিজস্ব দেবালয়,
এখনও এখানে দুর্গাপূজা হয় (সাগরদাঁড়ি)



রাজনারায়ণ দত্তের কাছারি বাড়ির প্রবেশের মূল ফটক
(সাগরদাঁড়ি)



কবির পৈতিক বসত বাড়ির একটি অংশ (সাগরদাঁড়ি)



কবির পৈতিক বসত বাড়ির একটি অংশ,
যেখানে কবির আবক্ষমূর্তিস্থাপন করা হয়েছে (সাগরদাঁড়ি)



কবির প্রিয়তম নদী যশোহরণ-কপত অক্ষিরমতো বয়ে চলেছে
কপতাক্ষি (সাগরদাঁড়ি)



ছোটবেলায় কবি এই বাগানে বন্ধুদের সাথে রস চুড়ি করতে এসে
ধরা পড়েছিলেন, সাগরদাঁড়ির এক প্রাকৃতিক দৃশ্য

আবার কোলকাতা ইংলন্ড গুড নাইট

যেমন একাকী ৯ই জুন ১৮৬২ সালে স্কান্ডিয়া জাহাজে চেপে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যার রীতিমত ব্যবস্থা করে ঠিক তেমনি ১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে স্ত্রী পুত্র কন্যার রীতিমত ব্যবস্থা করে একাকী ফিরলেন কোলকাতায় ফ্রান্স থেকে। কবি সব ব্যবস্থা করেছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যাদের, কিন্তু আশ্চর্য্য কোন ব্যবস্থাই কবির জীবনে বাস্তবায়িত হয় নি। অভাবের নিদারুন কষ্টে হেনরিয়েটা পুত্র কন্যা কে নিয়ে ইংলন্ডে স্বামীর কাছে যেমন পৌঁছেছিল ঠিক তেমনি ফ্রান্সে সময় মত টাকা না পাওয়ায় আবার পুত্র কন্যা কে নিয়ে একাকী কোলকাতায় এলেন। কবির জীবনের পথ কন্টকময়। কবি ফ্রান্স থেকে বিদ্যাসাগর কে লিখেছিলেন আমার জন্য একটি ছোট বাসস্থান ঠিক করে দেবেন, এবং দেখবেন যাতে কোন অন্নকষ্ট না হয়, বিদ্যাসাগর কথা মত সুকিয়া স্ট্রীটের উপরে দোতলা একটি বাড়ীর বাইরের অংশটি ইউরোপীয় কায়দায় সাজিয়ে রাখলেন কবি এখানে এসে থাকবেন। বাড়ীটি ছিল বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কিন্তু আশ্চর্য্য কবি সেখানে না উঠে সোজা গিয়ে উঠলেন সাহেব পাড়ার স্পেনসেস্ হোটেলে। ঐ হোটেলে তিনি আড়াই বছর ছিলেন। ইউরোপীয় কায়দায় হোটেল টি সুসজ্জিত ছিল, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে পান ভোজন বিলাতী খানা বাবুর্চ্চি, এমন কি হুকুম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাবুর্চ্চি তার রান্না করবে, এলাহি ব্যাপার, হোটেলটিতে যেন চাঁদের হাট বসেছে। কবি সাহিত্যিক বন্ধু বান্ধব কে সেখানে উপস্থিত নেই।

বিদ্যাসাগর শুনলেন মধুসূদন কোলকাতায় এসে স্পেনসেস্ হোটেলে উঠেছে, শোনা মাত্রই ধুতি চটি জুতো পরে চললেন স্পেনসেস হোটেলে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তিনি দেখলেন বন্ধুদের নিয়ে বিদেশী সঙ্গীত, মদের ফোয়ারা রসনা তৃপ্ত না না বিধ খাদ্য সমভিব্যহারে মধুসূদন মধ্যমণি। বিদ্যাসাগরকে দেখেই কবি নেচে উঠলেন ছুটে গিয়ে কোমর ধরে বিদেশী নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। বিদ্যাসাগর মধুর এই উল্লাসে হাঁপিয়ে উঠে বললেন, তুমি যে বলেছিলে তোমার জন্য একটি বাড়ী ঠিক করে রাখতে, আমি তো তোমার জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে একটি সুন্দর বাড়ী ঠিক করে রেখেছি, তুমি সেখানে না গিয়ে এই ব্যয়বহুল হোটেলে উঠলে কেন? আবার বিদ্যাসাগর কে জড়িয়ে ধরে বললেন তুমি কি চাও আমি ভিক্ষারী বামুন পাড়ায় বাস করি? বিদ্যাসাগর এতই স্নেহ করতেন তাই কোন উত্তর না দিয়ে তিনি মুচকি হাসলেন, বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটার পর ১৮৬৯ সালে স্পেনসেস হোটেল ছেড়ে তিনি উঠলেন মিসেস হেরিংস্ হোটেলে। ইতি মধ্যে তাঁর ব্যারিষ্টারী সমাজে প্রবেশ করতে কম হেনস্থা হতে হয়নি। বিলাত থেকে ফিরেই তিনি অল্প কিছু দিনের মধ্যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে (বার্নস পিকক) আবেদন করলেন, প্রধান বিচারপতি বার্নস পিকক মধুসূদনের বায়োডাটা পড়ে মোহিত হলেন, এবং আবেদন গ্রাহ্য করলেন এবং বেশ কয়েক জন বিচারপতিকে গ্রাহ্য করতে অনুরোধও করলেন। প্রধান বিচারপতির কথা মত অন্যান্য বিচারপতিগন যেমন লক্, নরম্যান, কেম্প, বেলী, গ্রোভার, সিটন্‌কার এক বাক্যে সমর্থন করলেন তবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল বিচারপতি জ্যাক্সন ও ম্যাক্‌ফারসন্। তাঁরা স্বদেশীয়

কিছু ব্যবহারজীবীদের কাছে অনুসন্ধান করে জেনেছেন মধুসূদনের চরিত্র মোটেও ভাল নয় সুতরাং এই দুই বিচারপতি প্রধান বিচারপতি কে বললেন আগে মধুসূদনের চরিত্রের তদন্ত করা হোক, মধুসূদনের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় কিছু ব্যবহারজীবী গন ভয়ংকর কুৎসা রচনা করতে লাগলেন, তারা ভাবল মধুসূদনের মত এমন প্রতিভাবান মানুষ যদি ব্যবরিষ্টারীতে সুযোগ পায় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক স্রোতে অসুবিধা হবে, সেই জন্য তারা কুৎসা রচনা করতে লাগলেন যাতে বিচারতিগন তার আবেদন পত্র মঞ্জুর না করে, তাছাড়া বিচারপতি জ্যাক্সন ও ম্যাকফারসন রীতিমত ভারত বিদ্বেষী, সেই সুযোগ কে তারা কাজে লাগল। মধুসূদনের চরিত্রের তদন্তের ভার পোড়ল বিচারপতি সিটনকার এবং বিচারপতি শম্ভুনাথ পন্ডিতের উপর, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তারা প্রধান বিচারপতি বার্নস্ পিককের কাছে লিখলেন হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার এবং ব্যারিষ্টাররূপে মধুসূদন সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এদিকে মধুসূদনের নামে যে ভীষন অপপ্রচার। চারদিকে কুৎসা এবং চরিত্র নিয়ে টানা টানি।

পূর্বে যে সব বিচারপতিগন প্রধান বিচার পতির অনুরোধে মধুসূদন কে সমর্থন করেছিলেন, সেই সব বিচারপতিগুন মধুসূদনের ব্যাপারে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। তাঁরা বললেন এই রকম চরিত্রের মানুষ ব্যারিষ্টারী সমাজে প্রবেশ করলে ব্যারিষ্টারদের এবং কোর্টের অবমাননা হবে। বিচারপতি শম্ভুনাথ পন্ডিত বললেন কবিকে তুমি কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্বের সার্টিফিকেট (প্রশংসা পত্র) সংগ্রহ করে আবার আবেদনকর-আবেদন কর সত্তর।

মধুসূদন আবার আবেদন করলেন তবে এবার প্রশংসা পত্র নিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র এবং গৌরদাস বসাক এছাড়া আরো বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে। প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে প্রধান বিচার পতির কাছে জমা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিচারপতি গন বললেন বিশেষ করে জ্যাকসন সাহেব বললেন, ব্যারিষ্টারী সমাজে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই প্রশংসা পত্র যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রধান বিচারপতির ইচ্ছা থাকলেও মঞ্জুর করতে পারলেন না। শম্ভুনাথ পন্ডিত কবি কে ডেকে বললেন আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করে আবেদন কর। যাঁদের প্রশংসা পত্র পেলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হীরালাল শীল, রাজা টিপু সুলতানের পুত্র গোলাম মহম্মদ, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জী, প্রসন্ন সর্বাধিকারী, রমানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা কালী কৃষ্ণ ঠাকুর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রমুখ।

এবার নিন্দুক ও সমালোচকগন আর আটকাতে পারল না, কবি সকলের প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করে প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিলেন আবেদন পত্র। ১৮৬৭ সালের ৩রা মে সকল বিচারপতির সম্মতি পেলেন, এবং ব্যারিষ্টার রূপে হাইকোর্টে আত্মপ্রকাশ করলেন, ব্যারিষ্টার হয়ে মধুসূদন হাইকোর্টে এলেন। তিনি স্পষ্ট কথা বলতেন এবং রূঢ় সত্য বলতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না, বিচারপতি জ্যাকসন বিচারপতি কেম্প এর সাথে তার প্রায়ই বাদানুবাদ হত, এতে বিচারপতিগন বিরক্ত বোধ করতেন, কবির কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল না, অতিরিক্ত মদ্যপানে কণ্ঠস্বর ভগ্ন হয়েছিল, কণ্ঠস্বর ভগ্ন হওয়ার জন্য তাকে জোরে কথা বলতে হত। কবির তীব্র আওয়াজে বিচারপতি জ্যাকসন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—The court orders you to please slowly, the court has ears. মধুসূদন কথাটি ভালো মনে নেননি।

কবি জবাবে বলেছিলেন, But pretty too long my lord.

ব্যারিষ্টারিতে অর্থ আয় যেমন করেছেন দুহাতে, তা খরচ ও করতেন দুহাতে। এক বার বিদ্যাসাগর দেখলেন মধুসূদন এক গাড়োয়ান কে অনেক টাকা দিচ্ছে,বিদ্যাসাগর বললেন অত অর্থ দেবার কি আছে, ওর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেই তো হত, মধুসূদন উত্তরে বলেন my dear vid, তুমি জান না ও আমাকে কয়েক দিন নিয়ে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসছে এ আর এমন কি দিলাম, আরো কিছু কাছে থাকলে দিয়ে দিতাম। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে কবি তার পকেটে যা ছিল সব দিয়ে দিলেন অন্য এক বন্ধু পাশ থেকে বলল কত টাকা দিলেন কবি উত্তরে বললেন, Raj Narayan's son never counts money.

একদিন এক বৃদ্ধ পন্ডিত তাঁর বাসায় এলেন বন্ধু গৌরদাস সেখানে উপস্থিত, বৃদ্ধ পন্ডিত তার নিজের পরিচয় দিলেন, কবি শুনে আনন্দে অধির-তাঁকে ভালো করে খাইয়ে হাতে টাকা দিয়ে বললেন যখনই অসুবিধা হবে আপনি চলে আসবেন।

গৌরদাস বললেন মধু এ সব তুমি কি কোরছ। কবি উত্তরে বললেন, ঐ পন্ডিত আমার শিক্ষক ছিলেন। সাগরদাড়ীতে ওনার কাছে পড়েছি, কত যে বেত্রাঘাত খেয়েছি তার হিসাব নেই, ওনার জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না। তিনি তার ভৃত্যদের প্রায় সময়ই বকশিস দিতেন পাঁচ অথবা দশ টাকার নিচে কাউকে দিতেন না। তাঁর ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় সর্ব্বোচ্চ আয় হয়েছিল ২০,০০০ টাকা বছরে, অথচ তিনি বলতেন বাৎসরিক ৪০,০০০ হাজার টাকার নিচে ভদ্রভাবে একটা মানুষের চলে না।

কবি যেন সব দুঃখ ব্যাথা যন্ত্রণা সহজেই ভুলে যেতেন, বিদেশে কত কষ্ট পেয়েছেন, মাদ্রাজে কত কষ্ট পেয়েছেন সে সব কথা যেন তার কিছুই মনে নেই, টাকা যত আয় করেছেন তার অধিক তার ব্যয় হয়ে যেত, তিনি যে দেনায় দায়ে ডুবে আছেন সে সব যেন তার কোন খেয়াল নেই, অর্থ পরিশোধের কোন চিন্তা ভাবনা নেই, বিদেশে থাকাকালীন বিদ্যাসাগর কবি কে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে ঋণ করে ৫০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন, সে টাকা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কে পরিশোধ করা হয়নি, বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কে ভীষন ভাবে বিরক্ত করছেন, আবার সে সময় বিদ্যাসাগর বিপদাপন্ন, বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন এবং তখনি তিনি বেশ ঋণে জর্জরিত তদুপরি নিজেও অসুস্থ, বিদ্যাসাগর মধুসূদন কে লিখলেন যে সব পাওনাদারগণ আমাদের কাছে টাকা পাবে তা শোধ করতে না পারলে লজ্জার শেষ থাকবে না সত্বর টাকা পরিশোধের চেষ্টা করুন। মধুসূদন জলের দামে সমস্থ বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কে ঋণ ভার থেকে মুক্ত ও করলেন, ব্যারিষ্টারিতে প্রবেশ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কিছু আর করতে পারেন নি। ইউরোপ থেকে ফেরার পর, মাত্র ছয় বছর জীবিত ছিলেন। দেনায় জর্জরিত, চারদিকে পাওনাদারেরা ওৎ পেতে বসে আছে, যখনই ঋণের সুযোগ পেয়েছেন তখনই ঋণ করেছেন, দান করতে ভালোবাসতেন। ব্যয় করতেন রাজকীয় মেজাজে থাকার জন্য, হুকুম করতেন বন্ধুদের পানাসক্ত করতে, বিদ্যা অর্জনের প্রচেষ্টাতে অর্থ ব্যয় করতে যেমন তাঁর কোন চিন্তা ছিল না, ঠিক তেমনি ঋণ করতেও তার কোন কুণ্ঠা হত না। অর্থের অভাব পড়লে বিদ্যাসাগর কে ঋণের ব্যবস্থা করে দেখার জন্য বলতেও কোন সংশয় হতো না, বিদ্যাসাগর কেন স্বয়ং ভগবানও তাঁকে বাঁচাতে

পারবে না। নিজের মেজাজকে অক্ষুন্ন রাখতে ধার করে আসবাব পত্র কিনতেও কুণ্ঠা হতো না। আমরা হেনরিয়েটাকে বার বার দেখতে পাইনি, যত বার দেখেছি ততবার হতভাগিনী হেনরিয়েটার দুঃখ দেখেছি, দেখেছি মাদ্রাজে প্রেমের সময় কিছু দিন, দেখেছি কোলকাতায় অভাব যন্ত্রণা নিয়ে পুত্র কন্যা সহ একাকী ইংলন্ডে স্বামীর কাছে যাওয়ার সময় দেখেছি সেই অভাব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ফ্রান্স থেকে পুত্র কন্যা নিয়ে কোলকাতায় ফিরে আসতে দেখেছি স্বামীর কাছে।

আর দেখেছি মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর উত্তর পাড়ায়। এমন দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনার মধ্যে মৃত্যু বরণ করতে হবে বোধকরি ঈশ্বরও ভাবতে পারেন নি।

পাওনাদারদের অত্যাচারে মধুসূদন শেষ জীবনটা যেন পালিয়ে বেড়িয়েছেন, শুধুই বা শেষ জীবন কেন হিন্দু কলেজে পড়বার সময়, নিজের বিদ্যার অহমিকার জন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হয়ে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হলেন, বিশপ্স কলেজ থেকে পালিয়ে মাদ্রাজ গেলেন, আবার মাদ্রাজ থেকে ছদ্মবেশে কোলকাতায় পালিয়ে এলেন, আবার কোলকাতা থেকে ইংলন্ড, ইংলন্ড থেকে ফ্রান্স আবার ফ্রান্স থেকে কলকাতা সবটাই অনিশ্চিত জীবনের উপর আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে ছুটেছেন।

শেষ অধ্যায়ে এসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি পাওনাদারদের উৎপাতে শুধু ছুটেছেন, যে টাকা তিনি আয় করতেন অতি সহজেই পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু অমিতব্যয়ী কবি জীবন টাকে নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন, সেই সঙ্গে মোট সাতটি সন্তান ও দুটি স্ত্রী কেও কোন দিন সুখী করতে পারেন নি, তারাও জীবন যন্ত্রনায় ছট ফট করেছেন।

শেষ অধ্যায়ে দেখা যাবে আরও নতুন দৃশ্য এ দৃশ্যে পাঠকের চোখে জল ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না।

কবি যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি কোলকাতার বুকে স্বপ্নের স্বর্গ বানাতে চেয়েছিলেন, দেখা যাক তা কতখানি বাস্তবায়িত হল। এক দিকে সাহিত্য, যশ খ্যাতি, অপর দিকে অর্থ ও আইন ব্যবসা, তদানিন্তন সময়ের প্রায় সব কবি সাহিত্যিক কবি কে যথেষ্ট সমীয় কোরত, কিছু কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল। সমসাময়িক কবি সাহিত্যিক রাজা জমিদারদের তিনি মধ্যমনি ছিলেন, তাই বলে দুর্মুখও নিন্দুকের দল ও কম ছিল ন। বিদ্যাসাগরের কথা না শুনে তিনি একাই চলে এলেন ফ্রান্স থেকে কোলকাতায়, স্ত্রী পুত্র কন্যা রইলেন ফ্রান্সে, অর্থাভাবে ফ্রান্সে বেশী দিন থাকা সম্ভব হলো না। এমন কি হেনরিয়েটার কাছে জাহাজ ভাড়াও পর্য্যন্ত নেই। জাহাজ কোম্পানীর কাছে আবেদন করতে হয়েছিল অভাবের কথা কষ্টের কথা উল্লেখ করে। তাই জাহাজ কোম্পানী বিশেষ ছাড় দিয়েছিলেন, এ ঘটনা কি কবি জানতেন না। দেশে ফিরে কি সব দুঃখ ভুলে গেলেন? নিন্দকেরা তো সযোগ নেবে।

"স্বর্গের আহ্বান"
অস্তাচলে রক্তিম সূর্য
(তোমরাও যদি পারো আমাকে ধন দাও)

আজ কবি গৃহহীন, মাত্র সাত হাজার টাকায় কবি হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বাড়ীটি বিক্রী করে দিয়েছিলেন, তিনি সেদিন একবার ও ভাবেন নি বিলাত থেকে ফিরে এসে কোথায় থাকবেন। নিয়তি কাউকে বোধ করি ক্ষমা করে না। বিলাত থেকে ফিরে সোজা উঠলেন স্পেনসেস্ হোটেলে তারপর একের পর এক বাসা পরিবর্তন, যেমন-দুঃখ্যের বিষয় ঠিক তেমনি তাঁর বৈষয়িক জ্ঞান হীনতার উল্লাসে এক অন্ধকার ট্রাজেডির মধ্যে শুধুই ছুটেছেন, বেশ কিছুদিন ছিলেন লাউডন স্ট্রীটের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, হায় রে নিয়তি!—এবার লাউডন স্ট্রীটের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছাড়তে বাধ্য হলেন, পাওনাদারদের উৎপাতে বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়, সপরিবারে চলে এলেন ইন্টালীর বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়ীতে, ব্যারিষ্টারীতে অর্থ আয় আর হচ্ছে না, পাওনাদারদের কাছে কঠিন ছিল না কবিকে খুঁজে বার করার পথ, পাওনাদারদের জন্য তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন আবার পঞ্চকোটের মহারাজার কাছে চাকরি করতে, সেখানেও বিধি বাম পারলেন না বেশী দিন চাকরি করতে, আবার ব্যারিস্টারী ব্যবসা আরম্ভ করলেন, হেনরিয়েটাকে জড়িয়ে ধরে কবি বললেন একটু কষ্ট কর। ৬নং লাউডন স্ট্রীটের মত এবার প্রসাদোপম অট্টালিকা দিতে পারলাম না। ভাড়াছিল মাসিক চারিশত টাকা, হেনরিয়েটা চোখে দেখেছে স্বামীর উদারতা। সত্যি তো লাউডন স্ট্রীটের বাড়ী ছিল ঐশ্বর্য্যময় ভীষণ আনন্দে দিনাতিপাত করেছিলেন, তা বোধ করি তার খেয়াল ছিল না, সন্ধ্যাবেলা গ্রান্ড ক্যারেজ নামক অশ্বযান নিয়ে সপরিবারে ভ্রমণ, বন্ধুদের নিয়ে রাতের বেলায় রাজকীয় খানা, পান ভোজন, নৃত্য, সংগীত, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাচককে বহাল, উপাদেয় রসনা তৃপ্তির জন্য। সকাল বেলায় পাঠাগার কাব্য চর্চ্চা, কক্ষের চারিদিকে হোমার মিলটন ভার্জিল টাসোর শেক্সপীয়রের মূর্ত্তির দিকে তাকানো, কবি ইউরোপ থেকে সব মূর্ত্তি এনেছিলেন, রাতে শোবার আগে আর এক বার পান ভোজন অথচ বাড়ীর নীচে পাওনাদারেরা বসে আছে, অশ্লীল ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কবি ঘর থেকে বেরুতে পারছেন না তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বিপদের দিনে আইনের পরামর্শ নিতে আসতেন তাঁরা ফি দিতে গেলে কবি বলতেন তা কি করে হয়। বন্ধুদের কাছ থেকে ফি নেওয়া যায় না একবার বন্ধু গৌরদাস বসাক এক ব্যক্তিকে আনলেন কবির কাছে আইনের পরামর্শের জন্য, কবি পরামর্শ দিলেন। ভদ্রলোক ফি দিতে গেলে কবি গৌরকে ডেকে বললেন গৌর ভদ্রলোক তোমার বন্ধু আমি কোন মুখে তোমার বন্ধুর কাছ থেকে ফিস নিই বল। ওর কাছ থেকে ফিস নিলে তুমিই ছোট হয়ে যাবে। ভদ্রলোক তোমার বন্ধু মানে আমারও বন্ধু।

যাই হোক এখন তুমি হেনরিয়েটার হাতে পাঁচটা টাকা দাও আজ আমার ঘরে একটি পয়সাও নেই। ঐ টাকায় চাউল আনা হবে তবে আমি কোর্টে বেরুতে পারব। গৌর মধুসূদনকে বললেন, তোমাকে এত টাকা ফিস্ দিতে এল, তুমি নিলে না আর আমার কাছে পাঁচটাকা ধার চাইছ, গৌর বিস্মিত হয় নি কারণ গৌরদাস মধুসূদনের আচরণ জানত। কবির অবস্থা শোচনীয় বাড়ীর নীচে

পাওনাদারদের তাগাদায় ঘর থেকে বেরুতে পারছেন না। একদিন বন্ধু রাধাকিশোর ঘোষ নিজের মামলার জন্য কবিকে পালকির মধ্যে করে পাওনাদারদের নজর এড়িয়ে নিয়ে গেলেন হাইকোর্টে আবার পালকির মধ্যে করে পালিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন সঙ্গে রাধাকিশোর ঘোষ ছিলেন, কবিকে ফিস্ দিতে গেলে কবি বললেন, বন্ধুর কাছ থেকে কি ফিস্ নেওয়া যায়? রাধাকিশোর ঘোষ বহু পীড়া পীড়ি করলেন ফিস্ দেবার জন্য, কবি হেসে বললেন, তুমি যখন দেবেই ভেবেছো তাহলে এক বোতল বার্গেন্ডি হুইস্কি আধ ডজন বিয়ার এবং একশত মালদহের আম্ আন। শরীরের অবস্থা তখন ভীষণ খারাপ, কয়েক দিন বাদে ঢাকায় চললেন সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে একটি মামলার জন্য। ঢাকা বাসীগণ কবির সম্মানার্থে সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, ঢাকার নাগরিকবৃন্দ কবিকে সম্বর্ধনাও দিলেন, কবি তার উত্তরে সুন্দর একটি সনেট লিখলেন—

নাই পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুল বৃন্তে ফুল যথা রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাধা লক্ষ্মী 'থাকে এই খানে
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীনা পানি।
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে
করিও না ঘৃণা মোরে তুমি ভাগ্যবতী।

ঢাকার পোগোজ স্কুলে ঢাকার নাগরিক বৃন্দ মর্যাদার সঙ্গে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু কবি তার, উত্তরে কবিতা লিখে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেই অভাব, দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার কথা, তোমরাও যদি পার আমাকে ঋণ দাও এদিকে কোলকাতায় ঋণভারে জর্জরিত, আবার প্রকারন্তরে ঋণ করতে চাইছেন, শুধু অর্থ চাই, কত অর্থ হলে কবি সুখি হতে পারতেন তার কোন অংকের সংখ্যা বোধ হয় গণিত শাস্ত্রে নাই। কবি ঢাকা বাসীগণ কে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি জানি
সৌভাগ্য অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে হে সুন্দরী! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কর, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্নবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদ তলে কুরুকুল পতি।

ভীষণ অসুস্থ শরীরে ফিরলেন কোলকাতায়। কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

এবার কবি ইন্টালীর বেনেপুকুরে বাড়ী ভাড়া করে আছেন, একদিন দুপুব বেলায় মনোমোহন বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন মধুসূদন প্রচন্ড গরমে ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে এ দিকে হেনরিয়েটা ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, মনোমোহন জিজ্ঞাসা করলেন মধুসূদন কোথায়?

হেনরিয়েটা অতি কষ্টে বললেন, আজ ভোর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে, এ দৃশ্য দেখে মনোমোহন অস্থির হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন, মধুসূদন ভিতর থেকে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে দরজার খিল খুলে দিলেন, দরজা খুলতেই দেখলেন কবি দরজায় ঠেস

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দেহ দিয়ে ভীষণ ঘাম ঝরছে, কবি প্রায় অচৈতন্য, মেঝেতে পড়ে আছে কয়েকটি বিদেশী মদের বোতল, হাতে এক গ্লাস মদ মনোমোহন বললেন—এই ভ'র দুপুরে আপনি এ কি করছেন? র' মদ খাচ্ছেন? তাও সকাল থেকে খালি পেটেই? এর পরিণতি কি আপনি জানেন? কবি মনোমোহনকে বললেন সব জানি এই ভাবে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই। মনু হেনরিয়েটাকে একটু দেখ ওরও অবস্থা মোটেই ভাল নয় বলেই বললেন মনু জানো? জানো মনু ? আমি তো রাজার মত বাঁচতে চেয়েছিলাম তাছাড়া মনু বিশ্বাস কর আমি যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসী তাই অস্ত্রাঘাতে মরার চেয়ে এই ভাবে আনন্দে যন্ত্রণায় মৃত্যু বরণ করা অনেক ভালো।

Poor monu-This is a process equally sure, but less painful.

এ অবস্থায় তার সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নাই। তবু তিনি লিখে কিছু অর্থ আয় করতে চেয়েছেন কিন্তু শরীর বইছে না, স্ত্রী পুত্র কন্যার অনাহার অর্ধাহার, সংসারে যা ছিল সব বিক্রী করে দিয়েছেন, পাওনাদারদের অত্যাচারে সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে কিছু কিছু পাওনাদারদের অর্থ পরিশোধ করেছেন, কিন্তু এখনো তো বহু পাওনাদার আছে। তাই চাই অর্থ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধে অর্থের বিনিময়ে তিনি আবার লেখা আরম্ভ করলেন, কিন্তু কি করে তিনি লিখবেন শরীরে আর কিছু নেই, নিজের জীবন যন্ত্রণার ইতিহাস লিখলেন মায়াকাননের মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না, রোগের যন্ত্রণায় দেহ অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। মায়াকানন লিখতে লিখতে আর একটি নাটকে হাত দিলেন অর্থের বিনিময়ে, নাম বিষ না ধনুর্গুন এখানিও শেষ করতে পারলেন না।

স্ত্রী হেনরিয়েটা রোগশয্যায় শায়িত আর কবির যন্ত্রণা আরো প্রকট আকার ধারণ কোরল তদুপরি ঋণ দাতাদের অত্যাচার, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কানে মধুসূদনের এই চরম অবস্থার কথা পৌঁছেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মাইকেলকে বললেন আপনি আমার উত্তর পাড়াস্থ বাস গৃহে অবস্থান করুন, জীবনের শেষ কটি দিন কবি উত্তর পাড়ায় কাটিয়েছিলেন। কবি ভাবলেন পাওনাদারদের পক্ষে এত দূর আসা সম্ভব নয়, কারণ সে সময় কোলকাতা থেকে উত্তর পাড়া যাওয়া খুবই ব্যয় বহুল, কিন্তু কবি জানতেন না শকুনের চোখ কত দূর যেতে পারে, পাওনাদারেরা খোঁজ খবর নিয়ে চিঠি পাঠাতে লাগল। কবি একা একা যখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দোতলায় গঙ্গার দিকের প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারী করতেন তখন তার মনে পড়ত হেনরিয়েটা পিয়ানো বাজাচ্ছে, শর্মিষ্ঠা একটি ইংরাজী গান আরম্ভ কোরল শর্মিষ্ঠার গানে মুগ্ধ হয়ে কবি কন্যাকে নিয়ে নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন, হেনরিয়েটা আনন্দে বিহ্বল। হঠাৎ কানে এল হেনরিয়েটার ক্রন্দন, রোগের যন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে হেনরিয়েটা ছট ফট করছে কবি ও ঘন ঘন রক্ত বমি করছে, গৌরদাস মাঝে মাঝে আসতেন কবিকে দেখতে। সে দিন খবর পেয়ে গৌরদাস ছুটে এসে দেখলেন শয্যাশায়ী কবির মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ছে, রোগ যন্ত্রণায় কাতর, অন্যত্র পত্নি হেনরিয়েটা জ্বর এবং রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কবি গৌরদাসকে দেখে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন, গৌরদাস দেখলেন কবির নয়নদ্বয় থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে। পত্নির রোগ যন্ত্রণায় মধুসূদন অধীর হয়ে উঠছেন, গৌরদাস হেনরিয়েটাকে দেখতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে হেনরিয়েটা বললেন "আমি মরিতে ভয় পাইনা আপনার বন্ধুকে বাঁচান"। উত্তরপাড়ায় তাঁদের কোন উন্নতি হল না।

গৌরদাস বসাকের নিজের চোখে দেখা করুণ বিবরণ নিজেই লিখে গেছেন—

I shall never forget the heart rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Madhu in the rooms of the uttarparah public library, where he was staying for change.

He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor.

Seeing me enter the room Madhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and suffering; "afflictions in battalion" were the words he uttered.

I knelt down to feel her pulse and Temparature; she pointed with her finger towards her husband, heaven a deep sigh and sobbed out in a low voice. "Look to him, Tend him leave me alone I care not to die.

আবার উত্তরপাড়া থেকে চলে এলেন বেনিয়া পুকুরের বাসায়, কবি এখন উত্থান শক্তি রহিত। কে কবিকে দেখবে আর কে বা হেনরিয়েটাকে দেখবে, মধুসূদনের এই চরম অবস্থার কথা ধীরে অনেকের কানে পৌঁছাল, কবির সমস্ত বন্ধু বান্ধবগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, ছুটে এলেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, গৌরদাস তো আছেনই, সকলে আলোচনা করে ঠিক করলেন কবিকে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।

ঐ হাসপাতালে কোন এশিয়দের চিকিৎসা করানো যেতো না, এই হাসপাতাল ছিল কেবল মাত্র ইউরোপীয়দের। ঐ সময় ঐ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার জে, ডাবলিউ পামর, তাঁর সঙ্গে কবির বিশেষ সক্ষতা ছিল, এমন কি কবির বাড়ীতেও চিকিৎসার জন্য একদা যেতেন। সকলের পরামর্শে সকলের সহযোগীতায় কবিকে ভর্ত্তি করানো হল আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কিন্তু হেনরিয়েটাকে কে দেখবে বেনিয়াপুকুর থেকে হেনরিয়েটাকে স্থানান্তরিত করে রাখা হল কন্যা শর্মিষ্ঠার বাড়ীতে। মনোমোহন শর্মিষ্ঠাকে আশ্বস্থ করে বললেন তোমার মায়ের ঔষুধ পত্রাদির খরচ আমি দিব।

হতভাগিনী পত্নী হেনরিয়েটা কি অবস্থায় আছেন মধুসূদনের পক্ষে দর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর অবস্থা ক্রমেই শেষের দিকে, কবির মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুন হেনরিয়েটা সবাইকে ত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে গেলেন। হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন কবির বন্ধুগণ লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁকে সমাহিত করা হল। তখন মধুসূদন মৃত্যু শয্যায় ছট ফট করছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সুন্দরভাবে মধু স্মৃতিতে ঐ সময়ের বর্ণনা করেছেন।

"হেনরিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুসূদনের এক পূর্বতন কর্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীর বিয়োগ বার্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু আর্ত্ত মধুসূদনের শুষ্ক কণ্ঠে, রুদ্ধ স্বরে কেবল বলিলেন, জগদীশ। আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন ? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই; আমি সত্বরই হেনরিয়েটার অনুবর্তী হইব।

এই শোক সংবাদে মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষপিঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল' কবির এখন বিছানা থেকে ওটার ক্ষমতা নেই, একদিন রাতের বেলায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ কবির দুই বন্ধুকে নিয়ে ধীরে ধীরে কবির শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, হঠাৎ কবি চোখ খুলে দেখেন মনুকে, নিচের দিকে তাকাতেই দেখলেন তার এক ভৃত্য শয্যার নিচে মাটিতে বসে আছে। মনুকে দেখে কবি কেঁদে ফেললেন, মনোমোহন চোখে জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন আপনি চিন্তা করবেন না আমরা তো আছি, কবি মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন কম্প্র কণ্ঠে মনোমোহন—

"সকল তো ভদ্রচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোন ত্রুটি হয় নাই, কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র, দিগম্বর মিত্র কি উপস্থিত ছিলেন" মনোমোহন বললেন" সকলই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে কোন ত্রুটি হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মনুর হাত ধরে বললেন ভাই আমার শেষ অনুরোধ আমার শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছে" ডাঃ পামর আমাকে পরীক্ষা করতে এসে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন আর হয়ত আমি দু-তিন দিন আছি এবার আমাকে বিদায় লইতে হইবে অতএব ভাবিয়া দেখ আমার দিন ঘন্টা মিনিট সীমাবদ্ধ, মনোমোহনের হাত ধরে কবি আরো বললেন তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়, তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত মনে প্রাণত্যাগ করিয়ে পারি। If you have one bread, you must divide it between your self and my children. If you say you will. I depart with consolation.

কবি নিজে রোগপয্যায় যত কষ্ট পেয়েছেন তার থেকে বেশী যন্ত্রণা মনে জাগত পাওনাদারদের অশ্লিল গাল মন্দে মৃত্যু শয্যায়ও তিনি অতিষ্ট হয়ে উঠতেন, মনের মধ্যে কবির অতীত স্মৃতি জেগে উঠত। হেনরিয়েটা কত কষ্ট করেছে আমার সাথে বিদেশ বিভুইয়ে সে আমার সাথে জীবন কাটালে নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজন সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে আমাকে ধরে রাখল, কিন্তু ওর জন্য কি করতে পারলাম!

মধুসূদন হাইকোর্টের এক অনুবাদক কর্মচারী মিঃ ফ্রয়েড এর সাথে বালিকা শর্মিষ্ঠার বিবাহ দিলেন বয়সে ফ্রয়েড ও শর্মিষ্ঠা অনেক ছোট বড় ছিলেন সংসার খুবই ছোট হল কনিষ্টপুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন এবং হেনরিয়েটাকে নিয়েই সংসার, কিন্তু অসংযত চিত্ত কবি পারলেন না জীবনকে সুস্থ ভাবে পরিচালনা করতে। দুঃখ আছে ব্যথা আছে যন্ত্রণা আছে অভিমান আছে কিন্তু বাস্তবজীবনের পথ দেখতে পাননি কোন দিন।

কবি যাঁর কাছে সংস্কৃত শিখতেন সেই পন্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রায়ই দেখতে যেতেন কবিকে তিনি লিখেছেন এক এক দিন মধুসূদন এত রক্ত বমন কোরত যে এক একটা বড় বড় পাত্র ও ভ'রে যেত। কবি মৃত্যুর সংকেত পেয়ে ছিলেন।

আর একদিন মনোমনোহন এলেন ধীরে কবির শয্যাপার্শে, মনোমোহন কে দেখেই কবি বললেন—মনু দেখ তো আমার স্মৃতি লোপ পেয়েছে কি না বলেই তিনি ম্যাক্‌বেথ থেকে সুন্দর ভাবে আবৃত্তি আরম্ভ করলেন।

To morrow and to morrow and tomorrow
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable or recorded time,

And all our yesterday's have lighted fools
The way to dusty death, out, out brief candle,
Life is but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage.
And then is heard no more, it is a tale
Told by an idiot. full of sound and funy
Signifying nothing–

মনোমোহন কবির কণ্ঠ থেকে সুন্দর সুস্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন এই সব চিন্তা করার দরকার নাই আপনি সত্বর সুস্থ হয়ে উঠবেন। মনোমোহনের হাত ধরে বললেন God bless you my boy আবার মনোমোহনের হাত ধরে বললেন—মনু এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক ও ধাত্রী গণ কে কিছু বক্‌শিস দিতে হবে, এরা আমার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করছে কিন্তু আমার কাছে একটি পয়সাও নাই, তুমি এদের কিছু বক্‌শিস দিতে পারো।

মনোমোহন বললেন, এনিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, আমরা বক্‌শিসের ব্যবস্থা করে দেব। কবির মৃত্যুর সময় আরো এগিয়ে এসেছে ডাঃ পামর পরীক্ষা করে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন সময় আর নাই, পাদরীদের কাছেও খবর চলে গেছে, মৃত্যুর আগেই পাদরীগণ কবির সমাধি নিয়ে গোলযোগ আরম্ভ করে দিল এমন কি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য স্বার্থ বাদী রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শয্যাশায়ী কবির কাছে এসে বললেন তোমার অন্ত্যোষ্টিতে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে, কারণ তুমি কোন গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, অন্তিম শয্যায় এই শুনে মধুসূদন অবাক হলেন, তিনি জোরের সঙ্গে বললেন 'আমি মানুষের তৈরী গীর্জার সঙ্গে সংস্রব রাখা প্রয়োজন মনে করি না আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নাই। I am going to rest in my lord he will hide in his best resting place.

১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরে (২টা) প্রাণ ত্যাগ করলেন। নাগেন্দ্রনাথ সোম তার সুন্দর বিবরণে এই মুহূর্তটিতে তুলে ধরেছেন।

"মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুত গতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অবিরাম জনসমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের মতভেদ ও বাদানুবাদে। বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মরদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘন্টারও অধিক কাল মৃত্যাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

পর দিন ৩০শে জুন সোমবার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অপরাহ্নের মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস অ্যান্ড কোম্পানী লোয়া সার্কুলার রোড সমাধি ক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধীরে, নীরবে সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধার বাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন।

যখন মধুসূদনের অন্ত্যোষ্টির বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল যখন মত ভেদ নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ্ত সহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন—তৎপূর্বেই জেম্‌স্ গির্জার আচার্য (Chaplain) রেভারেন্ড ডাক্তার পিটার জন জারবো স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই।

মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি সমস্যার সময় মহামতি জার্‌বো নির্ভিক চিত্তে মত বিরোধী পাদরীদিগকে বলেন—যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মন্ডলী ভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না, তাঁহার খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না একথা কে বলিতে পারে।

কবির শবাদার সমাধি বিবরের উপরিভাগে সুরক্ষিত হইলে রেভারেন্ড জারবো সহোদয় Anglican Church এর ক্রিয়া পদ্ধতি ও বিধি অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জারবো ও কবির আত্মীয় স্বজন সকলে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শেষ ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমন্ডলী শবাধার পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবির দেহ সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকা রাশির দ্বারা সমাধি বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

কবি মধুসূদনের শেষ জীবনের কথা অনেক জীবনীকার গণ লিখিতে গিয়ে অতি মাত্রায় কবিকে ছোট করে ফেলেছেন, কবির শিশু দুটিকে আহার কুড়িয়ে খাবার ব্যবস্থা করে ছেড়েছেন জীবনী কারেরা। তবে এর বেশী দুঃখের বর্ণনা করা উচিত নয়। কবির অর্থের অভাব ছিল না, যশের স্বর্ণ সিংহাসনে ছিলেন, বন্ধুভাগ্য বোধ করি এমন পৃথিবীর কারো ছিল কি না সন্দেহ তবে কবিকে আলিভার গোল্ড স্মিথের সঙ্গে তুলনা করা চলে কারণ গোল্ড স্মিথ ও কবির মত অমিতব্যায়ী ছিলেন, এত অমিতব্যায়ী ছিলেন যে অর্থসংকট তার সব সময়ই ছিল। ডঃ স্যামুয়েল জনসন তাকে বার বার অর্থ সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন কিন্তু গোল্ড স্মিথ বাঁচতে পারেন নি। কবির জীবনে বিদ্যাসাগর আর গোল্ডস্মিথের জীবনে ডঃ স্যামুয়েল জনসন।

কে না কবির পাশের থেকেছেন বন্ধুরা সেই হিন্দু কলেজ থেকে সমাথি ক্ষেত্র পর্য্যন্ত। না-কবি বাঁচতে পারলেন না, চির পতিপ্রাণা সাধবী স্ত্রী পুত্র কন্যা কাউকে তিনি শান্তি দিতে পারলেন না, সারা জীবন তিনি ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান অথবা তপ্ত মরুভূমির উপর অথবা যশ অর্থের শেষ ধাপে বীরের মত ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলেন। বাল্যাবস্থায় দীনবন্ধু অথবা বঙ্কিম মধুর সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত। গৌরদাস প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, বিদ্যাসাগর ও মদ কিনে রেখেছে। মনু ভালো ইংরাজী জানে না মধুর একেবারে কোলপোছা। ঋষি রাজনারায়ণ যোগ্য সমালোচক, দরিদ্র ভূদেব মধুকে সম্ভ্রম করে তার উদারতার জন্য, দিগম্বর মিত্র কিশোরীচাঁদ মিত্র বয়সে বড় হলে কি হবে কবির পান্ডিত্যে তারা মোহিত তবে বেইমানী করতেও কুণ্ঠিত হয়নি, পাইক পাড়ার রাজারা কবির জন্য নাট্য মঞ্চ তৈরী করে রেখেছে। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন মধুর পাশে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে ধর্মান্তরিত করার জন্য। সকলেই বলেছে এমন কি কবি নিজেই বলেছেন এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এ আত্মহত্যার সমতুল্য। কবি তদানীন্তন সমস্ত বিশিষ্ট মানুষ এবং মনীষীদের এক মঞ্চে দাঁড় করিয়েছেন, সকলেই কবির পাশে পাশে। এই দৃশ্য দেখে হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসে কবি বলছেন, Now I am Michael Madhusudan Dutta.

সকলেই মধুসূদনকে স্নেহ ও ক্ষমার চোখে দেখেছেন, সকল মনীষীদের কবি অবাক করে দিয়ে সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের তিনি অবাক করে দিয়ে মঞ্চের শেষ সিনে হাসতে হাসতে বললেন—

I am going to rest in my lord.
He will hide me in his best resting place.

বিশিষ্ট জীবনী লেখক বলেছেন—

মধুসূদন যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে, জীবন-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই—সমগ্র জীবনব্যাপী দুঃখাভিনয়ের যবনিকা এইবার পড়িবে, তখন তিনি তাঁহার মহাপ্রস্থানের পথে নিত্যসম্বল হইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন। জীবনের শেষ সময়ে—আয়ুঃ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে—তিনি ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন এবং তাহার সত্বর ব্যবস্থা করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। হায়, এ রত্নখনিতে যে কত রত্নই নিহিত ছিল, কে তাহার নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন?

তাঁহার ভবযন্ত্রণা সমাপ্তি পূর্ব্ব দিনে তিনি তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মাদ্রাজ প্রবাস সময়ে অভ্যর্থনাকারী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণমোহন তখন ১নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকিতেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি জেনারেল হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

মনুষ্য যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, সেই ধর্ম্মেই তাঁহার পরিত্রাণ ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মধুসূদন যখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তিম সময়ে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধান ন্যায়-সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন যে তিনি ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুসূদন বলিয়াছিলেন, আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" রেভারেন্ড কে. এম. ব্যানার্জি সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মযাজকের প্রথানুযায়ী মধুসূদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই; একথা পূর্ব হইতে জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্টসমাজে মহাআন্দোলন চলিতেছে। মধুসূদন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের কিছুদিন পর হইতে, তাঁহার সমগ্র জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি চার্চ অব ইংলন্ডের অধীন ওল্ড মিশন চার্চ ধর্ম্মমন্দিরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এমন কি, সে গির্জারও সহিত তাঁহার কোন সংস্রব না থাকায় অনেক খ্রীষ্টান ও পাদ্রী মহাশয়েরা তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া মহা হুলুস্থুল বাধিয়াছিল। মধুসূদনের কয়েকটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বন্ধু—মধুসূদনের ঔদ্ধদেহিক-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, ভাবিয়া ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল।

মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, কৃষ্ণ মোহন মধুসূদনকে বলিলেন, 'তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যোষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি। তেজস্বী মধুসূদন বলিয়াছেন, 'আমি মনুষ্য নির্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই, আমাকে ঈশ্বর বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন। (I am going to rest in my Lord.

He will hide me in his best resting place) আমাকে তোমারা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিম্বা কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থলেই হউক না কেন? কেবল আমার এইমাত্র শেষ অনুরোধ যেন আমার দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্যামপুষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে।'

এ সম্বন্ধে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখের 'Bengal Christian Herald' নামক খ্রীষ্টীয় পত্রিকা হইতে কিংদংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

We have, above all, the consolation of being able to belive that his end was peace. During the last days of his illness, when all hope of recovery was past, he sent for a Christian friend (Rev. Dr. K. M. Banerjee.) to whom he had been affectionately attached, and we are thankful to learn, that in the course of the solemn conversation which ensued, he avoird with all the emphasis of a full assurance "he belived in Christ, he was going up to Heaven."–

Bengal Christian, Friday, 4th July, 1873

সম্মিলনী' মাসিক পত্রিক

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাইকেল মধুসূদনের খ্রীষ্ট প্রভুকে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা কি দৃঢ় ও সুন্দর! তাহার দ্বারা যেন তাঁহার সমস্ত অন্তর্জীবনটি বহির্গত হইয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছিল। ঈদৃশ খ্রীষ্টপ্রাণ ভক্তকে কি অবিশ্বাসী আশীবিষে দংশন করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে?

যদিও এই প্রকার অচিন্ত্যনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ধর্ম্মযাজক বন্ধুগণেরা, ডি.ডি. মধুসূদনের প্রকৃত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ করিতে হইব। যখন মধুসূদনের সমাধির বিষয় লইয়া উপরিউক্ত আন্দোলন চলিতেছিল, তখন জনৈক ব্যাপটিষ্ট মিশনারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বিঘ্নে সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হওয়ায়, তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হয় নাই।

REMINISCENCES OF THE DEATH OF MECHAEL MADHUSUDAN DATTA

Michael Dutt's Christian friends differed from his because of his peculiar views of churchmanship. Michael believed there was no special spirtrual benefit in joining any particular church: in his eyes all churches were the same and he thought he might attend divine worship

wherever it pleased him, This attenation from the established practices of his mother church was a cause of great embarrassment to his country-men and Christian friends when he died, the Missionaries had, in conse-quence, no end of trouble in arranging for his last rites. While life was ebbing out of him. Michael Dutt was informed by Rev. K.M. Banerjea and Rev. C.N. Banerjea of the difficulties that might arise in respect of his burial, to which Dutt replied by saying–"I care not for man made churches nor for anybody's help. I going to sleep in my Lord and He will hide me in his best resting place. But me wherever you like-at your door or under a tree; let none disturb my bones. Let green turf grow over my last resting place on earth." Permission, however, was easily accorded by the Right Rev. the Lord Bishop of Calcutta for a real Christian burial throught the intermediatio of such estimable and pious gentlemen as Rev. K. M. Banerjea and others. And Michael Dutt's bones did rest in its last resting place-finding an honoured corner in the Lower Circular Road Cemetory in the Church of England plot, follwed thither by a concourse of gentlemen of different nationalities, of different faiths, and of differ-ent walks of life.

(Sd) Rev. Joseph Prannath Biswas, B.A.
Pastor of Trinith Church, Calcutta.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতে মধুসূদনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মধুসূদনের স্মৃতিশক্তি ও বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মধুসূদন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময়ে আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলিতে পারিলেন না; সেই কথাই তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্রের সহিত শেষ কথা হইল। সেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা শুশ্রূষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার অমর আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগপূর্বক ঊর্দ্ধলোকে গমন করিল। মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া জ্বালাপীড়িত শ্রীমধুসূদন দত্ত মহাজ্বালা ভুলিয়া গেলেন! অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী দুঃখঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অলৌকিক জীবলীলার চিরাবসানে শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিবসে (রবিবার) মৃত্যুর সুখনীড়ে চিরবিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তাবধি বাগ্‌দেবীর রক্তোৎপল চরণতলে মহাসাধনে অর্ঘ্যদান করিয়া ধরাধামে দীপ্ত যশের কল্পবৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বঙ্গভাষার নির্জ্জীব জীর্ণকঙ্কাল ঐশীশক্তি সঞ্জীবিত করিতে এ প্রতিভা কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোথা হইতে কোথায় আসিয়া বিদ্যুৎপ্রভা ঝলসিত কুলিশ-নির্ঘোষের ন্যায় কোথায় মিশিয়া গেল।

কাব্য গগনের প্রোজ্জ্বল বৃহস্পতি ছুটিতে-ছুটিতে, ঘুরিতে-ঘুরিতে, জ্বলিতে-জ্বলিতে অলৌকিক আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া কোন অলক্ষ্য দিগন্তকোণে ডুবিয়া গেল! যে জ্যোতিঃ নিবিল, তাহা আর জ্বলিল না। যে কবি—যে মনীষা—যে প্রতিভা চলিয়া গেলেন, তেমন আর কেহ আসিলেন না। সেই ব্যোমবিদারী ভেরীরব, সেই অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি, সেই সকরুণ সঙ্গীত ঝঙ্কার, সেই মধুর ব্রজগীতি চিরনিস্তব্ধ হইয়া গেল! আরাশের ন্যায় মহান্ হিয়া অসীম আকাশে ব্যাপ্ত ও বিলীন হইল। আর নিম্নে—বহু নিম্নে তাঁহার 'শান্তরশ্মি বৃহস্পতির' ন্যায় শবদেহ মর্ত্তধূলায় মিশিয়া গেল! আর এদিকে কল্পান্তপ্রসারিণী—মৃতসঞ্জীবনী—মহাশক্তিময়ী কীর্ত্তি অধীর প্রাণে ভক্ত সন্তানকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া অক্ষয়-স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল।

বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে

সম্পাদকের প্রতিবেদনা

Bengala! thou proudest Lotus in the Eastern main.
They sun of Glory has set, ne'er to rise again !!!

মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশবাসী এই নিদারুণ বার্ত্তায় শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বহু কবি শোকগাথায় গভীর বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র-ভূদেব বাবু প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিগণ সুললিত কবিতায় করুণ সুরে মধুসূদনের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রে সে অপার্থিব শোক-সঙ্গ ীত ভুলিবার নয়। তাহা বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

বঙ্গের যাবতীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদকবর্গ মধুসূদনের মৃত্যুবার্ত্তা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির জন্য প্রকৃতই ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেরূপ অকৃত্রিম সমবেদনা বর্ত্তমানকালে বিরল। সে সহৃদয়তা, সে সহানুভূতি, সে আন্তরিকতা আর নাই।

বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ এই আকস্মিক বজ্রপাতে বিচূর্ণ হইয়া গেল। ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য চিকিৎসকদিগকে মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অনেকে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আলিপুর জেনারেল হাসপাতালাভিমুখে গমন করিলেন। মধুসূদন মধ্যে-মধ্যে মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রদিগকে কাব্যসুধাদানে পরিতৃপ্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। সেই কারণে অনেকে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আলিপুরে গিয়েছিলেন। শুধু ছাত্রগণ নহে, বীরভূম-সিউড়ীনিবাসী জমিদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই স্মৃতি-লেখককে বলিয়াছিলেন যে,—"মাইকেল মধুসূদনের" মৃতু-সংবাদ কলিকাতা নগরে বিঘোষিত হইলে কেবল বাঙ্গালী নহে, নানাজাতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান, মাদ্রাজী, ইংরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক আলিপুরের হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শবদেহ দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন রবিবার অপরাহ্নে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম জনসমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি। তাঁহার মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী (Thomas & Co.)

লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার কন্যা-পুত্র জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের মহাকবির মহাযাত্রায় কোনরূপ আড়ম্বর বাহ্য বাহ্যদৃশ্যের অবতারণা ছিল না। কিন্তু শোক-জ্ঞাপক নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃশ্যের মহাগম্ভীর্য্যে, মহাকবির মহাপ্রস্থানের মৌনমুগ্ধ, নীরব সমারোহ পরলক্ষিত হইয়াছিল। স্তব্ধ মৌনবদন জনসঙ্ঘ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মহাকবির শবাধারের (Bier) অনুবর্তী হইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে কলিকাতা Tract Book Society- র ভূতপূর্ব প্রবীণ কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ জে. বিশ্বাস মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র সংযোজন করা হল ঃ

38, Upper Circular Road, Calcutta

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম সমীপেষু ঃ

মহাশয়, আমি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অবগত আছি, তাহা লিখিতেছি। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মৃত্যু সময়ে আমি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দর্শনের নিমিত্ত, আমি ও আমার অপর দুইজন বন্ধু, শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসি। কেবল শ্রীরামপুর হইতে নহে, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকার্য্যে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় একসহস্র লোক তাঁহার শবধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আমরা যখন লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন মাইকেল সমাধিকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রায় তিন-চারিশত লোক গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে মাইকেলের অন্তিম-কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও কারণে খ্রীষ্টীয় পাদরী ও মিশনারীদের মধ্যে মতভেদ, বাদানুবাদ ও গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সকল অন্তরায় নিষ্পত্তি হইয়া, নির্বিঘ্নে তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নিবেদক—(স্বাঃ) জে, বিশ্বাস

ক্রমে আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াসমন্বিত স্নিগ্ধ অপরাহ্নে জনসমূহ পরিবেষ্টিত শবাধারবাহী শকট (Hearse) সমাধিস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শবাদার শববাহকগণের স্কন্ধারূঢ় হইয়া, সমাধিক্ষেত্রে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ভূমিখণ্ডাভিমুখে চলিল,—ছত্রধর তাঁহার মস্তকোপরি প্রকাণ্ড ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে—শ্রেণীবদ্ধ শোককাতর জনমন্ডলী নীরবে, ধর্ম্মাচার্য্যের অনুগমন করিতেছেন। কবির শবাধার সমাধি বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষত হলে রেভারেণ্ড জার্‌বো মহাদয় Anglian Church-এর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি-অনুষ্ঠানানুযারী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাঃ জার্‌বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলেন শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহসমন্বিত শবাধার

ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশি দ্বারা সমাধি বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। কবি উল্‌ফের কথায় ঃ—

Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his fame, fresh and glory;
We carved not a line, and we raised not a stone-
But we left him alone with his glory.

সেই দিন মধুসূদনের সমাধির পর প্রাবৃট প্রকৃতির মৃদুধারায় সুধীরে শোকাশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল, নিস্তব্ধ সমাধি ভূমি আবার গভীরে সুপ্তিতে সামচ্ছন্ন হইল! শান্তি প্রশান্ত যবনিকা ধীরে ধীরে পতিত হইয়া জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল! মর্ত্ত-নিবাসে চিরশান্তিহারা মধুসূদন শ্মশান মৃত্তিকায় লীন হইয়া স্বর্গের চিরশান্তি লাভ করিলেন! ধর্ম্মচার্য্য, বন্ধুগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপস্থিত জনমন্ডলী সাশ্রুনয়নে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর দুর্ভাগিনী পত্নি রেবেকা মেকাটাভিস উনিশ বছর বেঁচেছিলেন। যে মধুসূদনের জন্য রেবেকা জীবনের সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, সেই মধুসূদন আগে পর্যন্তও রেবেকার নাম উচ্চারণ করেননি। সীতার অভিশাপে যেমন মৃত্যু বরণ করল রাবণ। রেবেকার অভিশাপে শ্রীমধুসূদন।

রেবেকা নিজের চোখে কবি মধুসূদনের সমগ্র কাণ্ডকে উপলব্ধি করার জন্য বেঁচেছিলেন রেবেকা মহাকবি মধুসূদনের সমগ্র জীবনে সাক্ষী হয়ে রইলেন।

১৮৯২ সালের জুলাই মাসে রেবেকা পরলোক গমন করলেন।

I hate Ram and his rabble, The idea of Ravana elevates and Kindless my imagination. He was a grand fellow.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
প্রকাশিত বাংলা কাব্য ও নাটক এবং প্রহসন ও ইংরেজী রচনাবলী

রচনা	প্রকাশকাল	রচনাকাল
শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯	১৮৫৮ খ্রীঃ
একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০	১৮৫৯ খ্রীঃ
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬০	১৮৫৯ খ্রীঃ
পদ্মাবতী নাটক	১৮৬০ এপ্রিল	১৮৫৯ খ্রীঃ
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১৮৬০ মে	১৮৫৯ খ্রীঃ
মেঘনাদবধ কাব্য (প্রথম খন্ড)	১৮৬১ জানুয়ারী	১৮৬০ খ্রীঃ
মেঘনাদবধ কাব্য (দ্বিতীয় খন্ড)	১৮৬১ এপ্রিল	১৮৬১ খ্রীঃ
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	১৮৬১ জুলাই	১৮৬০ খ্রীঃ
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৮৬১ আগষ্ট	১৮৬০ খ্রীঃ
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৮৬২ মার্চ	১৮৬২ খ্রীঃ
চতুর্দশপদী কবিতা বলী (ইউরোপে)	১৮৬৬ আগষ্ট	১৮৬৫ খ্রীঃ
হেক্টর বধ (কোলকাতা)	১৮৭১	১৮৬৭ খ্রীঃ
মায়াকানন প্রকাশ পায় মৃত্যুর পর	১৮৭৪ মার্চ	১৮৭৩ খ্রীঃ

The Captive ladie- Visions of the Past-	মাদ্রাজে অবস্থান কালে- ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে	১৮৪৯ খ্রীঃ
The Anglo-Saxon and the Hindu (মাদ্রাজ)		১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে
Ratnavali- (Translation) কোলকাতা	১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে	
Sarmista (Translation) কোলকাতা	১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে	১৮৫৮ খ্রীঃ
Nil Darpan Translation-	১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে	১৮৫৮ খ্রীঃ

এছাড়াও কবি লিখেছেন অনেক, তা অযত্নেও অবহেলায় কবি চোখের আড়াল করেছেন।

পাঠকদের সুবিধার্থেই সংযোজন করলাম

নাম	জন্ম	জন্মস্থান	প্রয়াণ
শ্রীমধুসূদন দত্ত	১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ ২৫শে জানুয়ারি	যশোর - সাগরদাঁড়ি	১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে জুন
প্রথমা স্ত্রী রেবেকা মেকাটাভিশ	১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ	নাগপুর	১৮৯২ খ্রীঃ জুলাই
প্রণয়িণী (যদিও স্ত্রী মর্যাদা পেয়েছিলেন আইনের পথে নয়, প্রেমের আকর্ষণে) অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া হোয়াইট	১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ ১০ই এপ্রিল	মাদ্রাজ	১৮৭৩ খ্রীঃ ২৬শে জুন

যতদিন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন বঙ্গসাহিত্য হইতে শ্রীমধুসূদনের নাম বিলুপ্ত হইবে না। নাম বিলুপ্ত হইবে না দুই মহিষীরও।

বিঃ দ্রঃ

বিশেষ অনুরোধ ঃ—

এই গ্রন্থের কোনো ছবি অথবা বিষয় অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে এই ঠিকানায়—